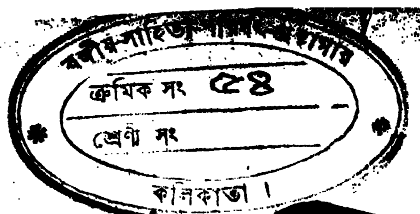


আরতি

মাসিক পত্রি[illegible]াচনী।



শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত।



ষষ্ঠ বর্ষ।

১৩১২ মাঘ হইতে ১৩১৩ পৌষ পর্য্যন্ত।



ময়মনসিংহ সুহৃদ্ যন্ত্রালয় হইতে
শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



মূল্য দেড় টাকা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ষষ্ঠ বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণের নাম

(বর্ণানুসারে)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল।
শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।
শ্রীযুক্ত আবদুল করিম।
" উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।
শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু।
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্-এ, বি-এল।
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্-এ।
" কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।
" কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ।
" কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস।
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
" দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।
" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
[illegible]গেন্দ্রবালা সরস্বতী।
" পাঁচকড়ি দে।
শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন গুপ্ত
" যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
" পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
" রসিকচন্দ্র বসু।
" রামপ্রাণ গুপ্ত
" রেবতীমোহন গুহ এম্-এ, বি-এল।
" ব্রজসুন্দর সান্যাল। এম. আর, এ, এস।
" শরৎকুমার সেন গুপ্ত।
শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ।
" সৈয়দ মুকল হোসেন।
" হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।
" হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৫ম বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৬৯	শ্রীমতী সরযূবালা মোক্তায়েদ	চণ্ডীপাশা	১॥৹
৬১৯	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ষ্টেসন মাষ্টার	সিংজানী	১॥৹
৬৪৫	" শশীকান্ত দে		১॥৹
৬৫০	" যোগিনীমোহন বসু হেড্ কনেষ্টবল	সিংজানী	১॥৹
[illegible]	" চন্দ্রকুমার রায় বি, এল,	হবিগঞ্জ	১॥৹
৬৬৩	" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার	রংপুর	১॥৹
২৫	" ভারতচন্দ্র আচার্য্য মোক্তার	সদর	১৲
৭১১	" আনন্দনাথ রায়	সুবন্দী	১॥৹
৬৯৯	" যুধিষ্ঠিরচন্দ্র নাথ পোষ্ট মাষ্টার	ইটনা	১॥৹
৬৯৭	" গিরিশচন্দ্র সরকার	গোবরজানী	১॥৹
৭০৯	" রাজেন্দ্রমোহন মৌলিক	পাইকুড়া	১॥৹
৭১৫	সৈয়দ আজিজল হক্ জমিদার	বৌলাই	১॥৹
৫৯৮	শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিশ্বাস	ইটনা	১॥৹
৬৯৩	মৌলবী ওয়াজেদালী খান পূণি জমিদার	করটিয়া	১॥৹
৭৬১	" আবদুল জব্বর	বনগ্রাম	১৲
	শ্রীনাথ রায় ম্যানেজার	মুক্তাগাছা	১॥৹
	হিমকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	ঐ	১॥৹
	সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী	কৃষ্ণপুর	১॥৹
	শ্যামসুন্দর গোস্বামী বি, এল,	কিশোরগঞ্জ	১॥৹
৫০	" ভৈরবচন্দ্র রায়	ঐ	১।৹
৬২	" যজ্ঞেশ্বর রায়	বাজিতপুর	১।৹
২২২	" মদনমোহন দত্ত প্লীডার	ঈশ্বরগঞ্জ	১॥৹
৪৪২	" হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	সুবর্ণখালী	১॥৹
৫৭০	" তারিণীশঙ্কর রায়	সেরপুর	১॥৹
৪৯৮	" গোপালদাস চৌধুরী	ঐ	১॥৹
৬৫৮	" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, ময়মনসিংহ	১৲
[illegible]	" ডাঃ কালীকুমার চক্রবর্ত্তী	বাজিতপুর	১।৹

৪৩৬	„	হেমচন্দ্র রাউত	নেত্রকোণা	
৪০৭	„	অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	
৩৯৪	„	রেবতীকুমার দে কবিরঞ্জন	গোবিন্দপুর	১॥০
৩২৯	„	ভগবানচন্দ্র মজুমদার	ঐ	১॥০
৫৪৯	„	ডাঃ বিজয়নাথ ভাদুড়ী	দেওয়ানগঞ্জ	১॥০
২৯৮	„	মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর	মুক্তাগাছা	১॥০
২১৩	„	দুর্গাদাস দত্ত চৌধুরী	রায়হম	১॥০
৩১৪	„	কুমুদিনীকান্ত বানার্জ্জি	গৌরীপুর	১॥০
৩১৭	„	ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	কালীপুর	১॥০
৩৮৯	„	অভয়চন্দ্র ঘোষ ম্যানেজার	আঠারবাড়ী	১॥০
৫০৮	মহম্মদ	রফিকউদ্দিন খাঁ	পাইকুড়া	১॥০
৪৪৬	শ্রীযুক্ত	সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, ডিঃ, মাঃ,	ঢাকা	১॥০
৪২৭	„	রামচরণ পণ্ডিত	কালীপুর	১॥০
২১৭	„	বরদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এঃ, সিঃ, সার্জ্জন	সদর	১॥০
১৬৫	„	লোকনাথ দে মোক্তার	ঐ	১॥০
১১৯	„	কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মোক্তার	ঐ	১॥০
১২৪	„	গগনচন্দ্র রায় মোক্তার	ঐ	১॥০
১৭২	„	কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী মোক্তার	ঐ	১॥
৪০০	„	বৈকুণ্ঠচন্দ্র ভৌমিক	রসুলপুর	
৫৯১	„	ডাঃ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ফুলবাড়িয়া	
৪৪১	„	কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী ম্যানেজার	কৃষ্ণপুর	
১৬১	„	কালীশঙ্কর গুহ প্লীডার	সদর	
৩৬৩	„	বীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী	বাসাবাড়ী, গৌরীপুর	১॥০
৪২৪	„	চন্দ্রকুমার ভৌমিক	ভবানীপুরের কাছারী, দুর্গাপুর	১॥০
৬৫৩	„	কুলসুমন্নেছা খাতুন	শ্যামপুর, খলিফাবাড়ী	১॥০
৬৫৭	„	কালীপদ নাগ	টেলিগ্রাফ মাষ্টার পাতিয়ালা ইষ্টেট	১॥
২২৬	„	জগতনারায়ণ পত্রনবিশ	শ্রীপুরবাড়রী	১॥
১৮১	„	বিপিনচন্দ্র রায় এম, এ	সদর	১॥
৬৩১	„	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মোক্তার	ঐ	১॥
২৫১		অভয়চন্দ্র দত্ত প্লীডার	ঐ	

সুরভি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩১২। { প্রথম সংখ্যা

আরতি।

"বাণী বিদ্যাদায়িনী—নমামি ত্বাং।

অয়ি—কল্যাণময়ি ভারতি!
আজি—নব আয়োজনে বঙ্গভবনে
হবে তোমার আরতি।
ঐ—দীন নিদ্রিত সন্তান আজি নবীন প্রভাতে জেগেছে!
কিবা—নবীন রবির নবীন কিরণ আননে আননে লেগেছে!
নব উৎসাহে পূর্ণ সকলি,
আপনা হৃদয় দিতে চায় বলি,
আশার আলোক উঠিয়াছে জ্বলি—
ঐ কি মোহন মূরতি।
অয়ি—মঙ্গলময়ি ভারতি!
আজি—দেখ গো চাহিয়া কৃপা কটাক্ষে আপনা মোহন দেহে।
কিবা—নব আভরণে সাজিয়াছ আজ নব বাঙ্গলা গেহে।
তোমারি কাব্য, ঐ ইতিহাস,
ঐ রাজনীতি—সাহস বিভাষ,
অঙ্গে অঙ্গে মাধুরী বিকাশ—
নব লাবণ্য স্ফূরতি!
অয়ি—মঙ্গলময়ি ভারতি।
আজি—নব আয়োজনে বঙ্গভবনে
হইবে তোমার আরতি!

কৃষি।

"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে
কত কাচ শিরের বিভূষণ-রে।"

ভারতবর্ষ রত্ন-প্রসবিনী বলিয়া চিরদিন ভুবনবিখ্যাত। বাস্তবিক ভারতবর্ষকে কমলার অতুল ধনভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ পৃথিবীতে আর নাই। প্রকৃতি আপন অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে সকলই রহিয়াছে; কেবল আমাদের দোষেই আমাদের অভাব। যেমন সকল সৌন্দর্য্যের সার সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার দেহ গঠিত হইয়াছিল, তেমনি সর্ব্ববিধ ধন-সম্পদের একত্র সমবায়ে এই পুণ্য ভারত-ভূমির উপাদান প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমরা রত্ন চিনি না। রত্ন আহরণ করিবার কৌশল আমরা শিক্ষা করি নাই। আমাদের জ্ঞান নাই, চেষ্টা নাই, অধ্যবসায় নাই, সেই জন্যই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা। অতুল ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও আমরা পথের ভিখারী। বিদেশী বণিকেরা যত্ন ও বুদ্ধিবলে এদেশ হইতে কোটিপতি হইয়া দেশে ফিরিতেছে।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই বিদ্যাশিক্ষা করে ধনলাভের আশায়। কিন্তু কিরূপে ধনার্জ্জন করিতে হয় তাহা অতি অল্প লোকেই জানে। আমরা চাকুরীকেই ধনলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছি। প্রায় পৌনে ষোল আনা শিক্ষিত লোক আইন-ব্যবসায় এবং চাকুরিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের সুবিস্তৃত পথগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। এখন 'বারে' আর স্থান নাই, চাকুরিও অতিশয় দুর্ল্লভ হইয়াছে. তাই সম্প্রতি কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এ চৈতন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দেশের মঙ্গল।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের বহুদর্শী পণ্ডিতগণ অর্থনীতির অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।

এই ক্ষুদ্র শ্লোকটীর মধ্যেই সমস্ত Political Economy-র সার রহিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি ও রুচি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে তাই মহাত্

উপেক্ষা করিয়া এখন ভিক্ষাকেই শ্লাঘনীয় মনে করিতেছি। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমরা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করি তাহা কেবল ভিক্ষারই উপযোগী; কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের নিতান্ত প্রতিকূল। যে বাণিজ্য এবং কৃষি-শিক্ষাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে আধুনিক সুসভ্য জাতি সেই বাণিজ্য এবং কৃষির উপরই উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এমন সমতল, উর্ব্বর, বিস্তৃত দেশ আর নাই। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে সর্ব্ববিধ শস্যের উপযোগী ক্ষেত্র সুলভ। এদেশে শস্যমুষ্টি ছড়াইয়া দিলে সুবর্ণমুষ্টি ঘরে আসে। ভারতবর্ষে কৃষিই যে জীবিকা র্জনের সর্ব্বপ্রধান এবং সহজ উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য অতি প্রাচীনকালেই এ দেশের অধিবাসীরা কৃষির উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। "কৃষি-পারাশর" নামক প্রাচীন কৃষিশাস্ত্রে লিখিত আছে—"যিনি কৃষিকর্ম্ম করেন তাহার কখনও অভাব হয় না, অতএব তাহাকে কাহার নিকট প্রার্থনা করিয়া লঘুতা স্বীকার করিতে হয় না।"

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন আমরা তাহারই উত্তরাধিকারী হইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তাহার কারণ কৃষিকার্য্যটা নিরক্ষর অজ্ঞলোকের হাতে ন্যস্ত করিয়াই দেশের লোক নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যের সহিত অসভ্য অর্দ্ধনগ্ন একশ্রেণীর নীচজাতির নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাই বিদ্যাভিমানী শিক্ষিত লোকেরা সেইদিকে অগ্রসর হন না। অশিক্ষিত কৃষকেরা বংশপরম্পরাগত নিয়মে জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপে জমির "পাট" করিয়া আবাদ করিত তাহারাও তদ্রূপই করিতেছে; তদাতিরিক্ত কিছু করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। এখন পর্য্যন্তও এই অজ্ঞ কৃষকেরাই দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আর পারিতেছে না।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

এখন ভীষণ জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই এখন ভারতের কৃষিজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতেছে। দেশ শাসনসম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার চাউল, গম প্রভৃতি শস্য বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। এই ব্যয় (Home-charge) আবার

দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার উপর "অবাধ বাণিজ্যের" প্রসাদে বিদেশী বণিকগণ ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতেছে। এবং তথায় বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে। আমাদের অবস্থা কিরূপ ভীষণ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত। এখন আর পূর্ব্বাবলম্বিত কৃষিপ্রণালীর উপর নির্ভর করিয়া চাষ করিয়া থাকলে চলিবে না।

চাষের উপযোগী ক্ষেত্রের সংখ্যা বদৃচ্ছা বৃদ্ধি করা যায় না। অতএব অতিরিক্ত প্রয়োজন সঙ্কুলনের জন্য এই জমি হইতেই চার পাঁচগুণ শস্য উৎপন্ন করিয়া লইতে হইবে। ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায় উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কৃষি-বিদ্যালয়।

নিরক্ষর কৃষকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা কৃষির উন্নতি হইবে না। শিক্ষিত লোক কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে সুফল লাভের আশা সুদূর-পরাহত। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় আছে। ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে যাহারা বিশেষ পারদর্শী হইয়া বাহির হন তাহারা স্বয়ং কৃষিকার্য্য করেন এবং দেশে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় কৃষিশিক্ষার কোন সুব্যবস্থা এদেশে হয় নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের পর একবার কৃষির উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৮৭৪ সালে বিহার দুর্ভিক্ষের পর ইহার কারণানুসন্ধান ও নিরাকরণের উপায় স্থির করিবার জন্য বিলাত হইতে এক "কমিশন" আসিয়াছিল। সেই কমিশন ভারত-গবর্ণমেণ্টকে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। সার এস্‌লি ইডেনের সময় প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিখ্যাত ছাত্রকে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল দশবারজন ছাত্রও বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া দে[শে] প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান জনসাধারণের ম[ধ্যে] প্রচারিত হইবার ব্যবস্থার অভাবে দেশের কোন উপকার হয় নাই।

আজ কয়েক বৎসর হইল বর্দ্ধমান, শ্রীপুর, ডুমরাও এবং শিবপুরে "তত্ত্ব কৃষিক্ষেত্র" খোলা হইয়াছে। তাহাতে দেশের নানা স্থানের ভূমির প

হইতেছে। কোন্ স্থান কোন্ শস্যের অধিক উপযোগী এবং কোন্ সার ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা বৎসরান্তে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য বিবরণে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকারে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান দেশে বিস্তৃত হইতে পারিবে। অশিক্ষিত কৃষকেরাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি করিয়া সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট "পুষাতে" একটী উচ্চ অঙ্গের কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই কলেজে দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবে। এই সকল কৃষিবিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন বিলাতের ন্যায় এদেশে কৃষিকার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন তখন কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হইবে এবং দেশের অবস্থাও ভাল হইবে এরূপ আশা করা যায়।

কৃষি সম্বন্ধে বীক্ষণশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার স্থূলমর্ম্ম উল্লেখ করা যাইতেছে।

মৃত্তিকা।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমেই মৃত্তিকার কথা বলা আবশ্যক। মৃত্তিকার অবস্থা ও তাহার উপাদান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা চাই নতুবা সকল শ্রম এবং যত্ন পণ্ড হইবে।

ভূমির উর্ব্বরতা সাধারণতঃ তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে; মৃত্তিকার গঠন বলিলে যে যে উপাদানে উহা গঠিত তাহাই বুঝিতে হইবে। সকল ক্ষেত্রের গঠন একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটির গঠন স্বতন্ত্র। মাটির গঠনের উপরই ফসল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা দেখা গিয়াছে মৃত্তিকায় পটাস, ফস্‌ফরিক এসিড্, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণিক এসিড্, লৌহচূর্ণ, অঙ্গার, প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে। সকল মাটিতে এই সকল উপাদান সমপরিমাণে বিদ্যমান থাকে না। এই জন্যই সকল ভূমি সমান উর্ব্বর নহে।

মৃত্তিকার উপাদানকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে— যথা, 'অঙ্গারক' ও 'অনঙ্গারক'। জীবজন্তু ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষকেই প্রধানতঃ মৃত্তিকার অঙ্গারক অংশ বলা যায়; ইহা ব্যতীত সকল পদার্থই অনঙ্গারক। অঙ্গারক পদার্থ উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। একপ্রকার মৃত্তিকা আছে তাহাতে অঙ্গারক অংশ অত্যন্ত অধিক। এই মৃত্তিকাকে ইংরেজীতে Humous বলে। অঙ্গারক পদার্থের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জমির অনুর্ব্বরতা ও উর্ব্বরতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

মাটিতে প্রধানতঃ চারিটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা কৰ্দ্দম (Clay) বালুকা (Sand), চুণ (Lime) ও অঙ্গারক বা জৈবপদার্থ (Humous)। এই কয়েকটী সামগ্রীর কোন একটী মৃত্তিকার কাজ করিতে পারে না। সকল গুলি একত্র হইলে উদ্ভিদের পোষণকার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ক্ষেত্রে যাহাতে কোনটীর অভাব না হয় তজ্জন্য দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যখন যে পদার্থটী ব্যয়িত হইয়া যাইবে তখন সেই পদার্থ টী পূরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন একটীর অভাব হইলে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না।

ভূমি কর্ষণ।

আমাদের যেমন জীবনরক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি উদ্ভিদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। উদ্ভিদেরাও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইলে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে থাকে। ক্ষেত্রে উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী তরল পদার্থ আছে তাহা উদ্ভিদ মূলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লয়। জলে সলতে নিমজ্জিত করিলে যেমন জল কৈশিকাকর্ষণ (Cohesion) বলে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে তেমনি কৈশিকা-কর্ষণে মূলদ্বারা রস বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হয়। মৃত্তিকা ভাল করিয়া কর্ষণ না করিলে জমিতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় দৃঢ় মৃত্তিকায় প্রবেশ করিতে না পারাতে উদ্ভিদ খাদ্যসংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়। অতএব ভূমিকর্ষণের প্রথম উদ্দেশ্য উদ্ভিদকে মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সঞ্চয় করিতে সাহায্য করা।

দ্বিতীয় কথা—মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া ভালরূপে চূর্ণীকৃত হইলে সূর্য্যকিরণ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া ভিতরের রস উপরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। এবং বায়ু মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কর্ষিত জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারা অক্সিজান (Oxygen) প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকাস্থিত সলফারেটেড্ হাইড্রোজান (Sulphuretted Hydrogen) এবং হিউমিক্ (Humic Acid) এসিড্ প্রভৃতি উদ্ভিদের অনিষ্টকারী পদার্থকে পোষণোপযোগী করিয়া তুলে। অক্সিজানের (Oxygen) আর এক গুণ এই যে ইহা ভূমিতে নাইট্রেট্ (Nitrate) প্রস্তুত করিয়া থাকে। Nitrate উদ্ভিদের প্রধান সহায়।

তৃতীয় কথা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদ মূলদ্বারা ভূমি হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং যতদূর মূল যায় ততদূর পর্য্যন্ত মাটির সার

নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেই মাটিতে উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী পদার্থ আর থাকে না। ভূমি কর্ষণ করিলে অসার মাটি নীচে পড়িয়া যায় এবং নীচের নূতন উর্ব্বর মাটি উপরে উঠে। আবার অসার জমি নীচে পড়িয়া পুনরায় নবশক্তি লাভ করে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যে ভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করা হইয়া থাকে তাহাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; সেই হেতু তেমন সুফল লাভ হয় না এবং জমিও দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। দেশী ক্ষুদ্র ফালযুক্ত লাঙ্গলদ্বারা ভাল কর্ষণ হয় না। বিলাতি লাঙ্গল অথবা শিবপুরের লাঙ্গল কৃষির পক্ষে খুব উপযোগী কিন্তু দেশের গরুর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এই ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল গরু সেই সব ভারী লাঙ্গলদ্বারা কর্ষণ করিতে অসমর্থ। গরুর অবস্থা ভাল করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হইতে হইবে।

সারের কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে আট মণ ধান হইত সেই ক্ষেত্র হইতে এখন বত্রিশ মণ উৎপন্ন করিতে হইবে নতুবা আর অন্নাভাব ঘুচিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাসায়নিক কৃষিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে কৃষির যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি-রসায়ন বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে উদ্ভিদের সহিত জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। সুতরাং কৃষি-রসায়নের মূল সূত্রগুলি জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

জড় পদার্থ কতগুলি উপাদানের সমষ্টি মাত্র। একটী বৃক্ষকে বিশ্লেষণ করিলে অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান, ফস্ফরাস্, গন্ধক, ক্লোরিন্, সিলিকস্, কেলসিয়াম্ প্রভৃতি মূল পদার্থ পাওয়া যায়। এই সকল জীবন-ধারণোপযোগী পদার্থ উদ্ভিদেরা দ্বিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে—পত্রদ্বারা বায়ু হইতে গ্রহণ করে এবং মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হয়। একটী উদ্ভিদকে পোড়াইয়া ফেলিলে যাহা উড়িয়া গিয়া বায়ুতে মিশে তাহা উদ্ভিদ বায়ু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যাহা ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে তাহা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। জড় পদার্থের ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য যে, যে জমিতে যে উদ্ভিদ রোপণ করা হয় সেই জমির পক্ষে সেই উদ্ভিদের ভস্ম, সারের কার্য্য করে যে হেতু ভস্মে

উক্ত উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থ প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। কৃষকেরা ইহা পরিজ্ঞাত না থাকায় উদ্ভিদ্গুলি জ্বালানিকার্য্যে ব্যবহার করে এবং ছাই ফেলিয়া দেয়।

গোময় সার।

আমাদের দেশের কৃষকেরা 'সার' বলিলে কেবল গোময়কেই বুঝিয়া থাকে। তাহারা গোময় ভিন্ন অন্য কোন 'সার' ব্যবহার করে না। প্রায় সকল দেশেই গোময় সাররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গোময়সারে উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী প্রায় সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এদেশের কৃষকেরা গোময় কিরূপে রাখিতে হয় তাহা জানে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থেরা গোবর গোশালা হইতে সরাইয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দেয়। দরকার মত সেইস্থান হইতে গোময় লইয়া ক্ষেত্রে ফেলা হয়। এই স্তূপীকৃত গোবরের উপর দিয়া সারা বৎসরের রৌদ্র বৃষ্টি যায়। এই জন্য গোবরের সারাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায় অথবা রৌদ্রের উত্তাপে নষ্ট হয়।

গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে অধিক সার। কিন্তু কৃষকেরা এ কথা জানে না বলিয়া গোমূত্র বা চোনা নষ্ট হইতে দেয়। কৃষিবিদ্যা-বিশারদ শ্রীযুক্ত অতুল-কৃষ্ণ রায় এম্-এ, এম্, আর্, জি, এস্, গোময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"একটী ভাল গরু হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ মণ গোময় এবং ফেলা-ছড়া ও মাটিতে শোষিত অংশ বাদ দিলেও অন্ততঃ একশত মণ গোমূত্র পাওয়া যায়। ....২৫০ মণ গোময় ও ১০০ শত মণ গোমূত্র হইতে ক্ষেত্রে ব্যবহারের নিতান্ত উপযোগী সুন্দর সার প্রায় ১৭০ মণ পাওয়া যায় অর্থাৎ ৩৫০ মণ মিশ্রিত মল ও মূত্র শুকাইয়া গিয়া ১৭০ মণ খাঁটি সারে দাঁড়ায়।"

তিনি লিখিয়াছেন—"বর্দ্ধমানের পরীক্ষা ক্ষেত্রে ধানের চাষে প্রতি বিঘায় এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

	ধান	বিচালি	লাভ
বিনা সারে	৬৷৴	১০৷২৮	৬৷৩ পাই

১৭ মণ গোময় সারে—অর্থাৎ প্রতি বিঘায় এক গাড়ী গোময় সারে ॥০ আনা মাত্র ব্যয় হইয়াছে অথচ উহাতে ১৯৷৶০ আনার উপস্বত্ব পাওয়া গিয়াছে। সারের খরচ বাদে বিঘা প্রতি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৯৲ টাকার কম হয় নাই। আর সারহীন ক্ষেত্রে সেইস্থলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৬৷৩ পাই মাত্র হইয়াছে।

অতএব বিঘাপ্রতি এক গাড়ী গোময় সার দিয়া প্রায় ১৩৲ টাকা লাভ করা হইয়াছে। সুতরাং ১৭০ মণ গোময় সারে ১৩০৲ টাকা লাভ হইবার কথা।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটী গরুর গোময় ও গোমূত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিলে বৎসর ১৩০৲ টাকা লাভ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত লেখক গোময় সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—"গমের চাষেও গোময় সার বঙ্গীয় পরীক্ষাক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বিনা সারে ডুমরাওন ক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের মাত্র গম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেইস্থলে গোময় সারে ৯।৭ সের গম হইয়াছে।

পাটের চাষের গোময় সারে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে অন্য কোন সারে তদ্রূপ পাওয়া যায় নাই। বিনা সারে প্রতি বিঘায় তিন মণেরও কম খাঁটি পাট হইয়াছে। অন্যান্য সারে অর্থাৎ সোরা, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খইল ইত্যাদিতে ইহার দ্বিগুণ আড়াই গুণ ফসল হইয়াছে বটে; কিন্তু গোময় সারে প্রায় ইহার তিন গুণ ফসল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।"

সাধারণতঃ এক বিঘা জমির জন্য এক গাড়ী গোময় সার প্রদান করিলেই যথেষ্ট হয়।

টাট্‌কা গোবর জমিতে ফেলা উচিত নহে। তাহাতে উই ও অন্যান্য বিঘ্নকর পোকার উপদ্রব হইতে পারে। আবার যে সব গো মহিষ পতিত জমিতে চরে এবং পরিপক্ক বীজযুক্ত ঘাস খায় তাহাদের গোময় নানা প্রকার আগাছার বীজে পরিপূর্ণ থাকে; সেই গোবর ক্ষেত্রে ফেলিলে আগাছায় ক্ষেত্র ভরিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় গোবর পোড়াইয়া ভস্ম ফেলাই উচিত।

গো মহিষের বিষ্ঠা অপেক্ষা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা অধিক তেজস্কর সার। কারণ তাহাতে জলের ভাগ কম। পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষেত্র কর্ষণের পূর্ব্বে কয়েকদিন ক্ষেত্রে ভেড়ারপালকে চরিতে দেওয়া হয়।

গোশালার অনতিদূরে গর্ত্ত করিয়া গোময় রাখা উচিত। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর একখানি চালা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে চৌবাচ্চা করিয়া গোময় এবং গোমূত্র সঞ্চয় করা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কোন প্রকারেই সার পদার্থের অপচয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে অধিক সার। সুতরাং গোময় এবং গোমূত্র একত্র গর্ত্ত করিয়া রাখিলে গড়াইয়া যাইতে পারে না। চৌবাচ্চায় রাখিলে-তো আর কথাই নাই।

সোরা।

সোরা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোরার কার্য্য অতি শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উপকারিতা স্থায়ী নহে। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই সোরা ক্ষেত্রে ফেলা কর্ত্তব্য। সোরা ক্ষেত্রে ফেলিয়াই জলসিঞ্চন করিতে হয় নতুবা ফল পাওয়া যায় না। প্রতি বিঘা জমির জন্য তিন মণ সোরার প্রয়োজন। সোরার মূল্য অধিক সেই জন্য সচরাচর সোরা সাররূপে ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। যে সকল ফসলে অধিক লাভের সম্ভাবনা সেই সকল্ ফসলের জন্য সোরা ব্যবহার করা উচিত।

হাড়ের গুঁড়া।

হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা সকল ফসলের পক্ষে সমান উপকারী নহে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে সকল উদ্ভিদের মূল ভক্ষণ করা যায় তাহাদের পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া বিশেষ উপকারী। হাড়ের গুঁড়া ফসল বুনিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে ফেলা কর্ত্তব্য। প্রতি বিঘার জন্য আড়াই মণ হাড়ের গুঁড়ার আবশ্যক। হাড়ের ভস্মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু সারের হিসাবে তাহা হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

কাঠের ছাই।

কাঠের ছাই অতিশয় তেজস্কর সার। ইহাতে অধিক পরিমাণ 'ক্ষারজান' পদার্থ আছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে কচু ও ওল প্রভৃতি গাছে ছাই সাররূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ছাইদ্বারা ঐ সকল উদ্ভিদের যথেষ্ট পুষ্টি হইয়া থাকে। শসা, কুমড়া, লাউ, বেগুন প্রভৃতির গাছে ছাই দিলে বৃক্ষ সতেজ হয়। ছাই গাছের পাতায় ছড়াইয়া দিলে পোকা সকল মরিয়া যায়। যে সকল গাছের মূল খাওয়া যায় উহাদের পক্ষে ছাই অতি উৎকৃষ্ট সার।

রেড়ির খৈল।

রেড়ির খৈলে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সার আছে। ধান, আলু ও পাটের চাষে রেড়ির খৈলদ্বারা যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধান ও আলুর চাষে রেড়ির খৈলের সার দেওয়া হয়। রেড়ির খৈল ইক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইক্ষুর ক্ষেত্রে কেবল খৈল না দিয়া তাহার সহিত হাড়চূর্ণ মিশাইয়া দিলে অধিক ফল পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমান আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ধান্যের পক্ষে কোন্ সার কিরূপ উপযোগী সে বিষয় পরীক্ষা হইয়াছিল। নিম্নে তাহার ফল সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

প্রতি একরে (৩ বিঘা)	ধান।	বিচালি।
১০০ মণ গোময় সারে	প্রায় ৫০ মণ	প্রায় ৭৭ মণ।
বিনা সারে	„ ১৮ „	„ ৩৪ „।
৬ মণ রেড়ির খৈলে	„ ৩৬ „	„ ৫৮ „।
৫০ মণ গোময় সারে	„ ৩৫½ „	„ ৫৪ „।
৩ মণ হাড়ের গুঁড়ায়	„ ৪৭ „	„ ৫৮ „।
৬ মণ „ „	„ ৫১ „	৬৫ „।
৩ মণ হাড়ের গুঁড়া } ৩০ সের সোরা }	„ ৫৩ „	„ ৭৫½ „।

উল্লিখিত পরীক্ষায় আর্থিক লাভ বা লোকসান কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিম্নস্থ তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।

	মূল্য ;	আবাদের খরচ ;	ফসলের দাম ;	লাভ
১০০ মণ গোময় সারে	৫/০	২৯৷৵০	১১৬/০	৮১৷/০
বিনা সারে	...	২৯৷/০	৪৪৷০	১৪৵০
৬ মণ রেড়ির খৈল	১২৲	৩২৷/০	৮৯৷৴০	৪৪৶/০
৫০ মণ গোময় সার	২৷০	২৭৷৵০	৮৬৶০	৫৬/০
৩ মণ হাড়ের গুঁড়া	৪৷০	২৮৶/০	১০৯৷/০	৭৬৷০
৬ „ „ „	৯৲	২৮৷০	১১৮৶০	৮১৷০
৩ মণ হাড় গুঁড়া } ৩০ সের সোরা }	৮৷০	২৮৷/০	১৩৭৶	১০১৷০

ইহাতে দেখা যাইতেছে, হাড়ের গুঁড়া ও সোরার মিশ্রণে ফসল অধিক জন্মিয়াছে এবং লাভও যথেষ্ট হইয়াছে। অথচ এই সারের মূল্য যৎসামান্য বিঘা প্রতি ২৶০ আনার অধিক নয়। উদ্ভিদ সারের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গোময় সার অপেক্ষা তদ্দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। যে জমিতে ধানগাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহাতে পাট ও শণের বীজ রোপণ করিতে হয়। ধান যখন রোপণ উপযোগী হইবে সেই সময়ে পাট বা শণ গাছ সমেত চাষ দিবে। এমনি ভাবে চাষ দিতে হইবে যে ঐ সমস্ত গাছ জমির সহিত মিশিয়া যায়। তাহার পর যেখানে ধানের বীজ বপণ করা হইয়াছিল সেখান হইতে ধান গাছ উপড়াইয়া ঐ চাষ দেওয়া জমিতে আনিয়া রোপণ করিতে হইবে।

(আগামীবারে সমাপ্য) শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামায়ণের সভ্যতা

বা

হিন্দু-সভ্যতার বাল্মীকি-যুগ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

"কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্ব-পিতামহাঃ।
অজ্ঞাত বাসমুষিতা দুর্য্যোধন ভয়ার্দ্দিতাঃ ॥"

সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস অবগত হইতে স্বভাবতই কুতূহল জন্মে। অদ্য আমরা রামায়ণের সভ্যতা বা বাল্মীকি যুগের বিষয় আলোচনা করিব।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আজকাল য়ুরোপে ইতিহাস এক অভিনব প্রণালীতে লিখিত হইতেছে। তা সে ইতিহাস ব্যক্তিগতই হউক বা জাতিগতই হউক। এখন, অমুক রাজা এতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, অমুক সনে অমুক যুদ্ধ হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তত লক্ষ্য রাখা হয় না। কিরূপে একটা জাতির উত্থান ও পতন হইল, সভ্যতালোক কিরূপে ধীরে ধীরে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া একটা জাতীয় জীবনে প্রসারলাভ করিল, ইহাই ঐতিহাসিকের মুখ্য প্রতিপাদ্য হইয়াছে।

ফরাসী পণ্ডিত টেইন বলিয়াছেন :—"জর্ম্মানিদেশে শত বর্ষের, এবং ফরাসিদেশে গত ষাইট বৎসরের মধ্যে ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটিয়াছে। ইহা জাতীয় সাহিত্য অধ্যয়নেরই একমাত্র ফল।"

মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন :—"প্রত্যেক মনুষ্যই সমগ্র জগৎ হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে। এমন যুগ নাই, মানব সমাজের এমন অবস্থা নাই, অথবা ইতিহাসে এমন কর্ম্মপ্রণালী নাই, যাহার সহিত প্রত্যেকের জীবনের কিছু না কিছু সাদৃশ্য না আছে। * * প্রত্যেক জাতিরই জীবন একই ভাবে তাহার সাহিত্যে, মহাকাব্যে বা গীতিকাব্যে, তাহার নাটকে, দর্শনে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।"

সুবিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সাঁবুফ্ বলিয়াছেন :—"সাহিত্য কেবল কল্পনার লীলা নহে" ইহা জাতীয় চরিত্রের সুন্দর প্রতিবিম্ব।

তবেই দেখা যাইতেছে যদিও হিন্দুজাতির ইতিহাস বলিতে এক "রাজতরঙ্গিণী" ভিন্ন আর কিছু নাই, (এবং তাহা কেবল কাশ্মীর-রাজবংশের ইতিহাস মাত্র)

তথাপি হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য হইতে যে টুকু ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়, তাহাতেই প্রাচীন সভ্যতার একটী পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাইতে পারে।

বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক গ্রোট কিন্তু এ সকল ব্যাপারের বড় পক্ষপাতী নহেন। হোমর প্রণীত ইলিয়দ্ কাব্য হইতে তাৎকালিক গ্রীক সভ্যতার চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে তিনি বলেন যে উহা অতীতের কাল্পনিক চিত্র মাত্র। ("That past which was never present").। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গ্রোট সাহেবের ঐ অভিমত যুক্তিযুক্ত নহে। এতদ্বিষয়ে টেইন প্রভৃতি মনীষীগণ যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লিখিত হইল।

সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া মোক্ষমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে হিন্দু-সভ্যতার চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, তাহা সকল সময়ে নির্ভুল না হইলেও মোটামোটি সত্য সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত "প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" ঐ প্রণালীর উপর নির্ভর করে। আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে যদিও সময় সময় তাদৃশ চিত্রে চিত্রকর আদর্শ অঙ্কণে ব্যস্ত থাকে বলিয়া যাহা ছিল তাহা না লিখিয়া, যাহা হওয়া উচিত তাহাই লিপিবদ্ধ করে, তথাপি যাহার আদৌ ভিত্তি নাই বা অস্তিত্ব ছিল না তাহা কিছুতেই সন্নিবিষ্ট করিতে পারে না। টেলিগ্রাফ, মটোর শকট প্রভৃতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়া। কই, এ সকলের উল্লেখ ত প্রাচীন গ্রন্থে দেখি না। যাহার একবারেই অস্তিত্ব নাই, কল্পনাও তাহা অঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং আমরা রামায়ণ-মহাকাব্য হইতে যে চিত্র উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইতেছি তাহা স্থূলতঃ যথার্থ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইতে পারে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতগণও রামায়ণ মহাভারতকে "ইতিহাস" বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই "ইতিহাস" অর্থ History নহে। উহার বুৎপত্তি— ইতিহা+আস অর্থাৎ "ইতিহা" বা পরম্পরাগত জনশ্রুতির "আস" আসন বা সঞ্চয়। সুতরাং এই মতে রামায়ণের অন্ততঃ গল্পাংশ, জনশ্রুতির সন্নিবেশ। ইহাতে মহর্ষি বাল্মীকি স্বয়ং রামের সমসাময়িক বলিয়া নিজকে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অবশ্যই অযোধ্যা প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহার প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সমগ্র রামায়ণ পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে তিনটী সভ্যতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

১। অযোধ্যা বা আর্য্য-সভ্যতা।

২। কিষ্কিন্ধ্যা বা মধ্যভারতের অনার্য্য সভ্যতা।

৩। লঙ্কা বা ভারতের দক্ষিণ সীমান্তের অনার্য্য সভ্যতা।

ইহার প্রত্যেকটীরই দুইদিক্ আছে। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে Material civilization বলে তাহার চিত্র এবং ফরাসী পণ্ডিত বিখ্যাত গিজো যাহাকে "History of the inner man" অর্থাৎ জাতির চরিত্রগত ইতিহাস বলিয়াছেন— এই উভয় বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

সহজ ভাষায় বলিতে হইলে, মহর্ষি একদিকে যেমন দালান-কোঠা, উদ্যান, দীঘী প্রভৃতির চিত্র দিয়াছেন, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে জাতির নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল তাহাও দেখাইয়াছেন। আমাদের উল্লিখিত এই বিষয়-বিভাগ স্মরণ রাখিয়া আমরা যথাক্রমে তিনটী সভ্যতারই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

(১) অযোধ্যা।

প্রথমতঃ আর্য্য-সভ্যতার বহিরাবরণ দেখা যাউক। কবি অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিম্নে কতক উদ্ধৃত হইল :—

"কোশল দেশে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত অযোধ্যা নাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে নগরী মহাপথে সুবিভক্ত, দ্বাদশ যোজন আয়ত, ত্রি-যোজন বিস্তৃত। যাহার সুবিভক্ত রাজপথ-গুলি নিরন্তর জলসিক্ত ও কুসুমাবকীর্ণ থাকিত। * * * সেই নগরী কবাট-তোরণান্বিত, সুবিভক্তক্ষুদ্রপথপরিশোভিত, নানা-যন্ত্র-অস্ত্র-সমন্বিত। * * * তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ অট্টালিকা, শতঘ্নী, উদ্যান ও আম্রকানন ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে মেখলার ন্যায় শাল বৃক্ষের সারি। তাহার সর্ব্বত্রই স্ত্রী-অভিনীত নাট্যগৃহে পরিপূর্ণ। চারিদিকে গম্ভীর জল-পরিখা। * * * গৃহসমূহ নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল, তাহার কোন স্থানই বাসগৃহ শূন্য ছিল না।" ইত্যাদি—[আদিকাণ্ড, পঞ্চম সর্গ, পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ।]

সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও প্রচুর :—

"দীর্ঘায়ুষে নরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মংসত্যব্‌চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতা পুত্র পৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃপুরোত্তমে॥

অর্থ—মনুষ্যগণ সেই পুরীতে পুত্র, পৌত্র ও পত্নীগণের সহিত দীর্ঘায়ু, ধর্ম্মরত ও সত্যপরায়ণ হইয়া কালযাপন করিতেন।

আমরা মহাভারতের বর্ণিত সমাজের সহিত তুলনা করিলে, রামায়ণের আর্য্য-সমাজকে অনেক বিষয়ে প্রশান্ত দেখিতে পাই। যদিও রচনা হিসাবে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে—তথাপি মহাভারতের সমাজ প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। কি বিবাহ-পদ্ধতি, কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক, কি অন্যান্য কতিপয় আচার-ব্যবহার, সকল বিষয়েই দেখা যায় যে রামায়ণের সমাজে সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া এক শান্তি আসিয়াছে। তবে এরূপ অনুমিত হয় যে যদিও মহাভারত রামায়ণের পরে রচিত (অন্ততঃ কতক অংশ সন্দেহ নাই), তথাপি মহাভারতে ভারতের পাঞ্চাল প্রদেশের সমাজের বিষয় যে বর্ণিত আছে তাহা হয়ত প্রাচীনতর রীতিই অনুসরণ করিতেছিল। এবং অযোধ্যার সমাজ তাহার বহু পূর্ব্বেই সভ্যতার আরও এক সোপানে উন্নীত হইতে পারিয়া ছিল।

রামায়ণের আর্য্য-সমাজের সহিত আমরা যখন প্রথম পরিচিত হই, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের নমস্কার্য্য প্রভু হইয়াছেন। রাজর্ষি জনক আছেন কিন্তু তিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদের জনকের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন না। এই অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিষয় বর্ণিত আছে। কিরূপে বশিষ্ঠের হোম ধেনু শবলাকে হরণ করিতে যাইয়া বিশ্বামিত্র সসৈন্য পরাভূত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের নিকট নতশীর্ষ হইয়াছিলেন, তাহাই কবি দেখাইয়াছেন। তপস্যা দ্বারা অবশ্যই তিনি ব্রাহ্মণত্বে অধিকারী হইয়াছিলেন—কিন্তু ইহা আরও প্রাচীন কিংবদন্তী। সুতরাং বিশ্বামিত্র যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা বলিতেই হইবে। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হন নাই। তাঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা প্রথম ও অন্যান্য সূক্তের ঋষি। যাহা হউক, অনেকটা আধুনিক ভাবে অযোধ্যার সমাজ গঠিত হইয়া গিয়াছে এই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।

"ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যা ক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রা স্বকর্ম্মনিরতা স্ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥

অর্থ—"ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ ত্রি-বর্ণের সেবারূপ স্বধর্ম্মে নিরত ছিল।" [১। ষষ্ঠ সর্গ]

তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে এতই প্রভেদ হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, ক্ষত্রিয় ব্যবহৃত রথে চড়িতেন না তিনি দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন—

"ব্রাহ্মং রথবরং যুক্ত মাস্থায় সুধৃতব্রতঃ।" অযোধ্যাকাণ্ড—৫ম সর্গ। ৪র্থ শ্লোক।

সুতরাং এ সমাজে যে স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তা ও আচরণ হইতে পারে না ইহা বলা বাহুল্য। তাই শম্বূক শূদ্র দ্বিজোচিত তপস্যা করিতে যাইয়া মুণ্ডপাত লাভ করিয়েছে এবং স্বয়ং রাজারই হস্তে।

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসুর্মুহুর্মুহু॥ *

উত্তরকাণ্ড—৮৯ সর্গ। ৫ম শ্লোক।

শূদ্রের কি হইল জানি না কিন্তু ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত-পুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু দশরথের বহু বিবাহ আছে;—কবি ইহার কুফলও দেখাইয়াছেন। রাম প্রভৃতির চারি ভ্রাতার সকলেরই এক এক পত্নী। ইহাদের গার্হস্থ্য জীবন তাই বড় সুখময়। ইহারই ছায়া লইয়া ভবভূতি লিখিয়াছিলেন—

† "ইয়ং গেহে লক্ষ্মী রিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ।
অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দন রসঃ॥"

এ সমাজে অনুলোম বিবাহ নাই। মহাভারতে কিন্তু ভূরি ভূরি। বিরাট রাজ, বিচিত্রবীর্য্য, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ইহার যথেষ্ট উদাহরণ।

কবি তা'রপর সমৃদ্ধ গ্রামের বর্ণনা করিয়াছেন:—

"পরে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম,... বেদধ্বনি নিনাদিত, ধন ধান্য-সমন্বিত, দাতৃগণ সমাকীর্ণ, নির্ভীক, পুষ্পোদ্যান ও আম্রকাননদ্বারা পরিশোভিত, চৈত্য-যূপ-সমাবৃত, নির্ম্মল জলাশয়-সম্পন্ন, হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকীর্ণ, বহুগোকুলপরিব্যাপ্ত, গ্রাম সকল অতিক্রম করিলেন।"

অযোধ্যাকাণ্ড। ৫০ সর্গ।

আহা! শুনিলেও মন শীতল হয়। ভারতের এমন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দিনে, পূর্ব্ব পুরুষের গ্রাম্য সমৃদ্ধি শুনিয়া চোখে জল আসে। "হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ";— নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু প্রভৃতি আপদ ছিল না, বোধ হয় দেশোৎসন্নকারী ম্যালেরিয়াও ছিল না।

---

*। সেই শূদ্র নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া কাকুৎস্থরামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

†। ইনি (সীতা) গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী, ইনি নয়ন যুগলের অমৃত-শলাকা, ইহার স্পর্শ শরীরে যেন চন্দনরস সিঞ্চন করে ইত্যাদি—উত্তর চরিত।

তারপর উন্নত সভ্যতার উপযোগী বহুতর বিলাস-সামগ্রীর কথাও মহাকবি উল্লেখ করিয়াছেন। যখন ভ্রাতৃ-প্রেমিক ভরত রাজ্যের নিপুণ সৈন্য লইয়া রাম-সন্দেশার্থে চিত্রকূট যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে পথিমধ্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। মহাযোগী ঋষি যোগবলে রাজোচিত সমস্ত বিলাসোপচার দ্বারা সসৈন্য ভরতকে সৎকৃত করিয়াছিলেন :—

"গাভী সকল কামদুঘা ও বৃক্ষ সকল মধুস্রবী হইয়াছিল। দীর্ঘিকা সকল স্থালীপাকে উত্তপ্ত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুট মাংসে পরিব্যাপ্ত হইল। সুবর্ণ নির্ম্মিত সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুত পরিমিত ভোজন পাত্র, অর্ব্বুদ সংখ্যক হস্ত প্রক্ষালনোপযোগী পাত্র, জলপান পাত্র, সুমার্জ্জিত দধিপাত্র সকল * * * প্রচুর পরিমাণে ছিল।

"আমলকী চূর্ণ, সুগন্ধি কল্ক (খইল) প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য; অগ্রভাগে কূর্চ্চ যুক্ত শ্বেতবর্ণ দন্ত-কাষ্ঠ সকল (tooth brush), কটুরাতে সংরক্ষিত ঘর্ষিত চন্দন (sandal cosmetic), ধৌত বসন সকল এবং সহস্র কাষ্ঠপাদুকা ও চর্ম্মপাদুকা। অঞ্জন-করণ্ডিকা (সুর্‌মার পাত্র), শ্মশ্রুপ্রসাধন কূর্চ্চ (brush) ছত্র, ধনু, কবচ (mail coat) বিচিত্র শয্যা ও আসন তথায় দৃষ্ট হইল।"

তারপর রাজ্য-শাসন প্রণালী :—রাজা স্বয়ং রাজ্যেশ্বর ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সুশাসন গুণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইত। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে রাজা দশরথ প্রজাবৃন্দ ও অধীন নৃপতিগণকে সাদরে আহ্বান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউক ইহাতে আপনাদের অভিপ্রায় কি? তাঁহারা সকলেই রামের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া একবাক্যে রাজার কথার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু যখন কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে রাজার মত পরিবর্ত্তিত হইল, যখন রামকে বনবাস দিতে রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থিরীকৃত করিলেন, তখন এই প্রকৃতিপুঞ্জ কোথায় ছিল? রোমের সম্রাটগণ যেমন স্বীয় উত্তরাধিকারী মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বয়ং নিয়োগ করিতেন, তেমনই অযোধ্যাপতি, রামকে নিয়োগ করিয়া ঘটনাচক্রে ভরতের যৌবরাজ্যে অনুমতি দিতে বাধ্য হন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যদিও রাজা একাধিপতি ছিলেন, যদিও রোমের সম্রাটদের মত বা ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌সের মত তিনি "মহতীদেবতা" পদ বা divine rights চাহিতেন ও লাভ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ঋষিদিগের মতাবলম্বী হইতে হইত। উহা নাকি রাজ্যের প্রজাশক্তির পার্লেমেণ্ট

ছিল। এ কথা রামায়ণ সম্বন্ধে আমরা স্বীকার করি না। রামায়ণে সেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় রাজকার্য্যে রাজার সহায়তা করিতে "ব্রাহ্মণ পরিষৎ" এর বিষয় উল্লিখিত আছে। অন্যান্য ধর্ম্ম সংহিতায়ও এরূপ দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে উহা ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। রাজ্য শাসন বা আমরা আজকাল political administration বলিতে যাহা বুঝি সে সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। তবে কেবল প্রজার মনোরঞ্জনার্থ রাম সীতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রজাশক্তির নিকট অবনত মস্তক হইয়া নহে।

রাজা কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি জানিতেন উহাই রাজ্যসমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ।

রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত, লোকোহয়ং সুখমেধতে॥"

রাজনীতি, হিন্দুরাজ্যে চিরকালই "রক্ষণশীল" বা conservative. মনু বলিয়াছেন—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

রামও ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহাঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা॥"

রাজ্যশাসন বহু মন্ত্রিতে বিভক্ত হইত। মন্ত্রিগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। এবং মন্ত্র-গুপ্তি প্রভৃতি যে সকল রাজনীতি অবলম্বিত হইত তাহা অধুনাতন রাজনীতি হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে।

এখন আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বিষয় কিছু বলিয়া আমরা আর্য্যসভ্যতার উপসংহার করিব। প্রথমতঃ আমরা সৌভ্রাত্র দেখিতে পাই। নৈতিক চরিত্রও অতি উন্নত। পরস্বাপহরণ দূরে থাক্, রাম স্বয়ং পিতৃদত্ত রাজ্য অক্লেশে তৃণের মত পরিত্যাগ করিলেন। ভরত, রামকে রাজ্য পুনর্গ্রহণ করাইতে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া স্বয়ং সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিলেন। আমরা দেখিতে পাইব, অনার্য্য সভ্যতায় এই সৌভ্রাত্র নাই—এমন উদারতার সম্পূর্ণ অভাব।

কবি বলিতেছেন :—"অযোধ্যা নগরীতে নারী কি নর সকলেই ধর্ম্মশীল,

জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় নির্ম্মল ছিল। অতএব কখন কেহ সেই নগরীতে কামুক, নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, মূর্খ কি নাস্তিক পুরুষকে দেখিতে পাইত না।” ইত্যাদি—আদিকাণ্ড। ৬ সর্গ।

(২) কিষ্কিন্ধ্যা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা মধ্যভারতের অনার্য্য সভ্যতা। সুগ্রীব যে রাজাভোগ করিতেন তাহার বহিরাবরণ আর্য্য সভ্যতারই অনুকরণ মাত্র। কিষ্কিন্ধ্যা অর্থ পর্ব্বত-গুহা বিশেষ। সুগ্রীবের বিপুল ভোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন প্রাসাদ ইহার মধ্যেই অবস্থিত। ইহা পাঠককে হোমরকথিত Cave-people দিগের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

কপি-সেনাপতিগণের প্রাসাদরাজি বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন :—

“পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধ মাল্যাযুতানি চ।
প্রভূতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ।”

অর্থ :—শুভ্রমেঘের মত প্রকাশমান, গন্ধদ্রব্য ও মাল্য সমন্বিত, প্রচুর ধন ধান্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সমলঙ্কৃত।

কবি অযোধ্যা-সমাজ বর্ণনায় যেরূপ নানা বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তেমন কিছুই নাই। সুগ্রীব সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা। বাহ্য সভ্যতাও যে খুব উন্নত তাহা নহে। তবে আর্য্যজাতির অনুকরণে যতটুকু হইয়াছে তাই মাত্র।

কিন্তু, চারিত্রিক ও নৈতিক সভ্যতায় কিষ্কিন্ধ্যা বহু পশ্চাৎপদ। রাম, বালিহত্যারূপ দুষ্কার্য্য করিলেন বটে কিন্তু সুগ্রীব, বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া বিলাসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। পরে রামের ক্রোধ ও অপ্রীতিভাজন হইলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে, তাই বন্ধুকার্য্যে ব্রতী হইতেছেন। রাম, লক্ষ্মণের মুখে, সুগ্রীবের কার্য্যশৈথিল্য দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন :—

“ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।”

বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, মনে রাখিও সুগ্রীব! সে পথ এখনও বন্ধ হয় নাই!

তারপর সৌভ্রাত্রের কথা আর কি বলিব? বালী যতকাল বাঁচিয়াছিলেন ততদিন সুগ্রীব প্রাণভয়ে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, সমুদ্রতীরে, গিরিগহ্বরে লুকাইয়া থাকিতেন। পরে যখন রামের সাহায্যে বালী নিহত হইলেন, তখন সুগ্রীব কেবল ভ্রাতৃরাজ্য নহে, ভ্রাতৃবধূও হরণ করিয়া নীতি ও সৌহার্দ্দের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন! অবশ্যই তারপর সুগ্রীব যুদ্ধক্ষেত্রে বহু চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন

কিন্তু তাহা দাশরথি রামের সাহচর্য্য গুণে। চন্দন সাহচর্য্যে শাখোটকও চন্দনত্ব লাভ করে।

এ সমাজে হনুমান্ একটী আদর্শ চরিত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এই মহাত্মার নাম সকলেরই হাস্যাস্পদ। আমরা হনুমানকে কেবল দীর্ঘলাঙ্গুলবিশিষ্ট কদলীভক্ষক ও সাগরলঙ্ঘনকারী প্রভৃতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। জানি না, কীর্ত্তিবাস ইহার জন্য দায়ী কি না। কিন্তু বাল্মীকির সৃষ্ট হনুমান, মহাপণ্ডিত, মহাবীর, প্রবীণ এবং আদর্শ প্রভুপরায়ণ। তাই পশ্চিম অঞ্চলে মহাবীরের এত সম্মান। হনুমানের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবলের নিকট আধুনিক শিক্ষিতসমাজ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না। অর্দ্ধরাত্রে যখন কপিপুঙ্গব রাবণান্তঃপুরে বিশ্বস্তসুপ্ত রাবণ-রমণীগণকে দেখিতেছেন, অমনি ভাবিতেছেন—ছিঃ বড় অন্যায় করিতেছি।

"নহি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্ত্তিনী।
অয়ঞ্চাত্রময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ॥
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্য্যনিশ্চয় দর্শিনী॥
কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ।
ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্বৈকৃত্যমুপপদ্যতে॥
মনোহি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥"

সুন্দরকাণ্ড। ১১। ৪০-৪৩

ধন্য হনুমানের নীতিজ্ঞান!

(৩) লঙ্কা।

কবি লঙ্কার বাহ্য সভ্যতার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার নিকট অযোধ্যাও পরাজিত। যে বিপুল অট্টালিকা, স্বর্ণপুরী, উদ্যান, সরোবর, আরাম, সেনাগার প্রভৃতি রাবণের বিশাল সম্পদ ঘোষণা করিতেছে তাহার নিকট স্বর্গ-বৈভবও লজ্জায় মলিন। কিং "স্থিতাবিহ স্বর্গ পুরং মঘোনঃ।" অশোক-বনিকার বর্ণনার নিকট আধুনিক ইডেন গার্ডেনও পরাজিত। চতুর্দ্দশ লুইর বিলাসকানন সমন্বিত ভার্সেলের প্রাসাদও মহর্ষির উদ্দীপ্ত কল্পনার নিকট লাঞ্ছিত। বিলাসী পরস্ত্রীহারক রাবণের অন্তঃপুর বাইরণের ডন্‌জোয়ানের বা আর্‌নোল্ডের লাইট অব্ এসিয়াতে বুদ্ধের অন্তঃপুরের সহিত তুলিত হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বনবাসী তপস্যা-নিরত মহর্ষি ওরূপ বিলাস-লীলার চিত্র কেমন করিয়া অঙ্কিত করিলেন। বস্তুতঃ দৈবী প্রতিভার অসাধ্য কি আছে?

কিন্তু এ সকল বাহ্য আবরণ ভিতরের অধর্ম্ম ও বীভৎস জীবন গোপন রাখিতে সমর্থ হয় নাই। লঙ্কার রাজ্য অধর্ম্ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। মনুষ্য-হৃদয়ের যতগুলি পাপপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে রাবণ এবং তাঁহার পরিবারস্থ প্রায় সকলেরই তাহা বিদ্যমান।

আত্মসংযম অযোধ্যার ধর্ম্ম। যথেচ্ছচার লঙ্কার নীতি।

সীতা বলিতেছেন :—

* "আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্ম্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্।" আরণ্যকাণ্ডম্ ৯ সর্গ ৩১।

রাবণ সেই সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

† "স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমাথ্যচ"

* * * *

‡ পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং
ধন নিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীং চ। ত্বয়ি চ সমেত্য লভন্তু বান্ধবাস্তে॥"

রাম বনবাসী হইলে, ভরতও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাবণ নিহত হইলে বিভীষণ দ্বিরুক্তি না করিয়া ভ্রাতৃরাজ্যে বা আত্মীয়ের শ্মশানে স্বয়ং অভিষক্ত হইলেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ একই মন্ত্রে দীক্ষিত।

অধর্ম্মের রাজ্যে ধর্ম্মের প্রভাব নাই। তাই বিভীষণ পদাহত হইয়া দাশরথি রামের শরণগত হইলেন।

ধর্ম্মের লেশ নাই বলিয়া মহর্ষি, রাবণ-সংসারকে বীভৎসবর্ণে চিত্রিত

---

* সুদক্ষ মানবেরা অতিশয় যত্ন সহকারে নিয়মদ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্মলাভ করেন; কারণ শারীরিক সুখপ্রদ উপায়দ্বারা সুখ-হেতু ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

† ভীরু! বলপূর্ব্বক পরপত্নী হরণ বা পরদার গমন রাক্ষসদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

‡ পান, বিহার ও বিষয়ভোগে নিরত হইয়া নিজের মনোমতজনে ধরা ও ধনরাজি দান কর। ললনে! তোমার যাহাতে সুখ হয় তুমি আমার নিকটে তাহা প্রার্থনা কর; পরে তোমার আত্ম-বান্ধবগণ আসিয়া অভিলষিত বিষয় লাভ করুক। (সুন্দরকাণ্ড। ২০ স)

করিয়াছেন। এমন কি রাক্ষসদিগের নামগুলি পর্য্যন্ত বীভৎস। রাবণ (লোক-বিত্রাসক); কুম্ভকর্ণ (কলসের মত কাণ যাহার); অতিকায়; মহোদর; তালজঙ্ঘা; সরমা (কুক্কুরী); শূর্পনখা (কুলার মত নখ যা'র) ইত্যাদি আর কত বলিব?

ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের চিরকালই পরাজয়। রাবণের এমন ইন্দ্রোপম ঐশ্বর্য্য থাকিতেও, রাবণ সবংশে নিহত হইয়াছিল। কবি দেখাইলেন, অধর্ম্ম গৌরবের অতি উন্নত শিখরে আরোহণ করে বটে, কিন্তু তাহার কারণ আর কিছু নহে যত ঊর্দ্ধে তাহার উন্নতি তত নিম্নে তাহার পতন।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে উন্নতিশীল আর্য্যসভ্যতা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এবং অনার্য্যসভ্যতা অধর্ম্মমূলক। বাহ্য আবরণ, সদৃশ হইলেও, অভ্যন্তর বড় বিভিন্ন। অনার্য্যসভ্যতা যে আর্য্যেরই অনুকরণ তাহার মাত্র আর একটী উদাহরণ আমরা না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বিরাধ রাক্ষস রামকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহার দেহের সৎকার সম্বন্ধে বলিতেছে—

"অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ।
রক্ষসাং গত সত্ত্বানাং এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

অর্থ—হে রাম তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার দেহ গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া এখান হইতে প্রস্থান কর। কেন না গতপ্রাণ রাক্ষসদিগের উহাই সনাতনরীতি। (অর্থাৎ কবর দেওয়া)। কিন্তু আর্য্যানুকরণে রাবণের মৃতদেহ সংস্কৃত হইতেছে :—

"রাক্ষসগণ দুঃখিতচিত্তে রাক্ষস-রাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক, রাঙ্কবাস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন-দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করিল * * তৎপরে শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে পবিত্র পশু হননপূর্ব্বক তাহার চর্ম্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলে * * বিভীষণ যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিলেন।" লঙ্কাকাণ্ড। ১১৩ সর্গ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের এমন দুর্দ্দিনে প্রাচীন সভ্যতা, আচার পদ্ধতি, রীতিনীতির যতই আলোচনা করা যায় ততই আমাদের কল্যাণ হইবে। আমাদের কি অতুল সম্পদ ছিল, কি চরিত্রের বল ছিল, নৈতিক জীবনে আমরা সভ্যতার কি উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম তাহাই স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

ভারতে কার্পাস।

ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ত তুলার আদিস্থান। চীন ও জাপানে রেশম এবং ইউরোপে পশমের উন্নতি অনেক দিন হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট শাল, গালিচা প্রস্তুত হইয়াছে বটে কিন্তু ইউরোপের (উল) পশম যে প্রকার পরিষ্কৃত, নরম ও বর্ণযুক্ত, ভারতে তাহা কোন সময়েই হয় নাই। ঢাকার মসলিন জগদ্বিখ্যাত ও তুলনা রহিত। যে খানে যাহা সম্ভব, পৃথিবীতে অনেক সময়ে সেখানে তাহাই হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের জল বায়ু বস্ত্র বয়নের অনুকূল; তাই তথায় সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ঢাকার মসলিন কিশোরগঞ্জের তঞ্জাব এক সময়ে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ এ দেশে আনিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে যে তুলা হইতে সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা প্রস্তুত হইত, তাহা জন্মিত কোথায়? জন ক্রফোর্ড "History of the Indian Archipelago" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মেঘনার তীরে ৪০ মাইল লম্বা ও ৩ মাইল প্রস্থ স্থানে মসলিনের তুলা জন্মিত। ডাক্তার রকমবার্গ তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর এই তুলার চাষ হইত এবং ইহার আঁশও অপেক্ষাকৃত লম্বা ছিল। এখন উন্নতবস্ত্র লম্বা আঁশযুক্ত তুলাদ্বারা যে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয়, তাহা মসলিনের সূতা ৪টী একত্র করিলে যাহা হয় তাহার সমান। এই সূতা টাকুয়ার সাহায্যে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে মোটা যেটী তাহা ২৫০ নম্বরের নীচে নহে। আর সূক্ষ্ম যেটী তাহা ৩৫০ নম্বরেরও উপরে। কি প্রকারে অপেক্ষাকৃত ছোট আঁশের তুলা হইতে এই সূতা প্রস্তুত হইত তাহা ইউরোপীয় শিল্পকরের ধারণার অতীত। বর্ত্তমান সময়ে যে সূতার কল আছে, তদ্দ্বারা ঐ প্রকার তুলা হইতে এত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা অসম্ভব।

কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই তুলা জন্মে। দেশভেদে তুলা নানাপ্রকার। এক সময়ে মেঞ্চেষ্টারের কলের জন্য যে তুলার প্রয়োজন হইত, তাহার অধিকাংশ ভারতবর্ষ হইতে যাইত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোকে আমেরিকার তুলার কথা জানিত না। ঐ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে এক জাহাজে ৮ বস্তা তুলা আইসে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ৭৩১৪৫৬ বস্তা তুলার আমদানী হয়। আমেরিকার তুলা ভারতের তুলাকে পরাজিত করিয়াছে। আমেরিকার কৃষকেরা উন্নত প্রণালীর কৃষির সাহায্যে তুলার চাষের উন্নতি করিয়া তুলার একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছে। তাহারা

উচ্ছাগত মেঞ্চেষ্টারের নিকট দাম নিতেছে। এবার শতকরা পনর টাকা দাম চড়াইয়াছে। সেই সঙ্গে বিলাতী সূতা ও কাপড়ের দাম চড়িতেছে। তাহাতে ইংরেজ অনেকটা বিব্রত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে তুলার উপযোগী স্থান প্রচুর পরিমাণ থাকিতে ইংরেজ কেন আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইবেন, এই প্রশ্ন শুনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে তুলার চাষ হইতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট-এসোসিয়েন্স স্থাপন করিয়া তুলার বীজ বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রশ্ন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল। তখন একবার ভারতে তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল।

মেজর জেনারেল জন ব্রিজস্ তাঁহার "কটন ট্রেড অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন—ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শিখযুদ্ধ ও সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কৃষির উন্নতি চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকেন। অধুনা শুভক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকার ধন-কুবের মেঃ ফিপস্ ভারতে কৃষির উন্নতিকল্পে ৪ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তুলার চাষের প্রতি কৃষি বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

দেশের লোকে চেষ্টা না করিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। তুলার চাষের উপর লোকের দৃষ্টি পড়া স্বদেশী আন্দোলনের একটী শুভ-ফল। অনেকে মনে করেন—কবে এ দেশে তুলার চাষ হইবে, কবে ঐ সকল তুলা কল-কারখানায় ব্যবহৃত হইয়া সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইবে।—সে অনেক দিনের কথা। এ দেশের কৃষক ভাল মন্দটা বেশ বুঝে, বক্তৃতাটা বুঝে না সত্য। নূতন প্রণালীতে আঁকের চাষ, আঁকের কল তাহারা কেমন ধরিয়াছে। পাটের চাষ কয় দিনের। ৩ বৎসরের মধ্যে দেশময় তুলার চাষ হইয়া যাইতে পারে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কোনও ফরাসী ইজিপ্তের কোনও বাগানে একটী বীজ ফেলিয়াছিলেন; ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইজিপ্ত হইতে একশত পঞ্চাশ হাজার বস্তা তুলা রপ্তানী হইয়াছিল। আজ তিন বৎসর মাত্র বাহামাজ প্রভৃতি আমেরিকার দ্বীপে সি-আয়লেণ্ড-তুলার চাষ হইতেছে। ১৯০২ সনে তথায় ৪০০ একর, ১৯০৩ সনে ৪০০০ একর, ১৯০৪-৫ সনে ১৪০০০ একর চাষ হইয়াছে। বিদেশ হইতে বীজ আনিয়া ভারতবর্ষে রোপণ করা যায়। তাহার উপযোগী স্থান ভারতে আছে। সিন্ধু প্রদেশে ইজিপ্তের তুলা বেশ জন্মিতেছে। বিদেশ হইতে বীজ না আনিয়া এ দেশের স্বভাবজাত উৎকৃষ্ট তুলার চাষ করাই সঙ্গত। বিদেশ হইতে বীজ আনিলে তাহা এ দেশের জলবায়ুর উপযোগী হইবে কি না বলা যায় না।

তুলার গাছ সাধারণতঃ তিন প্রকার। এক প্রকার ওষধি জাতীয়, যাহা বৎসর বৎসর বুনা হয় এবং তুলা হইলে গাছ মরিয়া যায়। গারো পাহাড়ে ও ময়মনসিংহ মধুপুরের জঙ্গলে ইহার চাষ আছে। দ্বিতীয় প্রকার গুল্মজাতীয়, এক বার গাছ হইলে ৪।৫ বৎসর থাকে। ব্রাহ্মণী তুলার গাছ ইহার অন্তর্গত। বাঙ্গলায় ইহা গ্রামে গ্রামে অনেক দেখা যায়। এই জাতীয় গাছেরও দুইটী শ্রেণী আছে। একজাতীয় গাছের বীজ তুলার সহিত জড়াইয়া থাকে; বীজ ছাড়ান কষ্ট। অপর জাতীয় গাছের বীজ সহজে ভিন্ন হইয়া যায় এবং উৎপন্ন তুলা কোমল ও অপেক্ষাকৃত লম্বা আঁশযুক্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলার আবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরও এক প্রকার বৃক্ষজাতীয় তুলার গাছ আছে। ইহা ১২ ফুট হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহাতে তুলার কলার ন্যায় কোষ জন্মে। এক একটী কোষে অনেক তুলা হয়। কোনও কোনও গাছের বীজগুলি একত্র ৮।১০টী থাকে। ইহার একটী গাছ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পিংনায় আছে। কোনও কোনও গাছের বীজ একত্র থাকে না কিন্তু সহজে ছাড়ান যায়। ইহার একটী গাছ টাঙ্গাইলের নিকট চাকলন গ্রামে আছে। এই গাছ তুলা কোমল ও লম্বা আঁশযুক্ত। ইহা ইজিপসিয়ান অথবা সি-আইলেণ্ড হইতে নিকৃষ্ট নহে। ইহা বাঙ্গলার স্বভাবজাত। বিগত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্সে ইহাকে ভারতবর্ষীয় তুলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তুলার গাছ জলে মরিয়া যায়; যেখানে জল যায় না, এমন স্থানে বুনিতে হইবে। এই গাছ একাদিক্রমে ১২ বৎসর পর্য্যন্তও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

তুলার আঁশের কোমলতা, দৃঢ়তা ও দৈর্ঘ্যের উপর তাহার মূল্য নির্ভর করে।

ইজিপসিয়ান	১.২৫	হইতে	১.৬৫	ইঞ্চি	লম্বা
সি-আইলেণ্ড	১.২	„	১.৬৫		
আফলেণ্ডজর্জ্জিয়া	১	„	১.৩		
নিউঅর্লিন্স্	১	„	১.২		
বেরার তুলা	.৮৫	„	১.১		

আমেরিকার বার্বেডোজ প্রভৃতি দ্বীপে এক লক্ষ একর জমি আছে, তাহার ½ অংশে তুলার চাষ হইতে পারে। ইজিপ্তও একটী বৃহদায়তন দেশ নহে। ভারতবর্ষে তুলার চাষের উপযোগী জমি সর্ব্বত্র আছে। তুলা নানাপ্রকার, তাহার উপযোগী জমিও নানাপ্রকার। পাহাড় হইতে সমতল ভূমির সর্ব্বত্র তুলা জন্মিতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তুলা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়।

সকল প্রকার তুলারই প্রয়োজন আছে। এক এক কাজে এক এক প্রকার তুলা ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্ম সূতার জন্য উৎকৃষ্ট তুলা চাই। কিন্তু মোটা সূতা নিকৃষ্ট তুলা হইতেও প্রস্তুত করা যায়। বোম্বাই প্রদেশে, মধ্যভারতে, পঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে, মান্দ্রাজে ও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তুলা জন্মে। ভারতের তুলার চাষের উন্নতিতে আমেরিকার ভীত হইবার কথা। এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে এই ভীতির পরিষ্কার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভারতের শিল্পকর চতুর; ভারতে শ্রমের মূল্য কম। ভারতে তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে বলিয়া এন্সাইক্লোপিডিয়াকার আশঙ্কার কথা তুলিয়াছেন; ভারতে কল প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য সকল স্থানের অনিষ্ট হইবে তাহাও দেখাইয়াছেন। বোম্বাইর কলের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সূচনা দেখাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে বহু পরিমাণে কলের তাঁত বসান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু চরকার কল সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ফ্লাইসাটলই করা হউক আর জাপানী তাঁতই বসান হউক, দেশের সূতা না হইলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। সূতার কল না হইলে তুলার চাষেও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। মেঃ হ্যেভেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্সে চরকার কলের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

মেঞ্চেষ্টারে সূতার কল ভাল চলিতেছে; কেন না, ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তথাকার বায়ু আর্দ্র। বাঙ্গালার জল-বায়ু বিশেষ রকমে আর্দ্র। এখানকার সূতার কলে ভাল সূতা হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ৩০ কোটি টাকার তুলা জন্মে। তুলার চাষ বৃদ্ধি করা চাই। সার ইত্যাদি দ্বারা প্রতি বিঘায় তুলার উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে। কীটে তুলা নষ্ট করে; তাহার প্রতিকারের জন্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এদিকে গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। দেশের মঙ্গলের কথা।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়াতে নীলের চাষ আর হইতেছে না। গাছের আঁশকে কৃত্রিম তুলায় পরিণত করার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে গাছের আঁশ "কটনাইজ" করা বলে। কৃত্রিম তুলা হইতেও ভারতের লোকের ভয়ের কোনই কারণ নাই। ভারতে তুলা ছাড়া দুই প্রকার গাছের আঁশ আছে, যাহা হইতে সূতা করা যাইতে পারে। আনারসের চাদর, কলার সূতার রুমাল ময়মনসিংহ সারস্বত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। পাট, শণ,

উলটকম্বল, স্থলপদ্ম, কনকুড়া, মুকুটঝার, আনারস, দোয়াচক্র, কেওয়া, পিপলবট, কদম প্রভৃতি গাছের ছাল ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ। ভারতের প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকারে মানবজাতির অনুকূল। জানি না কার অভিশাপে এই মহাদেশবাসী জন সমূহ সভ্যজগতের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। সভ্যতার মূল—শক্তি, শক্তির মূল—অর্থ; অর্থের মূল—কৃষি ও শিল্প। বাণিজ্যের কথা বলিলাম না। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইলে, বাণিজ্য আপনা হইতে আইসে। মানুষের প্রথম অভাব খাওয়া, দ্বিতীয় অভাব পরা। পরিধেয় বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হইলে ভারতে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে হইবে ও কল-কারখানা করিয়া ঐ তুলা পরিধেয়-বস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

সারস্বত-সমিতি।

পরমকারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদে ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতি ঊনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিল। ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় সারস্বত মিলিত হইয়া নিভৃতে এই নগরে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, আজ সেই ক্ষুদ্র বীজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া সকল সম্প্রদায়কে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। সারস্বত-সমিতি কোন জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে। ময়মনসিংহবাসী মাত্রেই সারস্বত-সমিতির দেহ; ব্যবহারাজীব, শিক্ষক, চিকিৎসক ইহার মস্তিষ্ক; জমিদারগণ ইহার রুধির; রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার অস্থিমজ্জা; স্বাধীন ব্যবসায়িগণ ইহার হৃদয়; শিক্ষিত মাত্রেই ইহার শ্বাসযন্ত্র; কৃষি-শিল্পী বাহুবল এবং ছাত্রবৃন্দ ইহার অনুরাগ। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সুখ-সম্মিলন ইহার বীজমন্ত্র, জননী জন্মভূমির জন্য চেতনার সঞ্চার ইহার উদ্বোধন, জাতির উন্নতি ইহার উপাসনা, জাতীয়জীবন সংগঠন ইহার ধ্যান, জাতীয়গৌরব প্রতিষ্ঠা ইহার প্রার্থনার বিষয়। এ যাবৎকাল সারস্বতগণ এই ভাবই মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

ঊনত্রিংশ বৎসরের একটী সভা যে কোন স্থানের গৌরবের পরিচায়ক। সারস্বত-সমিতি ময়মনসিংহের প্রকৃত গৌরবের নিদর্শন। আজ সংক্ষেপে এই ঊনত্রিংশ বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আজ ঊনত্রিশ বৎসর ময়মনসিংহ সারস্বত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১২৮৪ সনের ২৬শে মাঘ বাসন্তীপঞ্চমী দিবসে মুড়াপাড়ার জমিদার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নসিরাবাদস্থ ভবনে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। স্বর্গীয় কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র স্ব-রচিত "বাণী-বন্দনা" পাঠ করিয়া সারস্বতের প্রথম উদ্বোধন করেন।

প্রথম বৎসর উৎসব অতি সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আয়োজনের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্যোগ হয়। স্বর্গীয় কবি দীনেশচন্দ্র সেন স্ব-রচিত "মহামায়ার চিত্রপট" নামক কবিতা পাঠ করেন, অন্যান্য সম্মিলিত সারস্বতগণ রচনা ও বক্তৃতাদি পাঠ করেন।

তৃতীয় বর্ষে সমিতি পূর্ব্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসব দিনে কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস সারস্বত কবিতায় বীণাপাণির আরাধনা করেন। সে বার উৎসবে ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম, কুস্তী, লাঠিখেলা, পাখীর লড়াই প্রভৃতির জন্য পুরস্কার বিতরিত হয়। উৎসবে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও "নব নাটক" হইতে বহুবিবাহের বিষময় ফল প্রভৃতি নীতিপ্রদ কতিপয় অঙ্ক সুন্দররূপে অভিনীত হয়।

চতুর্থ বর্ষ হইতে সমিতি উদ্ভিজ্জ ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীর সহিত ব্যায়াম, প্রবন্ধ পাঠ, কুস্তী, লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড়, হাতীদৌড়, জীবন্তরাগ প্রদর্শন এবং অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস "সারস্বত কবিতা" পাঠ করেন ও চারুমিহিরের বর্ত্তমান সম্পাদক (তৎকালে ছাত্র) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সোম "জাতীয় সম্মিলন" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উপস্থিত সারস্বতগণ বক্তৃতাদি প্রদান করেন। সমিতির কার্য্য তিন দিন স্থায়ী হয়। এবার খরচ ও পুরস্কারাদিতে প্রায় সাড়ে ষোল শত টাকা খরচ হয়। হোসেনপুর হইতে একটী মহিলা সুপারীর নানাবিধ জিনিস দিয়াছিলেন। মিসেস্ চার্লস এই সুপারীর কাজ ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য লইয়া যান।

৫ম পঞ্চম বর্ষে সমিতি মেড়ার লড়াই ও মোরগের লড়াই উঠাইয়া দিয়া, দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার উৎসাহের জন্য ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। দুঃখের বিষয় কোন পণ্ডিত উপস্থিত হন নাই। এবার জীবন্ত রস প্রদর্শন ও সরোজিনী নাটকাদির অভিনয় হয়। কৃষি বিভাগের বিশেষ উন্নতির জন্য সমিতি ব্যবহারিক এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ জন্য অর্থদান করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। বাবু শশিভূষণ গুহের লিখিত "আদর্শ কৃষি" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ পুরস্কার যোগ্য হয়

ও সমিতির ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত হয়। এইবার সারস্বত-সভা অতি বিরাট আকারে হইয়াছিল। তখনকার স্থানীয় পত্রিকা "ভারত মিহির" লিখিয়াছিলেন, এত বড় সভা কেবল ময়মনসিংহ কেন ভারতবর্ষের রাজধানীতেও অল্প হইয়া থাকে।

১২৮৯ সনে সমিতি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেন। সমিতি এ বর্ষে গত বৎসরের কার্য্য প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। উদ্ভিজ্জ, দেশীয় কারুকার্য্য, দেশীয় মহিলা নির্ম্মিত শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শন, ঘোড়দৌড় এবং অভিনয় ইত্যাদি ভিন্ন ও পশু পক্ষী প্রদর্শন এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রালোচনাও এ বৎসরের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত যিনি ময়মনসিংহের একখানা ইতিহাস লিখিতে পারিবেন, সমিতি তাঁহাকে একশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সমিতির কার্য্য পূর্ব্বানুরূপ তিন দিন স্থায়ী ছিল।

১২৯০ সনে আত্ম-কলহে সারস্বতের কার্য্যে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যায় ও কোনরূপে তিন দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

১২৯১ সনে অষ্টম বর্ষে সমিতি পুনরায় স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। এবার সারস্বতগণ কলিকাতা হইতে দেশীয় সার্কাস আনাইয়া উৎসবের অঙ্গ সৌষ্ঠব করিতে চেষ্টা করেন; নানা কারণে চেষ্টা সফল হয় নাই। সারস্বতগণ "আনন্দমঠ" অভিনয় করেন। অভিনয়ের শেষাংশে "ভারতের ভবিষ্যৎ ছায়া" বলিয়া যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হইয়াছিল। "মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে" এ দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। পরঃ-পরঃ-ভাবের বিস্মৃতি-বিরহিত আনন্দ মঠের আনন্দময়ী ময়মনসিংহের মৃতপ্রাণে এক নবভাব প্রদান করিয়াছিলেন।

এতকাল সারস্বতের নিজের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। হার্ডিঞ্জ-স্কুলের সম্মুখে বর্ত্তমান জজ কোর্টের স্থানে সাময়িক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তিন দিনের কার্য্য সমাপন করা হইত। সারস্বতের স্থানের অভাব দেখিয়া, ১২৯৫ সনে শ্রীযুক্ত মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর এক দানপত্র দ্বারা সমিতিকে নসিরাবাদ নগরে একখণ্ড ভূমি দান করেন। এইরূপ ভূমিদান পাইয়াও সারস্বত অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে থাকে। এবং অষ্টাবিংশ বর্ষে প্রায় নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হয়।

১৩১১ সনের বাসন্তীপঞ্চমীতে সারস্বত অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করে।

কিন্তু অর্থাভাবে সারস্বতগণ সে সময়ে প্রদর্শনী ও আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে সারস্বত প্রদর্শনী হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহকগণ সারস্বতের বার্ষিক কার্য্য শেষ করেন।

এ বৎসর নির্ব্বাণোন্মুখ সমিতিকে সজীব করিবার চেষ্টা হয়। সারস্বতগণের সে বিপুল চেষ্টায় সারস্বত-সমিতি অষ্টাবিংশ বর্ষে নবজীবন লাভ করেন। ২৮ বৎসরের বিপুল অধ্যবসায় ও যত্নে সমিতি অভিনব শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিপুল যশের অধিকারী হন। অষ্টাদশ বর্ষে সারস্বত কৃষি শিল্পের সহিত এ জেলায় সাহিত্যেরও এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-প্রদর্শনী ময়মনসিংহের বিপুল যশ-গৌরব ও পণ্য সম্ভারের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী হওয়ায়, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লোকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ সারস্বত-উৎসব এই কারণেও স্বীয় যশ উপার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ বৎসর পাঁচ দিন প্রদর্শনী রাখিতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীর স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দর্শকগণ হইতে টিকেট বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহের বন্দোবস্ত ছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে সারস্বত উনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৪ই মাঘ সারস্বতক্ষেত্রে সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমিতির উনত্রিংশ বর্ষের অধিবেশন হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল "ভারতে কার্পাস" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৫ই মাঘ সিটিকলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্-এ, বি-এল "রামায়ণের-সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৬ই মাঘ ৮ ঘটিকার সময় সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক মহারাজ সূর্য্যকান্ত প্রদত্ত সারস্বতক্ষেত্রে সারস্বত-গৃহের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়। একখানা "চারুমিহির" একখানা "আরতি" ও একখানা "স্বদেশ-সম্পদ" ও প্রচলিত মুদ্রা, একটী পাত্রে পুরিয়া ভিত্তির নিম্নে প্রোথিত করা হয়। মহারাজা বাহাদুর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিহিত অনুষ্ঠানে ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। তখন নহবৎ বাজিতে ছিল এবং তৎসঙ্গে ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল।

সোমবার প্রদর্শনী গৃহ উন্মুক্ত হয়। এবারের প্রদর্শনী গত বারের ন্যায় বহুমূল্যবান্ দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে দেশের একটা জাগ্রত শক্তির আভাস অনুভূত হইয়াছিল। প্রদর্শিত

প্রত্যেক পদার্থে জাতীয়জীবনেরও কার্য্যকরী শক্তির পূর্ণমূর্ত্তি বিকশিত হইয়াছিল নানা জাতীয় কার্পাসের বীজ, কার্পাসের বৃক্ষ, বীজ ছাড়াইবার কেরকী, সূ ভাঙ্গিবার চরকা, টাকুয়া, নানাজাতীয় কার্পাসের তুলা, টাকুয়া ও চরকার প্রস্ত মিহি ও মোটা সূতা, ঐ সকল সূতার বস্ত্র। দেশী বস্ত্র—২০ নম্বরের মো হইতে ২৫০ নম্বরের সূক্ষ্ম সূতার কাপড়। ঠক্‌ঠকির তাঁত, মোজার কল, গু সূতার কল, কলার সূতা, কলার সূতার রুমাল। এণ্ডি পোকা, সূত এণ্ডিবস্ত্র। গুটীপোকা-রেশম ও রেশমী সূতা, কনকুড়া সূতা, চুকাই গাছে সূতা, বৈদ্যরাজের তৈল, জমাট দুগ্ধ, দেশী নিব্, পেন্সিল, ছুরী, বোতা হেণ্ডেল, দীপকশলাকা ইত্যাদি। এইগুলি এবারকার প্রদর্শনীর বিশেষত্ব— দেশের স্বকীয় শক্তির পরিচায়ক।

১৭ই মাঘ মঙ্গলবার মহিলাদিগের জন্য প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। সারস্ব মহিলা-সম্মিলনীর ইহা দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব বলিলেও বলা যাইতে পারে সারস্বত-সমিতি গত বর্ষ হইতে ভদ্রমহিলাদিগের জন্য এই সুযোগ করিয় দিয়াছেন। গত বর্ষে টিকেট ছিল, এবার টিকেটের বন্দোবস্ত ছিল না। এবারকা মহিলা-প্রদর্শনীতে আরও একটী বিশেষত্ব ছিল। মহিলারা যাহাতে আপন পছ মত সু[illegible] মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য সমিতি ভদ্রমহিলাগণ দ্বার জিনি[illegible] বিক্রয় করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু মহিলা তাহাই[illegible] আমোদ স্বচ্ছন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। সমিতি বাজার হইতে কাপ যে[illegible] সিন্দুর, গন্ধতৈল, সাবান, কাগজ, আল্‌তা প্রভৃতি ও কমলা, কুল প্রভৃতি ফল ও করিয়া আনিয়া বাজারদর হইতে কম মূল্যে ব্রাহ্মমহিলাদিগের দ্বারা বি করাইয়াছিলেন। সমিতির এ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে বালক বালিকা সহ উপস্থিত সংখ্যা প্রায় সহস্র হইয়াছিল। ১০ বৎসরে ও তন্নিম্ন বয়স্ক বালকগণ ভলান্টিয়ারের কার্য্য করিয়াছিল।

বুধবার পুনরায় পুরুষদিগের জন্য প্রদর্শনী খোলা হয়। বৃহস্পতিবা প্রদর্শনী বন্ধ হয়।

এবারও সিটিস্কুল ও কলেজগৃহে প্রদর্শনী হইয়াছিল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা। আজকাল ক্ষুদ্র গল্পের অভাব নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যে ক্ষুদ্র গল্পের খরস্রোত আসিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সুখপাঠ্য ক্ষুদ্র গল্প আমরা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। ক্ষুদ্র গল্প লিখা বড় সহজ কার্য্য নহে। অতি সামান্য ত্রুটিতেই ক্ষুদ্র গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষুদ্র গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে দোষটা অতি সুস্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। ফটো তুলিতে যেমন একটু আলো অধিক হইলে অথবা একটু আলো কম হইলে চিত্র খারাপ হইয়া যায়; লেন্সটা ঠিক না হইলে প্রতিকৃতি নিতান্ত বিকৃত ও বিশ্রী হয়; তেমনি ক্ষুদ্র গল্পে সামান্য অসামঞ্জস্যে সমস্ত মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় এবং গল্প অতিশয় নীরস এবং কদর্য্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র গল্প লিখিতে গিয়া অনেকে আবার উপন্যাসের মত বহু ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র গল্প একটী চিত্র মাত্র। একটী ঘটনাকে শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্যে পরিস্ফুট করিয়া ফুটাইয়া তোলাই ক্ষুদ্র গল্পের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র গল্প লিখিতে এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরোজকুমারী দেবীর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং পূতিগন্ধময় প্রেমকাহিনীর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ দোষ দুষ্ট নহে। দুই তিনটী গল্পে লেখিকা, স্নিগ্ধ-শীতল দাম্পত্য-জীবনের নয়নাভিরাম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র নারীহৃদয়েরসহৃদয়তা এবং মাধুর্য্য বড়ই রমণীয় হইয়াছে। সরোজকুমারীর ভাষা বড়ই মধুর এবং ভাষার চাতুর্য্যে গল্পের সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৫ম বর্ষের 'আরতি'র বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি উপহার পাইয়াছি।

চারুমিহির, স্বদেশ-সম্পদ, হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সন্ধ্যা, বান্ধব, Amrita Bazar Patrika, Weekly Chronicle, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, প্রদীপ, সাহিত্য-সংহিতা, সাহিত্য-পরিষৎ, বীরভূমি, অর্চ্চনা, নবনূর, ধূমকেতু, প্রতিজ্ঞা, প্রসূন, ব্রহ্মবাদী, স্বদেশ-হিতৈষী, সুলতান, বঙ্গলক্ষ্মী, ধর্ম্মপ্রচারক, অবসর, শিল্প-সাহিত্য, কল্যাণী, স্বদেশ, স্বদেশী, ঐতিহাসিক-চিত্র, ইন্দিরা, বাণী, গোয়ালন্দ-সুহৃদ, প্রচার, নববিকাশ, খৃষ্টীয়-বান্ধব, বসুধা, বীরভূম-বার্ত্তা,

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন ১৩১২। } দ্বিতীয় সংখ্যা।

সাহিত্য-সেবার প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দী প্রধানতঃ বিজ্ঞান-যুগ। জড়-সভ্যতার উন্নতির দিনে শিল্প ও বাণিজ্য মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের বহিরুন্নতির এক মোহকর শোভা দেখা যায়। ইহা আজকাল সমগ্র জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এমন একদিন গিয়াছে যখন সাহিত্য গৌরবময় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। বিজ্ঞান, দীন-কাঙ্গালের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাটন করিয়া বেড়াইত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান, সাহিত্যের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার প্রতিশোধ লইতেছে। এখন সাহিত্য নিভৃত কোণগত। আর বিজ্ঞানের অটুট সাম্রাজ্য, বিপুল বৈভব।

কিন্তু প্র[illegible] দৃষ্টিতে সাহিত্যের যেমন অনাদর দেখা যায় বস্তুতঃ তাহাই? হ[illegible] পারে, বিজ্ঞানের অধুনাতন বিপুল প্রভাব। কিন্তু সাহিত্য যে নিভৃত কোণ আলোকিত করিয়া আছে, তাহা চির জ্যোতির্ম্ময়, উপাদেয় ও সুখপ্রদ।

সাহিত্য কি এবং কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। তবে স্থূলতঃ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে চিত্তের উন্[illegible] পড়িলেই বিদ্যা ভাবগুলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ও নৈতিক জীবন সমক্[illegible]য়া উঠে। কিন্তু সাহিত্য। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার ফল পুস্তক-লব্ধ বিদ্যাই হৃদয়ের, কল্পনা ও করুণভাবগুলি প্রখর করে বলিয়া, জগ[illegible]। উহা, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সাহিত্যের প্রধানতম কার্য্য। [illegible]ederick Harrison স্বাভাবিক। ইহা শিশুতেও বর্ত্তমান। আর সা[illegible] ও দেখা যায় যে প্রচুর প্রাচীন ঋষি ও পুরাতন গ্রীকদিগের মধ্যে উহা সবি[illegible] দেও কথিত আছে:—

গ্রীকের যে সকল মনোহর পুরাণ-কাহিনী (Mythology) জগৎ মুগ্ধ করিতেছে, তাহার মূলে বিস্ময়-মিশ্রিত এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান।

সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য এই যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিদ্বারা হৃদয়কে উন্নত করা। মনে করুন, নীতিশাস্ত্রের উপদেশ আছে "অহঙ্কার করিও না"। উহা হয়ত স্মরণ রহিল, খুব সম্ভব আমরা ঐ নীরস কথাটা ভুলিয়াই যাইব। কিন্তু কবি যখন দেখাইলেন ইন্দ্রতুল্য রাবণও অহঙ্কারে অধঃপতিত হইল, মহাতেজস্বী শয়তান অহঙ্কারের কুফল স্বরূপ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইল, তখন আমরা "নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ" এই সত্যটীর যেমন সুন্দর উপলব্ধি করিতে পারিব এরূপ আর কিছুতেই হইবে না।

সুতরাং সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। নৈতিকচরিত্র গঠন, আমোদ উপদেশ একই সূত্রে প্রদান করা এবং সর্ব্বোপরি মানবচরিত্রের নানারূপ চিত্রাঙ্কন সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য কার্য্য। যিনি যে পরিমাণে মনুষ্যকে দেবোপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই পরিমাণে জগৎ তাঁহার নিকট ঋণী। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য কবিগণ যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও লোকশিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা আজ অমর পদবীতে আরূঢ়। ...নি মানব-জীবনের দুই একটী জটিল প্রশ্নও মীমাংসা করিয়া দিয়া, তাঁ...বনভোগের সহায়তা করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য ও মানুষের কৃতজ্ঞতা-কৃ...ন। ঈশ্বর-প্রেমিক "হাফেজ", চির-সৌন্দর্য্য-মগ্ন, আনন্দ-কবি "সাদী", ...্যোতির্ব্বিদ কবি "উমর খাইয়ম্‌" পারস্য-জগতের নক্ষত্র এবং পৃথিবীতে অমর। হিন্দু বল, গ্রীক্‌ বল, মুসলমান বল, ইংরেজ বল, যিনিই মনুষ্যজীবনের অপূর্ব্ব ...গুলি সুন্দর ভাষায় জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন তিনিই মানবজাতির পূজার যোগ্য সন্দেহ নাই।

মানবচরিত্র অসীম, হৃদয়ের বৃত্তিগুলি অনন্ত, সেইজন্য কাব্য এবং
...বহুরূপী ...লেও আদরণীয়। তাই ক্ষুদ্র গীতিকাব্য-প্রণেতা হইতে
উপহার পাইয়াছি ...েই মানুষের উপকারী; সকলেই সমাজের শিক্ষক।

চারুমিহির, স্ব... অসৎ গ্রন্থের কথা না বলিয়া থাকিতে ...ছি না।
Amrita Bazar P...
...থা। মিষ্টভাষী পাষণ্ডকে যেমন আমরা বিশ্বাস করি না
প্রদীপ, সাহিত্য-সংহি...
প্রতিভা, প্রসূন, ব্রহ্মবা... লজ্জিত হই, সেইরূপ মুখ-মধুর, অশ্লীল গ্রন্থও কি
অবসর, শিল্প-সাহিত্য, ক... আদর্শকবির কথা লিখিতে যাইয়া একজন আদর্শকবি
...র গোয়ালন্দ-সুহৃদ,
...জন্মভূমি

"Blessings be with them and eternal praise,
Who gave us nobler loves and nobler cares,
The Poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight by heavenly lays."

তাই অসৎসংসর্গের ন্যায় অসৎগ্রন্থ পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জীবনে সার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে সময় অতিবাহিত করা যায় তাহাই সুষ্ঠু ব্যয়িত হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

এই সম্পর্কে উপন্যাস পড়া উচিত কি না এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। অনেকে উপন্যাস-বিরোধী। ইহা যেমন অন্যায় পক্ষপাত, তেমনই অনিষ্টকর। উপন্যাস গদ্যকাব্য। অবশ্যই আমরা শ্রেষ্ঠশ্রেণীর উপন্যাসের কথাই বলিতেছি। আজকাল বাজারে 'প্রমোদিনী', বিনোদিনী, প্রভৃতি অসম্ভব গোয়েন্দা-কাহিনী বাহির হইতেছে—তাহা আমাদের পরম শত্রুকেও পড়িতে বলি না। উহাতে যেমন চরিত্রহানি হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ উহা পড়িলে মন এত অবনত হইয়া পড়ে যে, বঙ্কিমের "আনন্দমঠ" পড়িতেও প্রবৃত্তি হয় না। রবি বাবুর "রাজর্ষি"ও অসার বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী পড়াত দূরের কথা। বাঙ্গালাসাহিত্যে কি কি পড়া উচিত তাহা বলিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইবে এবং পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ সকল বিষয় বারান্তরে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন একদিকে শীতল চন্দন-ছায়া বিদ্যমান, তেমন অপরদিকে তৃণাচ্ছন্ন কূপ বা সুকণ্টক প্রান্তরেরও অভাব নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রের এই শেষোক্ত স্থানগুলি পরিহার করিয়া চলাই কল্যাণকর। আবার অনেকের বিশ্বাস, পুস্তক পড়িলেই বিদ্যা হইল। যত বেশী বই পড়া যায় ততই নাকি বিদ্যার মাত্রা বাড়িয়া উঠে। কিন্তু আমরা বিনীতভাবে এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, পুস্তক-লব্ধ বিদ্যাই একমাত্র জ্ঞান নহে। প্রকৃতজ্ঞান কেবল পাঠ-সাপেক্ষ নহে। উহা, অভিজ্ঞতা, আলোচনা ও বিচারের উপর নির্ভর করে। তাই Frederick Harrison বলিয়াছেন, "বেশী পড়িলেই বেশী জ্ঞান হয় না ; এমনও দেখা যায় যে প্রচুর পুস্তকপাঠী ব্যক্তি একটী মূর্খ বিশেষ।" হিন্দু আয়ুর্ব্বেদেও কথিত আছে :—

"যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথাহি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥"

অদ্য আমরা উপসংহার করিলাম। বারান্তরে পাঠকগণকে গ্রন্থনির্ব্বাচন সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রস্তাব উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

একখানি পুরাতন কাগজ।

শুক্তি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কদাচিত মুক্তা মিলে; ছাই উড়াইতে উড়াইতে কখনও রত্ন পাওয়া যায়; এ কথা মিথ্যা নহে। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আশায় কিছুদিন গলিত জীর্ণ কাগজ বা দুর্গম অরণ্যের ইষ্টক স্তূপাদি পোৎসাহিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা ভাল জানেন। অল্পদিন হইল আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একখানি গলিত জীর্ণ কাগজ পাইয়াছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া গৌর লীলায় গোস্বামী ও মহান্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী অর্থাৎ আবির্ভাব, তিরোভাব, গৃহবাস, সন্ন্যাস প্রভৃতির বর্ষ পরিমাণ ও শক ইহাতে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কাগজ খানির সম্পূর্ণ অবয়ব আমরা পাই নাই, এবং যাহা পাইয়াছি তাহারও সমুদয় অংশ পঠন যোগ্য নাই। যতদূর পড়িতে পারা যায়, অদ্য আমরা বঙ্গীয় ঐতিহাসিক বৈষ্ণবগণের নিকট তাহাই উপস্থিত করিলাম। হয়ত, এই আলোচনার ফলে কোনও ভাগ্যবান্ এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর পূর্ণাবয়বের অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

জীর্ণ পত্রের ভাষা অবিকল লিখিত হইল।

১। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাইশ চতুর্যুগের পরে, দ্বাপরের শেষে বাসুদেব যোগে ব্রজ—কলি প্রথমে মথুরা দ্বারকাতে স্বয়ং আবেশে। নরলীলা বাসুদেব রূপে প্রকট

দ্বাপরের শেষে ১১

কলির প্রথমে ১১৪৷৹

১২৫৷৹

জন্ম যাত্রা—ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী-নবমী যোগে।

২। শ্রীমতী রাধিকার জন্ম যাত্রা—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী।

৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর

জন্ম শকাব্দা— ১৪০৭

অগোচর শকাব্দা— ১৪৫৫

স্থিতি— ৪৮

বিতং—

গৃহে— ২৪

তীর্থদর্শন ৬

নীলাচলে— ১৮

৪৮

আবির্ভাব—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

অপ্রকট—আষাঢ়ী হোরা পঞ্চমী।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর

আবির্ভাব— ১৩৮২

অগোচর— ১৪৮৭

স্থিতি— ১০৫

বিতং

বীরভদ্রপুরে—১৮

তীর্থে— ২১

নীলাচলে ৬

পুনঃ গৃহে— ৫০

১০৫

৫। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্ম— ৭৩৭

অগোচর— ১৪৮৭

স্থিতি— ৭৫০

ইহো অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। আবির্ভাবের নিয়ম নাই।
তিরোভাব কার্ত্তিকা অমাবস্যা দীপান্বিতা। (ক্রমশঃ)

শ্রী[illegible]চন্দ্র বসু।

কাহিনী।

পাহাড়ের উচ্চ ভূমির উপর দর্শার আদালত গৃহটী সুন্দর শোভা পাইতেছে। সেই উচ্চ ভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্ব প্রক্ষালিত করিয়া কুদ্রস্রোতা তারাই তরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে শস্য-শ্যামলা প্রান্তর ভূমি—নীল, পীত, হরিত বসনে ভূষিত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কাছারীগৃহের বামে—অনতিদূরে "দীঘলদীঘি"। "দীঘলদীঘির" তীরে বহুমূল্য চন্দ্রাতপ খাটান। চন্দ্রাতপ তলে বহুমূল্য কিংখাপ খচিত ফরাস, কিংখাপের তকিয়া, সুবর্ণছত্র। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র সিপাহী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সেই সুবর্ণ ছত্র তলে বহুমূল্য স্বর্ণ পরিচ্ছদে সুশোভিত এক গম্ভীর মূর্ত্তি বিরাজিত। সে মূর্ত্তি রাজোচিত কিন্তু চিন্তাক্লিষ্ট এবং অস্থিরচিত্ত।

কাছারীগৃহের দক্ষিণে আর একখানা অধিকতর কারুকার্য্য খচিত বস্ত্রগৃহ। ইহার চতুর্দ্দিক আবদ্ধ। অভ্যন্তরে বিরাট মজলিস, যেন আমির উমরাওগণের বিরাট রঙ্গভূমি। পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের বহুল আয়োজনে সুসজ্জিত, আতর ও কস্তুরী-গন্ধ ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে চরসের ধূম কুণ্ডলিকারে উত্থিত হইয়া চাটুকারগণের ব্যাদিত বদনে প্রবেশ করিতেছে, তাহারাও তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত বদন ব্যাদন করিয়া গ্রহণ করিতেছে। ধূমপানকারী নিমীলিত-নেত্রে খোস-মেজাজে পারিষদগণের কথায় মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছেন। সে মূর্ত্তি দিব্যকান্তি—বিষাদবর্জ্জিত।

আজ দর্শার আদালত-গৃহ লোকসমুদ্রে পরিপূর্ণ। সকলেই একইভাবে মগ্ন, কি জানি হয়! দর্শকগণের উৎসুকচিত্ত ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল। বিচারক কাজিসাহেব বিচারালয়ে বিচারকার্য্যে মনোযোগী।

অপরাহ্নে বিচারক কাজিসাহেব বাদী ও প্রতিবাদীকে ডাকিয়া রায় শুনাইলেন।

রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

রহিম ইয়ার	বাদী।
রণ সিংহ	প্রতিবাদী।

---

* "ময়মনসিংহ-কাহিনী" হইতে গৃহীত।

দাবী—মুলুকে সুসঙ্গ মর পাহাড় ও গড় আগর।

যেহেতুক মুলুকে সুসঙ্গের রাজতক্তের হক্‌দার মালীক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তরিবতে পবিত্র ইছলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সরামতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে সেই ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে রহিম ইয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং রহিম ইয়ার মুলুকে সুসঙ্গের রাজতক্তের হক্‌ মালিক বটে।

যেহেতুক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তরিবতে পবিত্র ইছলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিহিত বিধানমত আবদুর রহিম নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার হিন্দু স্ত্রী (প্রতিবাদীর গর্ভধারিণী) তাহাকে অপমানিত করিয়া রাজধানীর বাহির করিয়া দেন। সুতরাং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এইরূপ অবৈধ ব্যবহার জন্য হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেও রাজামজকুরের সেই স্ত্রী পরিত্যাজ্যা।

পরিত্যাজ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার স্বত্বে হক্‌দার হইতে পারেন না।

অতএব আদেশ হইল যে—

আজ রোজ হইতে মুলুকে সুসঙ্গের বিস্তৃত রাজত্ব মর পাহাড় কড়িবাড়ী ও মহাল মর গড় আগরের মালিকী যাহা রাজা রামসিংহ ওরফে আবদুল রহিমের হক্‌দারে ছিল তাহা তাহার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র রহিম ইয়ার প্রাপ্ত হইলেক। ইতি

কাজিসাহেবের রায় শুনিয়া দর্শকগণ একবারে বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

২

সুসঙ্গের শূন্য সিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত। রাজা রামসিংহ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রণসিংহ সুসঙ্গের পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিতে প্রয়াস পান। এদিকে রামসিংহের মুসলমান পত্নীর ঔরসজাত পুত্র কুমার রহিম ইয়ারও সিংহাসনের দাবী করিতেছেন। যথাসময়ে মুর্শিদাবাদ হুজুর সেরেস্তায় উভয়পক্ষই সিংহাসনের দাবী উপস্থিত করিলে, নবাব নাজিম বিচারভার দর্শার কাজির হস্তে ন্যস্ত করেন। অদ্য দর্শার কাজিসাহেবের নিকট তাহারই শুনানীর দিনধার্য্য ছিল। কাজির বিচারে কুমার রহিম ইয়ার সুসঙ্গ-রাজত্বের ষোল আনার মালীক সাব্যস্ত হইলেন ও কুমার রণসিংহ পৈতৃকরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন।

৩

দিল্লীর সেই বিশাল দেওয়ানীখাস। ভারতের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসনে শোভিত প্রদীপ সাহ আলম উপবিষ্ট। পাত্রমিত্রগণের অভাব না থাকিলেও সে সুবিশাল দেওয়ানীখাস যেন জনশূন্য নিষ্প্রভ। দিল্লীশ্বরের এখন ইংরেজ-বণিক্‌দিগের আব্দার রক্ষা করাই একমাত্র কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাদেশিক আবেদন নিবেদন এখন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। দিল্লীশ্বর এখন নামে জগদীশ্বর মাত্র।

রাজা যশোবন্ত রাও একটী পরিণত বয়স্ক যুবককে লইয়া কুর্ণিস করিতে করিতে সিংহাসনের সম্মুখীন হইলেন এবং সম্রাটসমীপে নিবেদন করিলেন। "সুবে বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব সীমাস্থ মুল্ক সুসঙ্গের পঞ্চহাজারি গারোভাদি জমিদার দিল্লীশ্বরের অনুগতভৃত্য রাজা রামজীবনের বংশধর এই যুবক দিল্লীশ্বরকে সসম্মান অভিবাদন করিতেছে।" যুবক নতজানু হইয়া ভূপৃষ্ঠ লুণ্ঠিত হইল।

রাজা যশোবন্ত রাও বলিতে লাগিলেন—"বাদশাহের সনন্দপ্রাপ্ত ও অনুগত সুবে সুসঙ্গের জমিদারগণ ২৫০০ জাত ও ১২৫ সোয়ারের মুন্সফ প্রাপ্তির অধিকারী। আবেদনকারীর পিতা রাজা রামকৃষ্ণ ও এই মুন্সফি যথোচিত সম্মানের সহিত ভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কালগ্রস্ত হওয়ায় আবেদনকারী তৎসমস্ত বিষয়ে পিতৃস্থানীয় হইয়া বাদশাহের কৃপা ও সনন্দ প্রার্থী হইয়াছে।" যুবক পুনরায় নতজানু হইয়া ভূপৃষ্ঠ লুণ্ঠিত হইলেন।

রাজা যশোবন্ত বলিতে লাগিলেন—"বাদশাহভোগ্য আগর মুল্ক সুসঙ্গের এই অনুগত জমিদারগণই সরবরাহ করিয়া থাকে। বাদশাহের আদেশ হইলে শ্রীমান বীরসিংহও বাদশাহের সনন্দের বলে পিতৃস্থান ও সম্মান বজায় রাখিয়া নিয়মমতরূপে বাদশাহী কর প্রদান করিতে পারে।"

বীরসিংহ পুনরায় নতজানু হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

যথাসময়ে দরবার ভঙ্গ হইল।

অতঃপর বীরসিংহ, রাজা যশোবন্ত রাওয়ের অনুগ্রহে সফলকাম হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সহমরণ।

আমরা কে সাহেবের গ্রন্থাবলম্বনে একটী সতী-কাহিনী "আরতি"র পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই সহমরণ কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠির পার্শ্বেই ঘটিয়াছিল। কুঠির কতিপয় সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা তারিখে মহারাষ্ট্র কুলোদ্ভব রামচাঁদ পণ্ডিত কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর ছিল। তৎকালে রামচাঁদের পত্নী জীবনের মাত্র ১৭ কি ১৮ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই তাঁহার সহগামিনী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন। কিন্তু সতী তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রামচাঁদ একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কুঠির অধ্যক্ষ রাসেলের পত্নী রামচাঁদের সহধর্ম্মিণীর সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে বহু যত্ন করিলেন, তাঁহার অভাবে শিশু সন্তানগুলির (তাঁহার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স ৪ বৎসরের অধিক ছিল না) অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে এবং অনলস্পর্শে জীবন বিসর্জ্জন কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তিনি আপন সঙ্কল্পে পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। তখন আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বল প্রয়োগে নিবৃত্ত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সতী অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িতা হইলেন, কিয়ৎকাল পরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন। তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়া মরিতে দিবে না, কিন্তু আমি অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে তাদৃশ দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রামচাঁদের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইল। বেলা দশ ঘটিকার সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী তিন জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং বহুসংখ্যক দর্শক পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন। কিন্তু অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় রাজাদেশ-বাহক-কর্ম্মচারী সেখানে আগমন করেন। এই মধ্যবর্ত্তী সময় সতী, পূজা-অর্চ্চনায় এবং গঙ্গাস্নানে যাপন করেন। রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া সতী স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন

কি না, তাহাই প্রথমতঃ নবাবের অভিপ্রায়ানুসারে অনুসন্ধান করেন। রাজাদেশ প্রাপ্তি মাত্র তিনি পূজা অর্চনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়দের নিকট গমন করেন। তাঁহাদের সহিত কথা-বার্ত্তায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তারপর সতী অঙ্গাভরণ খুলিয়া লইয়া তৎসমুদায় একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা সম্মুখভাগে পেটির মত বান্ধিলেন। তিনি নিরাভরণা হইলে, আত্মীয়গণ তাঁহাকে সজ্জিত চিতার এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন। শুষ্ককাষ্ঠ, শাখা ও পত্রদ্বারা চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। চিতার এক পার্শ্ব সতীর প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত ছিল। চিতামধ্যে শায়িত মৃত দেহের মস্তক উন্মুক্ত-পার্শ্বের বিপরীত দিকে স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণগণ চিতার একপার্শ্বে একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিলেন। প্রজ্জ্বলিত কুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তিনজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। সতী তাঁহাদের নিকট কিয়ৎকালের জন্য উপবিষ্টা রহিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে উপাচার সহ একটী বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। তিনি তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; তারপর আর একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে আর একটী বিল্বপত্র অর্পণ করিলেন। তিনি এ বিল্বপত্র অগ্নি-শিখার উপর ধারণ করিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণ তদুপরি তিনবার ঘৃত নিক্ষেপ করিলেন; অগ্নির উত্তাপে ঘৃত তরল হইয়া কুণ্ডে পতিত হইতে লাগিল। এই সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ ও সতীকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সতী সমুদায় প্রশ্নের উত্তরই ধীরভাবে ও প্রশান্ত চিত্তে প্রদান করেন। ইউরোপীয় দর্শকগণ এই সময় তাঁহার অতি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু তখন চতুর্দ্দিকে এত গণ্ডগোল হইতেছিল যে, তাঁহারা সতীর উত্তরের একটী বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই। এই সকল ক্রিয়ার পর সতী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন; এই সময় ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তৃতীয়বার অগ্নি-কুণ্ডের নিকট উপনীত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, হস্তের অঙ্গুরী ও পদের পাশুলী খুলিয়া লইয়া অন্যান্য অলঙ্কারের সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি গম্ভীরভাবে পুত্র কন্যা, পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতলিপ্ত সলিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া চিতার উন্মুক্ত পার্শ্বে গমন করিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। সতী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর সতী চিতায় আরোহণ করিলেন। তিনি চিতায় আরোহণ করিয়া একান্ত ভক্তিভরে মৃত পতির পদতলে প্রণত হইলেন, তারপর অগ্রসর হইয়া

তাঁহার মস্তকের নিকট উপবেশন করিলেন। সতী স্বামীপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরমুহূর্ত্তেই চিতার তিন স্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পূতচিতা আবরণ করিল।

"ভস্মসাৎ নরদেহ;—চিতানির্ব্বাপণ
ধূলায় মিশিল ধূলা; জীবনে জীবন।"

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

হুমায়ুনের বঙ্গ-বিজয়।

(৩)

পরদিবস সম্রাট হুমায়ুন সমগ্র বাহিনী সমভিব্যাহারে নগর পরিত্যাগ করিয়া অভয়পুরের সমতলক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করেন। তথায় সম্রাট সৈন্যগণের অবস্থা পরিদর্শন করতঃ যাহারা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হইয়াছিল, অস্ত্রাগার হইতে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি প্রদান করেন; * পরে তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বশুদ্ধ ৯০,০০০ হাজার অশ্বারোহী তথায় সমবেত হইয়াছে। সম্রাট প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দকে নানাবিধ খেলাৎ প্রদানে সম্মানিত করতঃ আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের নিমিত্ত সমস্ত সেনানীর উৎসাহ উদ্দীপ্ত ও তেজস্বিতা প্রজ্জ্বলিত করেন। দুই এক দিন পথ অতিক্রম করিয়া মোগলবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত কনোজনগরে উপনীত হয়; তথায় সংবাদ পাওয়া যায় যে, শের খাঁ নদীর অপর তীরে শিবির সন্নিবিষ্ট করতঃ অবস্থান করিতেছেন। এই সময় আরোলের নরপতি রাজা পার্‌বেহান সংবাদ দেন যে, যদি সম্রাট পুট্‌ নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে তিনি তাঁহার সমস্ত বাহিনীসহ মোগলসৈন্যের সহিত মিলিত হইবেন। হুমায়ুন রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কনোজের নিকট নদী উত্তীর্ণ হইতে সকলকে আদেশ করিলেন।

মহরম মাহার ১০ই তারিখ মোগলসৈন্য তূর্য ও ভেরী নিনাদ করিতে করিতে গঙ্গা অতিক্রম করে। মোগলবাহিনীর দক্ষিণভাগ যুবরাজ হিন্দল, বামপার্শ্বে

---

* ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"The Soldiers found their own horses and arms, but this was a gratitutions act of his Majesty."

যুবরাজ আসকারী এবং মধ্যভাগ স্বয়ং সম্রাট আফগানদিগের প্রধান বৃহ লক্ষ্য করিয়া চালনা করিলে শের খাঁর পুত্র জেলাল যুবরাজ হিন্দলের, খোয়াজ খাঁ যুবরাজ আসকারীর এবং আফগানগণের প্রধান বৃহ সম্রাটের গতিরোধার্থ অগ্রসর হয়। এই প্রবল দুই বাহিনীতে তথায় যে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে এ দুর্ব্বল লেখকের ক্ষীণ লেখনী অশক্ত।

(গ্রন্থকার জোহর এখানে কতিপয় পারস্য-কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

কিয়ৎক্ষণ তুমুল সংগ্রাম চলিবার পর, হুমায়ন সংবাদ পাইলেন যে, যুবরাজ হিন্দল আফগানগণ কর্তৃক অতিশয় বিব্রত এবং আসকারী বামপার্শ্ব হইতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মীর্জ্জা হায়দার সম্রাটকে বলিলেন যে, স্বপক্ষের অসমর্থ পলাতকগণকে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার সুবিধার জন্য, বৃহের মধ্যস্থলে যে শিকলদ্বারা পথরোধ করা হইয়াছে তাহা পৃথক করিয়া দেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্রাট এই মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। এই অবসরে একজন আফগানসৈন্য কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সম্রাটেরদিকে অগ্রসর হইয়া, হস্তস্থিত বর্ষাদ্বারা সম্রাটের অশ্বের কপালে বিষম আঘাত করিল। এই আকস্মিক আঘাতে অশ্বটী পশ্চাৎ ফিরিয়া এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, কিছুতেই তাহাকে বাগে আনা গেল না।

হুমায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন তিনি তাঁহার অশ্বকে শান্ত করিলেন, তখন আফগানগণ তাঁহার গাড়ীর জিনিসপত্র লুণ্ঠনে ব্যাপৃত। তিনি একবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু স্বপক্ষের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া তাঁহাকে নদীর তীরে লইয়া যায়। অতঃপর কি ভাবে কার্য্য করা যায়, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সম্রাট, পিতার আমলের একটী বৃদ্ধ হস্তী দর্শন করিয়া, নিকটে আনিতে মাহুতকে আদেশ করেন। হস্তী নিকটবর্ত্তী হইলে সম্রাট তাহাতে আরোহণ করতঃ হাওদাস্থিত এক খোজাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজা জানাইল যে, তাঁহার নাম—কাফুর। অবশেষে সম্রাট মাহুতকে নদী উত্তীর্ণ হইতে আদেশ করিলে, মাহুত আপত্তি করিয়া বলে যে, এ হস্তী নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; জলে নামাইলেই ডুবিয়া যাইবে। মাহুতের কথা শুনিয়া খোজা গোপনে সম্রাটকে বলে যে তাহার সন্দেহ হইতেছে—মাহুত তাঁহাকে আততায়ীর হস্তে সমর্পণ করিবে। অতএব তাহার শিরচ্ছেদ করাই যুক্তিসঙ্গত। সম্রাট বলিলেন—

"তাহা হইলে আমরা হস্তীকে নদী পার করিব কেমন করিয়া ?" খোজা উত্তর করে,—"আমি হাতী চালাইতে একটু একটু জানি।" * খোজার বাক্য শ্রবণ করতঃ সম্রাট অসি নিষ্কাষিত করিয়া হতভাগ্য মাহুতকে এমনি সাংঘাতিক প্রহার করিলেন যে, সে হাতীর উপর হইতে গড়িয়া জলে পড়িয়া গেল এবং খোজা হাওদা হইতে বহির্গত হইয়া হাতীর স্কন্ধে উপবেশন করতঃ নদীতে হাতী নামাইয়া দিল। সম্রাট হুমায়ুন নিজেই বলিয়াছিলেন যে, নদীর অপর তীরে উপনীত হইয়া দেখেন যে, নদীর পাহাড় অমনি উচ্চ নীচ যে কোন স্থান দিয়াই উপরে উঠা যায় না। অবশেষে কতিপয় শিবিররক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের উষ্ণীষের একপ্রান্ত উপর হইতে নামাইয়া দেয়। সম্রাট তাহারই সাহায্যে বহুকষ্টে করিয়া উপরে উঠেন। অতঃপর সম্রাট অশ্বারোহণে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন।

পূর্ব্বোক্ত শিবির প্রহরী যাহার প্রত্যক্ষ আজ্ঞাধীনে কার্য্য করিত, তাহারা উভয়ে সহোদর ভ্রাতা। তাহাদের মধ্যে এমনি সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল যে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অবলোকন করিয়া সম্রাটের হৃদয় ভ্রাতৃ-বিরহে আকুল হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে হুমায়ুন নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার উন্নত ভ্রাতৃ-প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—"The colourmen were two brothers who seemed so affectionate to each other, that it aroused a sympathy in my breast, and I became very anxious for the safety of my brother Hindal and my other connections. In about an hour, the arrow of my prayer hit the butt of consent, for my dear brother came and paid his respects on which I returned thanks to the Almighty God by whose single command of *Be*! the whole universe was instantly produced." †

---

* বীরমান রাজগণ স্বহস্তেই হস্তী চালনা করিতেন। লক্ষ্ণৌর এক সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, অযোধ্যা-রাজও স্বয়ং হস্তী চালাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে স্বহস্তে হস্তী চালনা করা সম্ভ্রান্তব্যক্তির পক্ষে অপমানজনক বিবেচিত হইত।

† ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন,—"The kuran states that when the Almighty created the universe, he merely said Kun, *Be* and it was."

যাহা হউক সম্রাট যুবরাজ হিন্দাল ও আসকারী এবং মীর্জ্জা যোদগার প্রভৃতির সহিত প্রফুল্ল অন্তরে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীন্‌গাঁয়ে উপনীত হইলে, বিধ্বস্ত সেনাদলের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন-প্রিয় একদল কৃষক আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের একজন তীর নিক্ষেপে মীর্জ্জা যোদগারকে * আহত করে। আঘাতপ্রাপ্তে মীর্জ্জা যুবরাজ আসকারীকে বলেন,—"আপনি এই গ্রামবাসিগণকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন, আমি ক্ষত স্থানটী জড়াইয়া লই।" যুবরাজ মীর্জ্জার এই কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন কিন্তু মীর্জ্জাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও প্রত্যুত্তরে রূঢ় ভাষায় যুবরাজকে আপ্যায়িত করেন। যুবরাজ মীর্জ্জার পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তস্থিত অশ্ব-চাবুকদ্বারা মীর্জ্জাকে দুই তিন ঘা বসাইয়া দেন কিন্তু মীর্জ্জা অবাধে এই চাবুক হজম করিতে না পারিয়া মায়সুদ যুবরাজকে প্রত্যর্পণ করেন।

সম্রাটের কর্ণে এই অশুভ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিলেন,—"দস্যুগণের প্রতি আক্রোশ এইভাবে পরস্পরের প্রতি তাহারা নিয়োজিত করিল। যাহা হইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকে যেন এইরূপ ঘটনা আর না শুনিতে হয়।

যাহা হউক, সম্রাট নিরাপদে আগ্রায় উপনীত হইয়া সৈয়দ রফি উদ্দীন নামক এক ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির ভবনে অবতরণ করিলেন। রফি তৎক্ষণাৎ রুটি, ফুটি প্রভৃতি আহারীয় সম্রাটের নিমিত্ত আনয়ন করিলেন কিন্তু সম্রাট যুবরাজ হিন্দাল ও অপরাপর ভৃত্যবর্গকে, দুর্গ হইতে তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে এবং ধনরত্নাদি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

এই স্থানে যুবরাজ কামরানের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করায় প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, সম্রাট আগ্রা পরিত্যাগকালে কামরানের প্রতি নগর রক্ষা ও দেশ শাসনের ভার অর্পণ করিয়া যান। সসৈন্য সম্রাটের প্রস্থানের কিয়দ্দিবস পর, যুবরাজ পীড়িত হন। আগ্রার জলবায়ু

---

* এই সময় তাইমুরের বহুতর বংশধর এবং চেঙ্গিজ খাঁরও কতিপয় বংশীয় হিন্দুস্থানে আগমন করতঃ মীর্জ্জা উপাধি গ্রহণ করে। এবং নামের পশ্চাতে উপাধি থাকার রীতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সকলেই এই রীতি অনুসরণ করে নাই। এই গ্রন্থে যোদগার প্রভৃতি নামের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই মীর্জ্জা ব্যবহৃত হইয়াছে। মীর্জ্জা যোদগার সম্রাটের এক আত্মীয়া সহিত পরিণীতা হন।

তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল এইরূপ স্থির করিয়া যুবরাজ অনেকগুলি রাজ-কর্ম্মচারী লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লাহোরে গমন করেন। তথায় বসিয়া তিনি যে সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের সূচনা করেন, তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

সম্রাট পানাহার করতঃ শ্রান্তিদূর করিলে পূর্ব্বোক্ত সৈয়দ তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন—"এই পৃথিবীর কার্য্যকলাপ কখনো প্রবহমান জলস্রোতের ন্যায় আবার কখনো স্থির সরোবর সলিলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আপনার এ স্থান পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত।" তিনি তৎপর সম্রাটকে একটী সুন্দর ঘোটক প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সম্রাট অশ্বে আরোহণ করতঃ ফতেপুর শিক্‌রী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে যুবরাজ হিন্দাল তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অভিনন্দন করতঃ একখানি মূল্যবান ছোরা এবং একখানি ভিতরে মোড়া তরবারি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। যুবরাজ উক্ত অস্ত্রনিচয় আগ্রার মেলাখানা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমদিন সম্রাট পরলোকগত সম্রাট বাবরের উদ্যানে অবস্থান করেন। এই উদ্যানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে শিক্‌রী পর্ব্বত হইতে একটী তীর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। কোন্ ব্যক্তি এই তীর নিক্ষেপ করিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত সম্রাট দুইজন অনুচর তদাভিমুখে প্রেরণ করেন কিন্তু শীঘ্রই তাহারা উভয়ে আহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে অথচ কাহাকেও দেখিতে পায় না।

সম্রাট রাজদ্রোহীতার সন্দেহ করতঃ সত্বর ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া চুনি-পল্লী উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সময় সম্রাটের সমভিব্যাহারে নিজ পরিজনবর্গ ব্যতীত দুই একজন কর্ম্মচারী ছিল। এই কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনের নাম ফকীর আলি, সে নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সম্রাটের আগে আগে যাইতেছিল। সম্রাট ফকীর আলীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমারই পরামর্শে (বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে) গঙ্গা উত্তীর্ণ হই। তথায় তোমার মৃত্যু হইলে আমি সুখী হইতাম! তুমি এখন কি সাহসে আমার আগে আগে যাইতেছ? এতৎশ্রবণে ফকীর আলি নিজের অশ্ব ঘুরাইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করতঃ সৈন্য শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে গমন করিল।

সম্রাট নির্ব্বিঘ্নে চুনিয়াতে উপনীত হইয়া কেন্‌নীর নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে যুবরাজ আসকারী আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি

জানিতে পারিয়াছেন শের খাঁ তাঁহাদের অনুসরণে ফেরিদ গোরকে সসৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন ; বিপক্ষীয়েরা অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং অবিলম্বে সম্রাটের এখান হইতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য এবং যুবরাজ অবশিষ্ট অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার প্রস্থানের সহায়তা করিবেন। সম্রাট তদনুসারে অশ্বে আরোহণ করিয়া রওনা হইলেন ; কিন্তু অনুচারবর্গ ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহাদের কেহই জানে না কি করিতে হইবে, অপরকে সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হয় না, পুত্র পিতারদিকে ফিরিয়া চায় না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব মূল্যবান জিনিসপত্র লুকাইতে ও পলায়ন করিতে যত্নবান। তাহাদের বিপদের মাত্রা বাড়াইতে আবার মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে পুনরায় প্রভাতের কনক কিরণ দেখিতে পাওয়াগেল।

সম্রাট যখন জানিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীতিবিহ্বল হইয়াছে তখন তিনি অশ্ব থামাইয়া যুবরাজ ও পলায়নাবশিষ্ট ওমরাওগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল অংশের লোক আমার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাহাদের কতক চোসারের যুদ্ধে, কতক কনোজের যুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা। এমতাবস্থায় তাহাদের দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি করার অপেক্ষা আমি নিজকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। আমি এখন অতি সাবধানে প্রস্থান করিব এবং আশা করি তদ্দ্বারা আমার বিশ্বস্ত অনুচরগণের জীবন রক্ষা পাইবে।" অতঃপর তিনি সকলকে অবতরণ করিতে আদেশ করিয়া তিন অংশে সৈন্যশ্রেণী বিভাগ করিলেন। দক্ষিণ বিভাগ যুবরাজ হিন্দলের অধীনে, বামভাগ যোগদার মীর্জ্জার হস্তে এবং মধ্যভাগ নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্দ্দেশ করিয়া এবং অপর কতিপয় সেনানী পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া, সম্রাট সমগ্রবাহিনী ধীরে ও উপযুক্ত পর্য্যায়ক্রমে চালিত করিলেন। সম্রাট সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, কেহ যদি এই বিভাগের অগ্রবর্ত্তী কি কোথাও লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর একজন মোগল আসিয়া সম্রাট-সদনে অভিযোগ করিল যে, চামপুটি বাহাদুর* নামক এক কর্ম্মচারী তাহার অশ্ব লইয়াছে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ অভিযোগকারীর সহিত একজন অনুচর দিয়া চামপুটিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অভিযোগকারীর অশ্ব এই দণ্ডেই যেন তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু অবাধ্য কর্ম্মচারী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া

অভদ্রতাসূচক কতকগুলি কথা বলে। তচ্ছ্রবণে সম্রাট তাহার শিরশ্ছেদ করিতে অনুজ্ঞা প্রচার করেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে, অপরাপর সৈন্যগণকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য ও অনুরক্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং পল্লীলুণ্ঠন হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত রাখিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্নমস্তকটী বর্শার বিদ্ধ করিয়া সমগ্রবাহিনীকে প্রদর্শিত করান হয়।

এই স্থান হইতে প্রত্যহ ২০।২৫ মাইল হিসাবে পথ অতিক্রম করিয়া মোগল-বাহিনী সিরহিন্দ নগরে উপনীত হইল। এইস্থানে যুবরাজ হিন্দলকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সম্রাট স্বয়ং শতদ্রুনদীতীরে অবস্থিত মাচ্ওয়ারা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নদী তখন পূর্ণ-যৌবন-সম্পন্না এবং নৌকারও অপ্রতুল ছিল, কাজেই সৈন্যসহ নদী উত্তীর্ণ হইতে সম্রাটকে সমূহ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে যে, শের খাঁ নিজে দিল্লীতে অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যশ্রেণী ৮০ কি ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

যুবরাজ হিন্দলের সৈন্যশ্রেণী আসিয়া মিলিত হইলে, সম্রাট একত্রে জালিন্ধার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে পুনরায় যুবরাজকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সম্রাট লাহোরে গমন করতঃ রোসন আইসীর আলয়ে আশ্রয় লইলেন। পরদিবস সম্রাট জালিন্ধার রক্ষার্থে যুবরাজ হিন্দলের সাহায্যকল্পে তুর্কী মোজাফ্ফর বেগকে প্রেরণ করেন। তদনুসারে মোজাফ্ফর গাওোয়াল বা বিয়ানদীর পশ্চীমতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন; অচিরেই আফগানসৈন্য নদীর অপর তীরে আসিয়া দেখা দিল।

সম্রাট অতঃপর লাহোরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও যুবরাজগণকে আহ্বান করিয়া এই শঙ্কটাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সন্ধির প্রস্তাব করিতে শের খাঁর নিকট হইতে এক দূত উপনীত হইয়াছে। কোথায় এবং কি ভাবে দূতের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্রাট বলিলেন যে, যুবরাজ কামরানের উদ্যান-বাটিকায় তিনি দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং প্রচার করিলেন যে, "সাত হইতে সত্তর" বৎসর বয়স্ক নগরের প্রত্যেক ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত থাকিবে।

নিরূপিত সময়ে শের খাঁর দূত অগ্রসর হইয়া যুবরাজ কামরানের হস্তে তদীয় প্রভুর পত্র অর্পণ করিল। সম্রাটের আগমনের পূর্ব্বেই যুবরাজ কামরান ও শের

খাঁর মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল কিন্তু উক্ত পত্রে শের খাঁ ব্যক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কোনরূপ সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কাজেই দূতকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিতে হইল। এই ঘটনার পর কি করিতে হইবে বা কোথায় যাওয়া উচিত তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সম্রাট অকর্ম্মণ্য হইয়া লাহোর প্রাসাদে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, প্রথমে যুবরাজ কামরানকে শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহাদের সন্দেহ হয় যে, যুবরাজ সৈন্যসমূহকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট বলেন,—'না, তা' হইবে না! এই বিনশ্বর জগতের ক্ষণিক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃরক্তে কি হস্তরঞ্জিত করিব? না, আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব বাবরের মুমূর্ষুকালের বাক্য আজীবন স্মরণ করিব। পিতৃদেব মৃত্যুকালে আমায় বলিয়া যান,—"হুমায়ন! সাবধান, সাবধান, তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত কলহ কিম্বা তাহাদেরর বিরুদ্ধে কখনও কোনও কু-অভিসন্ধি হৃদয়ে স্থান দিও না।" পিতার এই বাক্য চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

—o—

বসুবন্ধু।

প্রাচীনকালে বসুবন্ধু নামে একজন প্রসিদ্ধ শ্রমণ বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধ-ইতিবৃত্ত-লেখক তারানাথ, বসুবন্ধুর বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজক হিয়ান্‌সাঙ্‌ এবং ইৎসিং উভয়ে বসুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন।

বসুবন্ধু মগধদেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজের নাম অসঙ্গ। বসুবন্ধু জন্মগ্রহণ করার এক বৎসর পূর্ব্বে অসঙ্গ শ্রমণ হইয়াছিলেন। এদেশে সকলেই অবগত আছেন যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, গুরু নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ করেন। নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম পরিত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমের নামে পরিচিত হন। বৌদ্ধশ্রমণ এবং জৈন-যতিগণ পক্ষেও ঐ নিয়ম প্রচলিত। অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু তাঁহাদের শ্রমণাশ্রমের নাম।

বসুবন্ধু মনোরথ নামক শ্রমণের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ কাশ্মীরপ্রদেশে গমন করেন। তথায় সঙ্ঘভদ্র নামক জনৈক শ্রমণের নিকট নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সঙ্ঘভদ্র হীনায়ন বৌদ্ধ ছিলেন।

পরিশেষে বসুবন্ধু মগধদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদীয় অগ্রজ অসঙ্গ যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র রচনা করেন। অসঙ্গ মহাযান বৌদ্ধ। বসুবন্ধু প্রথমতঃ অগ্রজের গ্রন্থের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। অসঙ্গ এজন্য বসুবন্ধুকে উপদেশ প্রদান করার জন্য তাঁহার দুই শিষ্যকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বসুবন্ধুকে অক্ষয়মতিসূত্র এবং দশভূমিকা-সূত্র শিক্ষা দেন। অনন্তর বসুবন্ধু অগ্রজের মতাবলম্বন করেন এবং অগ্রজের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

বসুবন্ধু মহায়ানসূত্র, গুহ্যপতিবিদ্যা, রত্নকূট, অবতংসক, সময়রত্ন, শত সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি নানাগ্রন্থ মুখস্থ করেন এবং গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত অনায়াসে আবৃত্তি করিতে সক্ষম হন।

বসুবন্ধু সুবিখ্যাত নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অভিধর্ম্মকোষ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার কাশ্মীরপ্রদেশীয় অধ্যাপকের নিকট এই গ্রন্থ প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শতশাস্ত্র এবং বোধিচিত্তোৎপাদন শাস্ত্র রচনা করেন।

হিয়ান্ সাঙ্ নলন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি বসুবন্ধুর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ৬২৯–৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হিয়ানের ভারত-ভ্রমণের কাল। বসুবন্ধু বোধ হয় ইহার অনুমান পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

রত্নধর্ম্মরাজ নামক একজন শ্রমণ লিখিয়াছেন যে বিমোক্ষসেন, গুণপ্রভ, আর্য্যদেব, গুণমতি এবং যশোমিত্র প্রভৃতি বসুবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন যে চীনদেশীয় একজন ত্রিপিটকাচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন। হিয়ান্ ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে মোক্ষদেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন; তিনি বসুবন্ধুর নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ন করা অনুমান হয় না। বসুবন্ধু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, হিয়ান্ তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুবন্ধু ন্যায়দর্শনে পারদর্শীতা লাভ করেন; তিনি কাশ্মীরপ্রদেশে সঙ্ঘভদ্রের নিকট ন্যায়দর্শন শিক্ষা করেন। বৌদ্ধশ্রমণগণ মধ্যে অনেকে ন্যায়দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অসঙ্গের শিষ্য ছিলেন। তারানাথ বলেন—ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। হিয়ান্ ভারতবর্ষে একজন ব্রাহ্মণের নিকট ন্যায়দর্শন শিক্ষা করেন। অসঙ্গের শিষ্য দিঙ্‌নাগ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুবন্ধুর বাসবদত্তা পাঠে শ্রমণগণ ন্যায়দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ

রচনা করা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

বসুবন্ধুর শিষ্য গুণপ্রভ, গুণপ্রভের শিষ্য মিত্রসেন। হিয়ান্ নলন্দায় মিত্রসেন নিকট তত্ত্বসত্যশাস্ত্র এবং অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

অসঙ্গের আরও বহু শিষ্য ছিল; তন্মধ্যে শীলভদ্র এবং স্থিতমতি প্রসিদ্ধ। শীলভদ্র কখন কখন ধর্ম্মকোষ নামে পরিচিত। হিয়ান্‌সাঙ্ যখন নলন্দায় আগমন করেন তখন শীলভদ্র তথাকার অধ্যক্ষ ছিলেন। শীলভদ্র তৎকালে অতি প্রাচীন ছিলেন। হিয়ান্ শীলভদ্রের ছাত্র জয়সেন নিকট নানাপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ধর্ম্মপাল শীলভদ্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইৎসিং বলেন—ধর্ম্মপাল ভর্তৃহরির সমসাময়িক।

হিয়ান্ এবং ইৎসিং উভয়ে নলন্দায় অধ্যয়ন করেন। ইহাদের প্রসাদে নলন্দার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইৎসিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে নলন্দায় অবস্থান করেন।

হিয়ান্ বৌদ্ধগয়ায় গমন করার সময়ে রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন। বৌদ্ধগয়ায় অবস্থান করার সময়ে নলন্দার শ্রমণগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। হিয়ান্‌কে অভ্যর্থনা করার জন্য নলন্দার দুই শত শ্রমণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরিশেষে পথে অসংখ্য শ্রমণগণ হিয়ানের সমাদরের জন্য উপস্থিত হন্। তন্মধ্যে কেহ কেহ বৈজয়ন্তী উত্তোলন করেন, কেহ বা বিশুদ্ধভাষায় হিয়ানের গুণপ্রকাশক গান করেন, কেহ বা পথিমধ্যে সচন্দন-কুসুম নিক্ষেপ করিতে করিতে হিয়ানের অনুগমন করেন। হিয়ান্ ভারতবর্ষের অন্য যে স্থানে গমন করিয়াছেন কুত্রাপি তিনি এরূপ সমাদর পান নাই। বাস্তবিক "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।" হিয়ান্ সমাদরের যোগ্যব্যক্তি।

কথিত আছে, একদা একজন ব্রাহ্মণ নলন্দায় উপস্থিত হইয়া শীলভদ্রের সহিত বিচারপ্রার্থী হন। হিয়ান্ প্রথমতঃ উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে হিয়ানের নিকট ব্রাহ্মণ পরাজিত হন্।

নলন্দায় অধ্যাপক এবং ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য চয়টি সুদীর্ঘ চৌতালা দালান ছিল। এই স্থানে অধ্যাপক এবং ছাত্র মোট দশসহস্র লোক অবস্থান করিতেন। ইহাদের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। কান্যকুব্জেশ্বর হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এজন্য ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের নিকটে এক বৃহৎ আম্র-বাগান ছিল।

হিয়ান্ এস্থানে পাণিনি ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শনশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, বেদ এবং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিয়ান্‌প্রণীত নীলপীঠে পাণিনির তিঙন্ত এবং সুবন্ত পদের উল্লেখ আছে।

নলন্দা বিদ্যালয়ের অট্টালিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। অল্পদিন হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক রেলপথ হইয়াছে। বেহার গয়া জিলার সব্‌ডিভিসন। বেহার হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ অন্তরে বড়গাঁ নামে এক গ্রাম আছে। এই স্থানে প্রাচীনকালে ভুবনবিখ্যাত নলন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইদানীং ভারতবাসিগণ নলন্দার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা সুসভ্য ইউরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ইউরোপে কি এতাদৃশ বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে? কি কখন ছিল?

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

কৃষি।

পর্য্যায় রোপণ।

এখানে আর একটী আবশ্যকীয় কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করিতেছি। এক জমিতে একই ফসল প্রতিবৎসর উৎপন্ন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। উদ্ভিদের শ্রেণীভেদে খাদ্য ভেদ হইয়া থাকে। এক এক জাতীয় উদ্ভিদ্ এক এক প্রকার পদার্থ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং এক শ্রেণীর ফসল ক্রমিক চাষ করিলে, সেই ফসলের প্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখনও অন্য প্রকার শস্যের উপযোগী সার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে থাকে। সেই জন্যই পর্য্যায়ক্রমে এক রকমের ফসলের পর অন্য রকমের ফসল দেওয়া উচিত; তাহাতে সার ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের কৃষকেরাও পর্য্যায় রোপণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পর্য্যায় রোপণের মূলে যে কি বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহারা তাহা অবগত নহে। আমাদের দেশে দুই জাতীয় ফসলেরই বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। ধান,

গম, যব, ভুট্টা, আঁক প্রভৃতি ফসল একশ্রেণী ভুক্ত এবং মটর, মসুর, ছোলা, মুগ, কলাই, অরহর প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্তগুলিকে "লক্ষ্মীবীজ" ও শেষোক্ত ফসলগুলিকে "দালজাতীয়" ফসল বলে। এই উভয় জাতীয় ফসলের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রচুর পরিমাণ "নাইট্রোজান" আবশ্যক। দালজাতীয় শস্য বায়ু হইতে "নাইট্রোজেন" সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে কিন্তু "লক্ষ্মীবীজ" জাতীয় ফসল তাহা পারে না। সেইজন্য ধান, গম প্রভৃতি ফসলের পূর্ব্বে মুগ, খেসারী প্রভৃতি দালজাতীয় ফসল রোপণ করা কর্ত্তব্য। দালজাতীয় ফসল বায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণ 'নাইট্রোজান' প্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহার যে সকল মূল ভুমিতে রহিয়া যায় তাহাতেও যথেষ্ট 'নাইট্রোজান' থাকে, এই নাইট্রোজান পরবর্ত্তী "লক্ষ্মীবীজ" জাতীয় ফসলের পুষ্টি সাধন করে। দালজাতীয় উদ্ভিজ সকল হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া না ফেলিয়া ক্ষেত্রেই চাষ করিয়া মিশাইয়া ফেলিলে আরও ফল পাওয়া যায়।

পর্য্যায় রোপণের আর একটী উপকারিতা এই, ক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম হয়। এক এক জাতীয় ফসল প্রতি বৎসর করিলে সেই ফসলের কীট সকল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অন্য ফসল দিলে পুর্ব্বের ফসলের কীট সকল মরিয়া যায়।

জমি মাঝে মাঝে পতিত রাখা ভাল। তাহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে মাটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

জলসেচন।

সমগ্র ভারতেই জলের অভাব। যে দেশে তৃষিত কণ্ঠ শীতল করিবার জন্য উর্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে হয় সে দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য জলাভাব হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ফসলের সময় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। কোন দেশের লোকই আমাদের মত কেবল প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে না। প্রাচীনকালে এ দেশের রাজা মহারাজেরা জলাভাব নিবারণের জন্য পুকুর, দীর্ঘীকা এবং খাল খনন করিয়া দিতেন। ইংরেজ-রাজার আমলে সে সুনিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। ইংরেজ রেল প্রসার করিয়া যাতায়াত এবং শাসনকার্য্যের সুবিধা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু খাল খনন করিবার জন্য যত্ন নাই। রেলে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের আয় হয়, স্বজাতি বণিকদিগেরও যথেষ্ট লাভ আছে; খাল খননে কেবল প্রকৃতিপুঞ্জের উপকার, তাই সরকার বাহাদুর সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। গরীব

প্রজারা খাইয়া বাঁচিতে পারে না, তাহারা নিজ অর্থব্যয়ে খাল খনন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

যে স্থানের মাঠে নদী, বিল কিম্বা খাল থাকে কৃষকেরা উক্ত জলাশয় হইতে অপ্রশস্ত খাল কাটিয়া "কুঁদ" দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচন করে। অনেকস্থানে তাল বা চাউগাছের গোড়াদ্বারা "ডোঙ্গা" প্রস্তুত করিয়া লয়। দূর হইতে জল আনিতে হইলে চর্ম্ম নির্ম্মিত "ভিস্তি" ব্যবহার করাই সুবিধা।

অনেক ইংরেজ এদেশে "এবিসিনিয়ান টিউব ওয়েল" নামক যন্ত্র কৃষিকার্য্যে জলসেচনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণ কৃষকেরা উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ। প্রতি যন্ত্রের মূল্য ৬০০৲। ৭০০৲ টাকা। মান্দ্রাজে "সুলতান ওয়াটার লিফট্‌" নামক আর একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রদ্বারা দুইটী বলদের সাহায্যে কূপ হইতে দুইটী পাত্রে পরে পরে জলপূর্ণ হইয়া উঠে। এই যন্ত্রের দাম ৮০৲ টাকা। মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই তো গেল জলাভাবের কথা। শস্যের পক্ষে অনাবৃষ্টি যেমন "ঈতি" অতিবৃষ্টিও তেমনি ঈতি; অতিবৃষ্টির সময় এই সকল যন্ত্রদ্বারা কোন ফল হইবে না। খাল খনন করিলে অতিবৃষ্টির সময়েও বিশেষ উপকার হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী করিয়া দিলে মাঠের সমস্ত ক্ষেত্রের জল গড়াইয়া খালে পড়িতে পারিবে; জমিতে জল দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এই দ্বিবিধ ঈতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার পক্ষেই খাল খনন নিরাপদ।

সকল জমিতে সমপরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না। "বেলেমাটি" স্বাভাবিক অবস্থায়ই খুব নীরস; সেই জন্য বেলেমাটিতে জলের বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। 'আঁটাল মাটিতে' সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না এবং একবার জল প্রবেশ করিলে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং আঁটাল মাটিতে অধিক কি অল্প জল দুই-ই শস্যের হানিকর। "বোঁদ মাটি"তে অঙ্গারক অধিক। তজ্জন্য অধিক জল সেচন করিলে অঙ্গারক পরিবর্ত্তিত হইয়া ফসলের অনিষ্ট করিয়া থাকে। "দো-আঁস মাটি" কৃষির পক্ষে খুব সুবিধাজনক। দো-আঁস মাটিই এদেশে অধিক। এই মাটিতে অধিক জলসেচনের আবশ্যক হয় না।

শস্যের কীট।

ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য হইলেও কৃষকের চিন্তার অবসান হয় না। শস্য নিরাপদে বাড়ীতে আনিয়া না পৌছাইতে পারিলে আর শান্তি নাই। জমিতে আশানুরূপ

শস্য হইয়াছে, কৃষকের আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু হয়-তো ফসল কাটিবার পূর্ব্বে একদিন কৃষক ক্ষেতে গিয়া দেখিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সারা বৎসর রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া যে শস্য রোপণ এবং সংরক্ষণ করিয়াছিল তাহা কীটে একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং শস্য গৃহে না আনা পর্য্যন্ত কৃষকের আর শান্তি থাকে না।

কীট কৃষকের পরম শত্রু। কীটের আক্রমণ হইতে শস্য রক্ষা করিবার উপায় কৃষক মাত্রেরই জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কীট নানা প্রকার। এক এক রকম শস্যে এক এক রকম কীট দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে প্রধান প্রধান শস্যের কীট নিবারণের সহজ উপায় লিপিবদ্ধ করা গেল।

ধান্য।

১। এক জাতীয় কীট, ধান্য বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইবা মাত্র তাহার পাতা খাইয়া ফেলে। এই কীট নিবারণের জন্য 'পেরিসগ্রীণ' (Paris green) নামক বিষাক্ত পদার্থের জল গাছে ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই পাতা খাইয়া সব কীট মরিয়া যায়।

২। আট ভাগ দুগ্ধের সহিত একভাগ কেরোসিন মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে কীটের উপদ্রব দূর হয়।

৩। তামাকের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিলে ধান গাছের কীট মরিয়া যায়।

৪। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে এক প্রকার কীট (Leptocorisa Acuta Thumb) হয়। বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর এই কীট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীট অতিশয় সাংঘাতিক; একবার ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিলে সকল ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ক্ষেতের যে দিক দিয়া বাতাস বয় সেই দিকে খুব ভাল করিয়া আবর্জ্জনা দ্বারা ধূয়া করা উচিত। অধিকক্ষণ ধূয়া লাগিলে এই কীট মরিয়া যায়। আর সেই সঙ্গে ক্ষেত্র হইতে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

ইক্ষু।

ইক্ষু প্রায়ই উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। উই নিবারণের জন্য কেরোসিন জলের মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেরোসিনের তীব্র গন্ধ উই সহ্য করিতে পারে না। ইক্ষুতে এক প্রকার পোকা হইয়া থাকে

তাহাকে 'খমা বা মাজেরা' (Dacatraca Bacharates fabur) বলিয়া থাকে। এই পোকা দেখা দিলে ইক্ষু রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। যে ইক্ষুতে পোকা ধরিবে তাহা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। ইক্ষুর পোকা নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

আলু।

আলুর গাছ বাহির হইলে অনেক সময় পাতাগুলি কোঁকড়াইয়া গাছ শুকাইয়া যায়। যখন অনেক গাছ এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে তখন ৪।৫ সের জলে এক ছটাক হীরারকস মিশ্রিত করিয়া পিচকারীদ্বারা ক্ষেতে ছড়াইয়া দিবে।

একভাগ ভাল কার্ব্বলিক এসিডে একশত ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দিলে সকল প্রকার কীট এবং কীটের ডিম্ব মরিয়া যায়।

উপসংহার।

কৃষি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল, এখন কৃষকের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমাদের দেশের কৃষকেরা নিতান্ত নিঃস্ব। অতি অল্প লোকেরই দুই বেলা আহারের সংস্থান আছে। মহাজনের নিকট হইতে উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া ব্যবসায় করে। প্রচুর পরিমাণ ফসল হইলেও তাহাদের হাতে এক কপর্দ্দক থাকে না। সুতরাং তাহারা কিরূপে কৃষির উন্নতি করিবে এবং কেনই বা করিবে? যদি কষ্টোপার্জ্জিত ধনের অধিকারী হইতেই না পারিল, তবে তাহারা কেন যত্ন এবং পরিশ্রম করিবে। বেনারস Industrial Conference এ পঠিত প্রবন্ধে Mr. D. M. Hamilton যথার্থই বলিয়াছেন— "If the great body of cultivators have to work not so much for themselves as for their creditors, why should they take the trouble to assimilate new methods of agriculture."

কৃষি কার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে কৃষকের অবস্থা সচ্ছল করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জমিদারেরা যদি অল্প সুদে কৃষককে টাকা ধার দেন তাহা হইলে তাহাদের হাতে কিছু অর্থ থাকিবে এবং তাহাদের উৎসাহও বাড়িবে। Hamilton বলিয়াছেন প্রতি জেলার জমিদারেরা সম্মিলিত হইয়া যদি Cash Banks অথবা Grain Banks স্থাপন করেন এবং প্রজাদিগকে টাকা অথবা বীজ ধার দেন তাহা হইবে কৃষকের অবস্থা অনেকটা ভাল হইতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাণেশচন্দ্র।

(৪)

বাসন্তী। দাদা ম'শায়, আজ এত ভোরে যে, মাঘের শীত।

বিনয়। দাদা ম'শায়ের শীত গ্রীষ্ম সমান। আজ যে আকের লাঠির শুধু আগা খানা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবে বুঝি এর আগে আরও কোন বাসায় গিয়াছিলেন।

দাদা ম'শায়। মার বাসায় গিয়াছিলাম; ছোট মা, বড় মা, ছোট খোকা, বড় খোকা, গোড়ার দিক্ সব কেটে নিল।

মুক্তি। আগে কেন আমাদের বাসায় এলেন না? আমাদিগকে তবে আকের আগার মত ভাল বাসেন।

দাদা মশা'য়। দিদিমণি, আকের গোড়া, পথের গোড়া, একটা বই দুটো হয় না। তোরা গোড়া কেটে নিলে তারাও তবে তাই বল্‌তো? কাল গোড়া তোদের।

দাদা ম'শায় বেড়াইবার কালে হাতে একখানি আকের লাঠি লইয়া বাহির হইতেন, যে বাসায় যাইতেন বালক বালিকাগণ উহার অংশ কাটিয়া লইত। আগা ছিল; দাদামণি, দিদিমণি সকল, ঐ আগাটাই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া লইল। বাসন্তী দাদা মহাশয়ের অতলস্পর্শ পকেটের মধ্যে তাহার সুন্দর হাতখানি ডুবাইয়া দিল।

বাসন্তী। কুল পেয়েছি গো, কুল পেয়েছি—ও গো জলপাই, ও গো কমলা।

বালক বালিকাগণ নিমেষে, দাদা ম'শায়ের পকেটে হাত ডুবাইয়া কুল-মুক্তা, জলপাই-মণি, কমলা-প্রবাল সকল তুলিতে লাগিল।

মুক্তি। দাদা ম'শায়, কুল, জলপাই—এ যে বড্ড প্রলোভন, আপনি প্রলোভন দিবেন!

দাদা ম'শায় "আচ্ছা দিব না, দেখি, প্রলোভন সব এই ফেলে দিলুম" বলিয়া পকেটে আরও যত কুল, কমলা, জলপাই ছিল মেজেতে ছড়াইয়া দিলেন। এক পকেটে কুল কত, কমলা কত, জলপাই কত। দাদা ম'শায়ের পকেট পোষ্টাফিসের পার্শেলের ব্যাগ্; তাই কি একটা, এপাশে ওপাশে, বুকের উপরে ও নীচে।

ঘরময় সব ছড়াইয়া পড়িল। বালক বালিকাগণ কে কা'র আগে সব

হরির লুঠের ন্যায় লুঠিয়া লইল। দিদিমণি মুক্তি, দু'গালে দু'টী কুল দিয়া মচ্ মচ্ শব্দে খাইতে লাগিলেন। এতক্ষণ যে সকল প্রলোভন দাদা মহাশয়ের পকেটে ছিল তা ছেলে মেয়েদের পেটে যাইয়া নিমেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল।

ছোট খোকা তখন সবে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। উঠিয়া দেখিল—দাদা ম'শায়ের এক পকেট শূন্য হইয়া গিয়াছে; সে তাঁহার হাটুতে উঠিয়া অপর পকেটে হাত ডুবাইতে চেষ্টা করিল : ছোট হাত তল পাইবে কেন? দাদা মশা'য় "দিচ্ছি" বলিয়া হাত ডুবাইয়া দিলেন।

দিদিমণি। যান্, আবার ওকি? আপনি প্রতিদিন ও কত কি নিয়ে আসেন? আপনার পয়সা লাগে না? এ-ত গেল, আপনি পথে যেতে আর সকল বাসার ছেলে-মেয়েদের জন্য কত কি কিন্‌বেন।

এই কথা বলিতে বলিতে দিদিমণি পলকে তাঁহার মণিব্যাগটী হস্তগত করিল।

দাদা ম'শায়ের এক হাত খোকার হাতের সঙ্গে এক পকেটে, অপর হাত তাঁহার মণিব্যাগ উদ্ধারে ব্যস্ত। তারপর তিনি দিদিমণির পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একটী খরগোশের পশ্চাতে দৌড় সহজ কিন্তু একটী চটুল বালিকার পশ্চাতে তত সহজ নয়। বালিকাকে ধরা যাইতেছে না। খোকা তখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দাদা ম'শায় পকেটের সম্পত্তি তাড়াতাড়ি ধরিয়া তাড়াতাড়ি একটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিদিমণির পশ্চাতে ছুটিলেন।

পকেটের তুলার মত নরম সম্পত্তি গরমের আরাম হইতে বাহির হইয়া মিঁউ মিঁউ করিতে লাগিল।

বিড়াল-ছানা দেখিয়া সকলে হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, অবাক্ হইল। দিদিমণি বিড়াল-ছানার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, মণিব্যাগ রাখিয়া বিড়াল-ছানা কোলে তুলিয়া লইল।

দিদিমণি। দাদা ম'শায়, ফল ফুল ছেড়ে এখন জোন্ত ধর্‌লেন যে। আপনার যে পকেট—কোন্ দিন বা আমাদের জন্য হাতী নিয়ে আসেন।

দাদা ম'শায়। এ কি ক'রে এল। নিশ্চয়ই সতুর কাজ, সতু হয়ত কোন্ সময়ে আমার পকেটে রেখে দিয়াছে—সতু আজ বড্ড ভোরে উঠে ছিল। বাচ্ছাটাও গরমের আরাম পেয়ে চুপ করে ছিল। খোকাবাবু এইটী নেও—দেখো খেও না।

দাদা ম'শায় বিরাট পুরুষ; উচ্চতার অনুপাতে পড়িয়া স্থূলতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। চক্ষু দেখিলে দয়ার অবতার বলিয়া মনে

হয়। কিন্তু ভ্রূ মধ্যে লম্বভাবে যে দুইটী সমান্তরাল বলিরেখা আছে, ঐটীই ভয়ের কথা। অন্যায় দেখিলে ঐ রেখাদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। এই আনন্দ কোলাহলময়, ঐ নির্ব্বাক গম্ভীর। দাদা ম'শায় হঠাৎ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদিমণি, তোমার বাবা উঠেছেন।"

দিদিমণি। হরিরলুঠ হয়ে গেল, বেড়াল-ছানা, মণিব্যাগ্ নিয়ে ভূমিকম্প হয়ে গেল, আর বাবা উঠেন নি? তাঁকে কি কাজ?

দাদা ম'শায়। কথা আছে।

দিদিমণি। কেবল কথা আছে; মা, বাবা, আর আপনি কি যে কথা বলেন চুপি চুপি। আজ আমি থাক্‌বো।

দাদা ম'শায়। আচ্ছা, কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।

দিদিমণি। রাখ্‌বো।

দাদা ম'শায়। কাণে তুলো দিয়ে থাক্‌তে হবে।

দিদিমণি। আচ্ছা তাই।

এই সময়ে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনার ফল দান হ'য়ে গেছে-তো।"

দিদিমণি তার বাবাকে সব বলিল, খোকাকে ডাকিয়া বাচ্চা আনিয়া বাবাকে দেখাইল। তখন আবার হাসির নূতন হোর্‌রা উঠিল।

দাদা ম'শায় গম্ভীর—তিনি ব্রজেন্দ্রবাবুকে গম্ভীরভাবে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে একটী কামরায় প্রবেশ করিলেন। দিদিমণিও থাকিল।

দাদা ম'শায়। কাণে তুলো দিয়েছিস্?

দিদিমণি। দিয়েছি বই কি? দেখুন না।

দিদিমণি সত্যই কাণে তুলা দিয়াছে, কিন্তু কলমের স্থানে।

দাদা ম'শায়। এই বুঝি চালাকি, আচ্ছা শোন্। (ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতি) দেখুন প্রাণেশচন্দ্র পালিয়েছে; কেন, কিছুই বুঝলুম না। তার দীক্ষা ঠিক তার মধ্যে——আপনি জানেন, কেন?

ব্রজেন্দ্র। কিছু-ত জানি না। আপনি কোন সন্ধান নিয়েছিলেন?

দাদা ম'শায়। তাদের বাসায় সন্ধান নিয়েছিলাম। অনন্ত কিছুই বল্‌তে পার্‌লো না, কি বল্লে না, সে রেলে উঠিয়ে দিয়েছিল—এই পর্য্যন্ত।

দিদিমণি চিত্র পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। তার চোকে মেঘ উড়িয়াছে, বুষ্টি হয় আর কি? দাদা ম'শায় এবং ব্রজেন্দ্র বাবুতে কথা শেষ

হইবার পূর্ব্বেই দিদিমণি অন্য এক কামরায় যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর স্ত্রীকে ডাকিলেন ; তিন জনে কথা হইল। দাদা ম'শায় চলিয়া গেলেন—পথে চলিতে চলিতে আবার পকেট কুল-কমলায় বোঝাই করিলেন, হাতে আবার একখানি লম্বা আক—দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি বড় বোঝাই নৌকা, রাজপথের জনস্রোতে লগি মারিয়া চলিয়াছে।

দিদিমণির মা সুশীলা দেবী, দিদিমণিকে ডাকিলেন, সাড়া পাইলেন না, দিদি মণির কামরার দ্বারে আঘাত করিলেন—কেহ দ্বার খুলিল না। আবার আঘাত করিলেন—রুদ্ধকক্ষ হইতে অনুচ্চ কান্নার অনুচ্চধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

(৫)

পাঁচদিন চলিয়া গেল, অনন্ত প্রাণেশচন্দ্রের কোন পত্র পাইল না। যে তারিখে তাহার বাড়ী পৌঁছিবার কথা তাহার পরের তারিখে তাহার মা তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন। অনন্তের চিন্তা হইল—প্রাণেশচন্দ্র তবে কোথায় গেল ?

অনন্ত ভোরে দরজা খুলিয়াই শিঁড়িতে শব্দ শুনিতে পাইল। সে শব্দ অতি পরিচিত—দাদা ম'শায়ের পায়ের শব্দ। এরূপ পা অতি অল্প লোকের হয়, আপনার সমস্ত ওজন পৃথিবীর বুকে চাপাইয়া অতি অল্প লোকেই এরূপ সজোড়ে চলে। দাদা ম'শায় দারজিলিং-হিমালয় রেলের এঞ্জিনের মত উপরে উঠিয়া আসিলেন।

অনন্ত। নমস্কার, এত ভোরে যে!

দাদা ম'শায়। আমার ভোর-তো দু'পর রাতে, কোনদিন সন্ধ্যায়ও ভোর।

অনন্ত। তা নিদ্রা না গেলে সমস্ত সময়ই ভোর। আপনি এত জেগে করেন কি ?

দাদা ম'শায়। কি আর কর্‌বো ? জেগে ঘুমাই ; তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি ; প্রাণেশ চলে গেল—এমন ক'রে ! তা আগে কিছু জান্‌তে পার্‌লুম না। তুমি কোন পত্র পেয়েছ ?

অনন্ত। কোন সংবাদ নাই, তার মার একখানি কার্ড এসেছে, পরশু বাড়ী পৌঁছে নাই।

দাদা ম'শায়। কেন এমন ক'রে গেল বল্‌তে পার ?

অনন্ত। তা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না, ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে খবর দিয়েছেন ?

দাদা ম'শায়। সেখানেও বলে যায় নাই, কোন পত্র লেখে নাই।

দিদিমণি মুক্তি তো কেঁদে কেটে অস্থির, প্রথমদিন কিছু খেল না, দু'দিন স্কুলে যায় নাই।

অনন্ত। ঐ ত রোগের ঘর। আপনার দিদিমণি যদি না জানেন তবে আর কেউ জানে না। ঐ যে দেখছেন বিছানা, ও খাটে প্রাণেশের শরীরটা থাক্‌তো—চাই কি, নিমতলায় নিলেও ক্ষতি হতো না—তার আত্মাটা থাকতো ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আপনার দিদিমণিও কি প্রাণেশকে খুব ভালবাসেন?

দাদা ম'শায়। তা তোমরা যেমন ভাব তেমন নয়। পূর্ব্বরাগ টাগ কিছু নয়, এ একরূপ অনুরাগ। বয়সই-বা কি?

অনন্ত। পড়াইতে পড়াইতে, নীতি-বিদ্যা শিক্ষা দিতে দিতে, একটা প্রীতি জন্মে—তা বুঝি। ব্রজেন্দ্রবাবু যে কই মাছের মত প্রাণেশকে জিয়ায়ে রেখেছেন, তা-তো মেয়েটীকে বুঝতে দেওয়া হয় নাই?

দাদা ম'শায়। কিছু না, তোমরা কিন্তু একটু ভুল বুঝিয়া থাক। যেরূপ প্রেমের কথা তুমি ভাবছ সেরূপ প্রেম এদের মধ্যে এত শীঘ্র জন্মায় না।

অনন্ত। জন্মাইতে দেরিও-ত হয় না। সে অন্ধদেবতা কখন এসে বুকে চাপবেন পঞ্জিকায়-ত তার তারিখ, তিথি, নক্ষত্র লেখে না।

দাদা ম'শায়। তুমি কথায় কথা বের করবার চেষ্টা করছ। প্রাণেশ কেন এরূপ করে চ'লে গেল—তাই বল।

দাদা ম'শায় প্রাণেশের খাটের উপর বসিয়াছিলেন। তোষক বালিশ, ঠিক তেমনি রহিয়াছে। দাদা ম'শায় একটু সরিয়া বসিতে বালিশের নীচে একখানা পত্র দেখা গেল। খামে আঁটা, উপরে লেখা Mukti Devi। ঠিকানা লেখা হইয়াছে কিন্তু কাটা। দাদা ম'শায় পত্রখানি লইলেন। অনন্ত "দেখি দেখি" বলিয়া পত্রখানি হস্তগত করিতে চাহিল, বলিল "খুলে পড়ুন না।"

দাদা ম'শায়। অন্যের পত্র খুলতে নাই, তা হলে তো অন্যের ঘরে সিঁদও দেওয়া যেতে পারে। জান, পত্র একটী মস্ত সম্পত্তি।

অনন্ত। পত্রটা ডাকেই দেওয়া হউক। টিকেট এঁটে বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি।

দাদা ম'শায়। না গো ঠাকুর না, পত্র ছাড়ছি না। দিলেও তুমি না দেখে বাক্সে ফেলবে না—বড় প্রলোভন, তার পর প্রাণেশের পত্র দিদিমণিকে।

অনন্ত। তবে যান, আপনিই পিয়নের কাজ করুন। পত্রে বিষয়টা কি জেনে আমাকে জানাবেন। নৈলে বড় চিন্তিত থাক্‌বো।

দাদা ম'শায় পত্র খানি লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী চলিলেন। পথে ভাবিতে লাগিলেন—পত্র ব্রজেন্দ্র বাবুর হাতেই দিবেন, কি দিদিমণির হাতেই দিবেন? পত্রের পেটে আছে কি—জানিবার জন্য তাঁহারও খুব কৌতূহল হইল। কৌতূহল বৃদ্ধির অনুপাতে পদক্ষেপের পরিসরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি পৌঁছিয়া মুক্তির হাতেই পত্র দিলেন। মুক্ত উহা লইয়া তাহার কামরায় প্রবেশ করিল, দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মুক্তি যদি বিষয়টা না বলে—দাদা ম'শায় "তাইত" "তাইত" বলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। দুই এক বার জানালায় মুখ রাখিয়া ডাকিলেন "দিদি মণি।"

দিদি মণি তখন পত্র খানির শুক্তা, ভাজা, চড়চড়ি, অম্বল রাঁধিয়া কত সাধে খাইতে ছিল—স্থানে স্থানে হয়ত বড্ড ঝাল, হয়ত চোকের জল পাড়িতেছিল।

দিদি মণি দরজা খুলিল না।

লুকাইয়া ভালবাসার জনের পত্র পড়ায় কি সুখ, তা তুমি কি বুঝিবে চির কুমার দাদা ম'শায়?

পলায়িত।

(১)

পিঞ্জরখানি শূন্য করিয়া
পলায়ে গেলিরে পাখি!
এতদিন কার এত মোহ মায়া
চিরদিন তরে কেটে চলে যাওয়া,
একটুকু প্রাণে বাজিল না কিরে
দিলি যবে মোরে ফাঁকি!
পিঞ্জরখানি শূন্য করিয়া
পলায়ে গেলি রে পাখি!

(২)

দেখিলি রে শুধু লোহার পিঁজার,
দেখিলি না প্রেম প্রীতি?
এ যে সুখময় মধু কারাগার,
স্নেহ মমতায় ঘেরা চারিধার,
দেবতা হলেও পলাতে নারিত
তোদের একিরে রীতি?
দেখিলিরে শুধু লোহার পিঁজার
দেখিলি না প্রেম-প্রীতি?

(৩)

আপন করিয়া রেখেছিনু তোরে
রাখি নি বন্দী ক'রে।
তোরে যে দেখিতে ভালবাসি ভাই
নয়নে নয়নে রেখেছিনু তাই,
আমরা মানুষ বাঁধিতে চাই
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে,
তাই আপন করিয়া রেখেছিনু তোরে
রাখি নি বন্দী করে।

(৩)

ওরে ত্যক্ত পিঁজার আমারে দেবে না
ভুলিতে-ত তোর ব্যথা,
তুই কত গান গাবি বসে নীড়ে
আসিবে যাইবে বসন্ত ফিরে
সে গীতের মাঝে থাকিবে না জানি
আমাদের কোন কথা,
তবু ত্যক্ত পিঁজার আমারে দেবে না
ভুলিতে-ত তোর ব্যথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রকৃতি।

অয়ি প্রকৃতি!

ভুবন মোহন ওই
হেরিতে তোমার রূপ
কিবা শান্ত কি ফুটন্ত
তুষার কিরীটি শিরে
বহিছে বিশাল সিন্ধু
বহিছে মলয়ানিল
শোভিছে হৃদয়ে তব
তোমারি কাননে কবি
তব প্রেম ভালবাসা
কিবা স্নেহাঞ্চলখানি
তোমার স্নেহের কোলে
তোমারি সৌন্দর্য মাঝে
মরি কি প্রশান্ত মূর্ত্তি
নিরখি, বদন তব
ভুবন মোহন তব
উদার হৃদয় মরি!
ধন্য ধন্য পুণ্যময়ি!
শান্তির অনন্ত উৎস
তোমার স্নেহের নীড়ে
স্নেহময়ী তুমি মাতঃ!

তোমার মধুর হাসি,
কেন এত ভালবাসি।
তোমার মোহন ছবি,
ভালে শোভে রাঙা রবি
চুমিয়া চরণতল,
গুঞ্জরিছে অলিদল।
অনন্ত রতন হার,
ঝঙ্কারিছে অনিবার।
অতুল ভবমণ্ডলে,
পাতিয়াছ ধরাতলে।
তোমার শীতল ছায়,
ক্রমে দিন কেটে যায়।
কি ভাব হৃদয়ে আনে,
পবিত্রতা জাগে প্রাণে।
অতুলন রূপ শোভা,
বিশ্বজন মনোলোভা।
প্রীতি-স্নেহ-পারাবার,
বিগলিত সুধা যার।
পালে জীব অনুক্ষণ,
অমৃতের প্রস্রবণ।

শ্রীউষা প্রমোদিনী বসু।

শোক সংবাদ।

আমরা সংবাদ পাইলাম, সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী গত ১২ই বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১½ টার সময় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 'আরতি'র পাঠকপাঠিকামাত্রই এই শোক সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইবেন। বহুদিবস হইতেই 'আরতি'র সহিত নগেন্দ্রবালার সম্বন্ধ ছিল। আমরা তাহার সুললিত কবিতাবলী প্রকাশ করিয়া বহুবার পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছি। কিন্তু হায় আজ সেই কবিতার উৎস অকালে চিররুদ্ধ হইল। বঙ্গসাহিত্যে নগেন্দ্রবালার স্থান কোথায় তাহা আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে নির্দ্ধারণ করিতে বসি নাই। তবে এই কথা নৈরাশ্যের সহিত বলিতেছি যে নগেন্দ্রবালার অভাব বঙ্গসাহিত্যে সকলেই অনুভব করিবেন তিনি "নারীধর্ম্ম" "গার্হস্থ্যধর্ম্ম" "অমিয়গাথা" "ব্রজগাথা" "কুসুমগাথা" প্রভৃতি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আজ আমরা কি বলিয়া তাঁহার বিরহবিধুর পতিকে সান্ত্বনা করিব? ভগবান পরলোকগত কবির আত্মার সদ্গতি করুন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শান্তি দান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ } ময়মনসিংহ, চৈত্র ১৩১২। { তৃতীয় সংখ্যা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

হে কবীন্দ্র দেখ আজি ত্রিদিব হইতে
হইয়াছে বঙ্গে মাতৃ-পূজা-আয়োজন,
জন্মভূমি-জননীর কল্যাণ সাধিতে
মহাসাধনায় সবে হ'য়েছে মগন।
সপ্তকোটি-কণ্ঠ হ'তে কাঁপায়ে গগন
"বন্দে মাতরম্" ধ্বনি হ'তেছে উত্থিত;
লভিয়াছে মৃতজাতি নবীন জীবন
তব সঞ্জীবনী মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত।
সর্ব্ব স্বার্থত্যাগী কত সন্ন্যাসী-সন্তান
করিয়াছে মহাব্রত আনন্দে গ্রহণ;
এক আশা এক চিন্তা এক মন্ত্র-ধ্যান,
সবারি হৃদয়ে এক প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
হে দেব হইবে তব বাসনা পূরণ
সুপ্ত বঙ্গে আসিয়াছে মহা জাগরণ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বুদ্ধঘোষ।

বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়ার পরে বুদ্ধঘোষ ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত হইয়াছেন। মহামঙ্গল নামক একজন ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণ বুদ্ধঘোষের জীবনী সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পালিভাষায় রচিত, গ্রন্থের নাম বুদ্ধঘোষোপ্পত্তি (বুদ্ধঘোষোৎপত্তি)। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত জেমস্ গ্রে উক্ত গ্রন্থ ও তাহার অন্য একখানা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডনস্থ লুজেক কোম্পানি এই গ্রন্থের প্রকাশক।

প্রাচীন সময়ে যে সমস্ত ধর্ম্মাত্মা এবং বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রোমনগর-সংস্থাপক রমলাস, যুনানীবীর সেকেন্দর, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বুদ্ধঘোষের জন্ম সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

যে স্থানে ভগবান্ সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা এক্ষণ বৌদ্ধগয়া নামে পরিচিত। সেই স্থানে এক্ষণ বৌদ্ধগয়ার মন্দির সংস্থাপিত; এই মন্দিরের নিকটে বোধিদ্রুম দণ্ডায়মান ছিল। বোধিদ্রুমের নিকটে এক সময়ে এক জনপদ ছিল। আভীরগণের বাসস্থান হেতু, এই জনপদ ঘোষ নামে কথিত হইত। এই জনপদে একজন নরপতি বাস করিতেন। কেশীনামে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরু ছিলেন। কেশীর পত্নীর নাম কেশিনী।

কেশী চ নাম ব্রাহ্মণো রঞ্ঞো চ বল্লভো পিয়ো
বেদত্তয়ং শিক্‌খা পেতি রাজানঞ্চ দিনে দিনে
তস্সেব কেশিনী নাম ব্রাহ্মণী চ বিশারদী
ব্রাহ্মণস্স পীয়া হোতি গরুৎথব অনালসাতি।

কেশিনীর গর্ভে এক বালক জন্মগ্রহণ করেন। ঘোষ তাঁহার নামকরণ হইল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ঘোষ বেদশাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করেন। একদিন তাঁহার পিতা বেদ অধ্যাপনার জন্য রাজার নিকট গমন করেন। ঘোষ একখণ্ড অজচর্ম্মসহ পিতার অনুগমন করেন। বেদ অধ্যাপনাকালে কেশী, বেদে এক দুরূহ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। ঘোষ একখণ্ড তালপত্রে তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখেন। কেশী তাহা দেখিয়া

বাটীর একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে ইহা লিখিয়াছে?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "আপনার পুত্র।"

রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হন। পরিশেষে তিনি ঘোষকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতে আরম্ভ করেন।

কালক্রমে ঘোষ একজন বৌদ্ধশ্রমণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; এবং সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ-দলভুক্ত হন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতা কেশীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় হইতে ঘোষ বুদ্ধঘোষ নামে পরিচিত হন।

এই সময়ে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসঙ্ঘ হইয়াছিল; এই মহাসঙ্ঘে শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের যে মত প্রচার করেন, সিংহলদ্বীপে সেই মত প্রচলিত আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলবাসিগণের ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, কিন্তু মাগধীভাষায় বৌদ্ধ-মূল গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষা হইতে পুনঃ তাহা মাগধীভাষায় অনুবাদ করার জন্য জলপথে সিংহলাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া দ্বিজস্থান নামক স্থানে পদার্পণ করেন।

অনন্তর একদিন বুদ্ধঘোষ লঙ্কাদ্বীপবাসী সঙ্ঘরাজ মহাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। বুদ্ধঘোষ মহাথের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মহাথের অন্যান্য শ্রমণদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। বুদ্ধঘোষ সেইস্থানে অপেক্ষা করিলেন। মহাথের শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন, গ্রন্থের এক দুরূহ স্থানে মহাথের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন এবং সেই দিবস সভাভঙ্গ করিলেন। বুদ্ধঘোষ একখণ্ড ফলকে তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরিশেষে মহাথের, বুদ্ধঘোষের লিখিত ফলক দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কে লিখিয়াছে?" অনুচর উত্তর করিল, "বিদেশী শ্রমণ।" অনন্তর মহাথের বুদ্ধঘোষের বাসস্থানে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। বুদ্ধঘোষ মহাথেরর নিকট পুনরাগমন করেন।

মহাথের জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ইদং কির অকৃথ রং নাম তয়া লিখিতং?"

ইহা কি সত্য যে এই লেখা আপনার?

বুদ্ধঘোষ কহিলেন :—"হাঁ সঙ্ঘরাজ!"

অনন্তর সঙ্ঘরাজ অন্যান্য শ্রমণদিগকে ত্রিপিটক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধঘোষকে অনুরোধ করেন।

বুদ্ধঘোষ কহিলেন ঃ—

"আমি এজন্য এখানে আগমন করি নাই ; সিংহলদেশী বৌদ্ধশাস্ত্র মাগধী-ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য আমি জম্বুদ্বীপ হইতে সিংহলে আসিয়াছি।"

বুদ্ধঘোষ কতিপয় বৎসর সিংহলে বাস করেন এবং কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করেন। পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষে পুনরাগমন করেন।

বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য সুবর্ণভূমি গমন করেন। বর্ত্তমান আরাকান প্রদেশ এই সময়ে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ে ধর্ম্মপাল সুবর্ণভূমির নরপতি ছিলেন।

বুদ্ধঘোষ নানাগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'সুমঙ্গল বিলাসিনী' সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বিশুদ্ধি মার্গ' নামে পরিচিত।

কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বুদ্ধঘোষ সুবর্ণভূমি হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করেন। বুদ্ধঘোষের সময়ে মহানাম অনুরাধাপুরের অধীশ্বর ছিলেন। অনুরাধাপুর সিংহলের প্রাচীন রাজধানী। মহানাম ভগবান বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৯৪৬ বৎসর পরে সিংহলে রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধঘোষ শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

কাহিনী।

মুর্শিদাবাদ নবাব নাজিমের খাস-মহলের বহির্দ্দেশে প্রবেশ-দ্বারের অভ্যন্তরে একটী যুবক দণ্ডায়মান। যুবকের মুখের ও চক্ষের ভাব তাঁহার অভ্যন্তরীণ ভাব ব্যক্ত করিতেছে—যেন কাহারও প্রতীক্ষায় তিনি এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। এই সময় একটী প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। এই ব্যক্তির পরিধানে পায়জামা, শরীরে আচকান, মাথায় পাগ্‌ড়ি, পায় নাগরাই জুতা, কাণে একটী মোটা রকমের গুঁজি কলম, হাতে একটী কাগজপত্রের পটুলি।

আগন্তুক সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন ?"

যুবক সাগ্রহে বলিলেন—মুন্সী রস্তম খাঁকে—আপনি চিনেন কি ?

আগন্তুক। মীরমুন্সী রস্তম খাঁ ?

যুবক। আজ্ঞে।

আগন্তুক। আমি এই দরবারের তাবেদার—না চিনিব কেন ? মীরমুন্সী রস্তম খাঁকে চিনি, হরপ্রসাদ মুন্সী কারকুনকে চিনি, বন্দে আলি বক্সীকে চিনি—

যুবক বাধা দিয়া বলিলেন—আমি কেবল মীরমুন্সী রস্তম খাঁর কথাই বলিতেছি।

আগন্তুক বিচলিত হইলেন না। বলিলেন—আর কাহারও কথা বলিলে তাহাও জানি। আজ ৩০ বৎসর এই তাবেদারিতে—

কথা শেষ হইতে না হইতে যুবক তাচ্ছল্যের সহিত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুকও ছাড়িবার পাত্র নহেন। যুবকের অনুসরণ করিলেন। বাজে কথা ছাড়িয়া প্রকৃত কথায় আসিলেন। চুপি চুপি বলিলেন—"আপনার প্রয়োজন শুনিতে পারি কি ?"

যুবক। "আপনার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে শুনিতে পারেন বৈ কি ?"

আগন্তুক নিজ উদরে হস্তার্পণ করিয়া অধিকতর বিনীতভাবে বলিলেন—এই ৩০ বৎসর আপনাদের দশ জনের কার্য্য উদ্ধার করিয়াই বন্দা চলিয়া আসিয়াছি। আপনি অনায়াসে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।

যুবক। মীর মুন্সীকে আমার সেলাম জানাইতে পারেন কি ?

আগন্তুক। তা পারিব না কেন ? এ-ত অতি সামান্য বিষয়। কিন্তু আপনি কে—কি জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী—এ সকল বিষয়—

"তাহা আমি লিখিয়া দিতেছি" বলিয়া যুবক কালী-কলমের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন—আগন্তুক তৎক্ষণাৎ কাণ হইতে ওয়াস্তির কলম, হস্তস্থিত পুটলি হইতে কাগজ ও কমরে ঝুলান দোয়াতটী বাহির করিয়া দিলেন।

যুবক পারস্যভাষায় লিখিলেন—

"মুল্কে সুগন্ধ ও করিবাড়ী গড় আগরের মুন্সেফ-রাজা বীরসিংহ, বিশেষ কারণে সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

এই কয়টী কথা লিখিয়া বীরসিংহ সেই ক্ষুদ্র কাগজখানা আগন্তুকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

আগন্তুক কাগজখানা হস্তে লইয়া মস্তকস্পর্শ করাইয়া চলিয়া গেল।

৫

মুঙ্গে মুসঙ্গের সিংহাসন লইয়া যখন রাজা রামসিংহের হিন্দু ও মুসলমান ওয়ারিশদ্বয় দর্শার কাজির আদালতে বিচারপ্রার্থী, সেই সময় রাজা রামসিংহের সহোদর কনিষ্ঠভ্রাতা স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে একেবারে দিল্লীতে গমন করেন ও বাদসাহের প্রিয়পাত্র রাজা যশোবন্ত রাও-এর অনুগ্রহে দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় আবেদন নিবেদন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন; পাঠক তাহা যথাসময়ে অবগত হইয়াছেন।

দিল্লীর বাদসাহের আম হুকুমও বর্ত্তমান সময় অনেকস্থলে সুবাদারগণ ইচ্ছা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া ফেলেন। বাদসাহ প্রদত্ত সনন্দ লইয়া নবাব-দরবারের ন্যায্য উপঢৌকন ও কর্ম্মচারিদিগের পেস্‌কস্‌ প্রদান না করিলে সে সনন্দ আমলে আ'সে না। বীরসিংহ চারিদিগের এই সকল প্রতিকূল বাধা বিঘ্ন দূরীকরণ মানসে দিল্লী দরবারের পরওয়ানা পাইয়া একবারে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব-দরবারে হাজির হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। ২।৪ দিন যাতায়াত করিয়াছেন; বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত।

৬

বীরসিংহ আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক আসিয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মীরমুন্সীর ফুরসুৎ কম; সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আগন্তুকের কথার বিচ্ছেদ নাই তিনি অবিরল বলিতে লাগিলেন—যাই হউক আমিই তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া আপনার কার্য্য হাসিল করিয়া দিব। আপাততঃ কি প্রয়োজন তাহা জানিতে পারিলে উপায় অন্তর চেষ্টা করিতে পারিতাম। বীরসিংহ চিন্তিত হইলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

আগন্তুক বলিলেন—মহারাজ নিরাশ হইবার কারণ কি? মীর মুন্সীর একারেই কি আপনার কাজ?

বীরসিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—"আপনার পরিচয় এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আপনি——?

আগন্তুক গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—মহারাজ এ তাবেদারের নাম্র কৃপারাম।

উকীল। নবাব দরবারে ৩০ বৎসর যাবত এই কার্য্যে গতর খাটাইতেছি। রাজসরকারের বহু কাজ এ গরিবের হাতে হইয়াছে। ভরসা আছে, মহারাজের সময়ও এ দীনের প্রতি অনুগ্রহ বহাল থাকিবে। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নাই। বেয়াদবি ক্ষমা করিবেন। মহারাজের অনুমতি হউক।

বীরসিংহ। সম্প্রতি আমার কার্য্য অতি গুরুতর।

কৃপারাম। কার্য্য যাহা হয় আমি করিব। মহারাজ, অর্থের নিকট কিছুই গুরুতর না।

বীরসিংহ। কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিব।

কৃপারাম। কি করিতে হইবে মহারাজ, আদেশ করুন। আপনার কার্য্যে দেওয়ানখানার রেজা খাঁর নিকট পর্য্যন্ত যাইতে হইলে তাহাও যাইব।

বীরসিংহ। তবে চলুন যথাস্থানে বসিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিব।

বীরসিংহ কৃপারাম উকীলকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া অনতিদূরে একখানা ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলা অনুমান আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অনুমান অর্দ্ধদণ্ড পর কৃপারাম একখণ্ড কাগজসহ দ্রুত পদে দেওয়ানখানার দিকে চলিয়া গেলেন। বীরসিংহ ও পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

৭

সরলপ্রকৃতি বৃদ্ধ গোপীকান্ত মহাশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন—শেষে কি যবনের গুরু হইতে হইবে? না, তাহা কদাপি হইবে না। ত্রিসন্ধ্যা-গায়ত্রী কখনই বৃথা যাইবে না। এই আমি শুভলগ্নে কুমার রণসিংহের মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। কুলগুরু প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ অক্ষয় হউক। অক্ষয় হউক, অক্ষয়——

রণসিংহ অবনত মস্তকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

এই সময় বহির্দ্দেশ হইতে "মহারাজ কি জয়" শব্দ শ্রুত হইল।

রাজসরকারের পত্রবাহক রামকান্ত তেওয়ারি মুর্শিদাবাদ হইতে চিঠি লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ শুভ। গোরীকান্ত মুন্সী দেওয়ানজী চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু—

কৌশলে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরসিংহ বাহাদুর ইতি-মধ্যে দিল্লী দরবার হইতে যে পরওয়ানা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা কৌশলে

হস্তগত করিয়া কেলান গিয়াছে। তিনির সাকুল্য উদ্যম বিফল হইলেক। অদ্য তারিখে আবল্যাধিক্যে কেবল পরওয়ানা সহিমোহরী পাঠান গেলহ। বিস্তারিত পর পর নিবেদন হইবে ইতি। মোতালকে মক্সুদাবাজ কাজির দেউর ;

সেবকাধম সেবক—
শ্রীকৃপারাম দেও উকীল।

গোপীকান্ত মহাশয় সহর্ষে বলিলেন—ভগবান অনুকূল আছেন। দেখ্‌লে দেওয়ানজী ! এই মাত্র কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে জাগ্রত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদটী লইয়া বহির্গত হইয়াছি। গুরুর আদেশে অদ্যই শুভলগ্নে রাজ্যমধ্যে পরওয়ানা জারি হউক।

গুরুর আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। পরওয়ানা এইরূপ—

১৪নং পরওয়ানা।



মুৎসুদ্দিয়ান, কাননগোয়ান, চোধুরীয়ান, কর্ম্মোরিয়ান, জমিদারাম, (বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত) পং নসরৎসাহি ওরফে সুসঙ্গ সরকার বাজুহার ও পং হুসেনপ্রতাপ সরকার সিলেট জায়গীর নবাব সমসমউদ্দৌলা সুবেদার বাংলা তোমরা সকলে অবগত হও যে সুসঙ্গের জমিদার রামসিংহ ওরফে আবদুল রহিম তাহার ৭০০ মনসবদারী ও ৩০ সওয়ার ইস্তাফা করিয়াছে তাহার পুত্র রণ সিংহকে উক্ত পদে স্থলবর্ত্তী করা হইয়াছে। উক্ত মুৎসুদ্দিয়ান প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট সরকারী সমস্ত কার্য্য সতর্কতার সহিত নির্ব্বাহ করিবা এবং উক্ত জমিদারের কার্য্যের সহায়তা করিবা এবং সরকারী সমস্ত কার্য্য ভাল রকম নির্ব্বাহ করিবা। ১১৪৩ হিজরী ৬ মহের রমজান।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সতীদাহ।

বৈদেশিক লেখকগণ ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইয়াও দেশীয় প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং দেশীয় সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তৎসমুদয়ের তীব্র ভ্রান্ত-সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজগণ তৎসমুদয় পাঠ করিয়াই ভারতবাসী সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সতীদাহ সম্বন্ধে বৈদেশিকগণের অভিমত লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

সতীদাহ সম্বন্ধে বেদে একটী মাত্র শ্রুতি আছে,—

ইমাঃ নারীর বিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংস্পৃশন্তাং

অনশ্রবো অনমীবা আরোহন্তুজনয়ো যোনি অগ্রে॥ ১০।১৮।৭

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতিলাভ করিয়া * * গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া * * * সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন অথবা অগ্নিতে আরোহণ করুন।" উক্ত শ্রুতির শেষ শব্দ কেহ "অগ্নে", কেহ "অগ্রে" পাঠ ধরিয়া লন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গ্ন' ও 'গ্র' প্রায় একই আকারেই লিখিত হইত; প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করিলেই পাঠকগণ এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদের কোনও শ্রুতিতেই যখন সহমৃতা হইবার কথা নাই, তখন আমাদের মতে উহা "অগ্রে" ধরাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বেদের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীমদ্ সায়নাচার্য্যও "অগ্রে" পাঠ গ্রহণ করিয়া রমণীগণের চিতানলে ভস্ম হইবার প্রথা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ এই পাঠ-বৈষম্য উপলক্ষ করিয়া এদেশীয়গণকে যে, অযথা কটুকাটব্য বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বিদ্বেষ প্রসূত।

"European research has clearly proved that the text in the Vedas adduced to authorize the immolation of widows, was a wilful mistranslation." Ency. Britannica Vol. 12.

বৈদেশিকগণের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, দেশীয় পণ্ডিতগণ যে বেদের wilful mistranslation করিয়া সতীদাহ প্রথার বৈদিক প্রমাণ সৃষ্টি করেন নাই, তাহা অনেকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা করি না। সতীদাহ প্রথা বৈদিককালে প্রচলিত না থাকিলেও পৌরাণিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ রাজত্বের কতক সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পতিব্রতাগণের মৃত পতির জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি যে অতি পুণ্যকর ও গৌরবজনক তাহার উদাহরণ অন্বেষণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

অনেকে অনুমান করেন যে, বৈদিককালে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও তৎপূর্ববর্ত্তী কোনও সময়ে তাহা প্রচলিত ছিল; বৈদিক সময়ে উহার বিলোপ সাধন হইয়াছিল, কেবল স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। পরে পৌরাণিক কালে উহা পুনর্জ্জীবিত হয়। এরূপ অনুমানের প্রধান কারণ, বেদে আছে,—

"হে নারি (মৃতের বিধবা)! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল; গাত্রোত্থান কর; তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে মৃত হইয়াছে, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ করাইয়াছিলেন, সেই মৃতের পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।" ১০।১৮।৮

"মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম। * * * হে মৃত! তুমি এই স্থানে থাক। আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় আস্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন হত করিতে পারি।" * ১০।১৮।৯

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিধবানারীকে শ্মশানভূমি হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলা হইতেছে। যদি ইহার পূর্ব্ব হইতে সতীদাহ প্রচলিত না থাকিবে তবে, বিধবা মৃতস্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিতে যাইবে কেন? এবং তখনই তাহাকে উঠিয়া আসিতে বলা হইতেছে কেন? এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, পারসীকগণের কুকুরদ্বারা শব দেখানের ন্যায় ইহা কেবল মাত্র প্রাচীনপ্রথা রক্ষা।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তৎকালীন প্রধান রাজ-প্রতিনিধি সার উইলিয়াম বেণ্টিং মহোদয়কর্ত্তৃক ভারতে সতীদাহপ্রথা নিবারিত হয়। বৈদেশিকগণের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মোগল-কেশরী সম্রাট আকবর একবার আইনদ্বারা এই প্রথা রহিত করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর পুনরায় তাহা উজ্জীবিত হয়। ইংরেজশাসনকর্ত্তাগণ প্রথম প্রথম ভারতবাসীর সামাজিক আচার

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে অনুবাদগুলি উদ্ধৃত হইল।

ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই, তাই বৃটিশরাজত্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত প্রথা অপসারিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কেবল বঙ্গদেশে সাত শতেরও অধিক বিধবা পতির জলন্ত চিতায় মহানিদ্রাভিভূতা হন। *

হ্যালিডে সাহেব বঙ্গদেশের একটী সতীদাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনাটী সি, ই, বক্ল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার প্রণীত Bengal under the Lieutenant Governors" নামক পুস্তকের প্রথমভাগের ১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'আরতি'র পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত উক্ত ঘটনাটী যথাযথ অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইনদ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। এই সময় এবং তৎপূর্ব্বেও আমি হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিতেছিলাম। এই নূতন আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে একদা আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার কুঠির অনতিদূরে একটী সতী পতির চিতায় আরোহণ করিতেছে। হুগলী জেলায় এইরূপ ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইত, কারণ গঙ্গাতীর এই কার্য্যে প্রশস্ত ও পুণ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সতীদাহের সংবাদ যখন আমি পাইলাম, তখন সিভিলসার্জ্জন ডাঃ ওয়াইজ্ এবং গবর্ণর জেনারেলের চ্যাপ্লেন এক পাদরী (নামটী আমার মনে নাই) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনাটী অবলোকন করায় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে আমরা ঘটনাস্থানে উপনীত হইয়া দেখি যে, বহুসংখ্যক দেশীয় ব্যক্তি তথায় সম্মিলিত হইয়াছে, চিতা সজ্জিত হইতেছে এবং উহার সম্মুখে ভূমিতলে সতী বসিয়া আছেন। আমাদের উপবেশনের নিমিত্ত চেয়ার আনীত হইলে আমরা রমণীর নিকট বসিলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় দেশীয়ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন না; তাঁহারা সতীকে চিতাসজ্জা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে যুক্তি-তর্কদ্বারা যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, আমি তাহার অনুবাদ করিয়া রমণীকে শুনাইতে লাগিলাম। রমণী গম্ভীরভাবে একাগ্রচিত্তে কথাগুলি শ্রবণ করিলেন কিন্তু একটুকুও

---

* The Emperor Akbar is said to have prohibited it by law, but the early English rulers did not dare so far to violate the traditions of religious toleration. In the year 1817 no less than 700 widows are said to have burned alive in the Bengal Province alone. To this day the most holy spots of Hindu pilgrimage are thickly dotted with little white pillars, each commemorating a Suttee." Ency. Britannica, Vol. 12.

বিচলিত হইলেন না ; পুরোহিত এবং অন্যান্য দর্শকগণও তাহা শ্রবণ করিল।

"অবশেষে তিনি কিছু অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া চিতারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইবে না ভাবিয়া আমি অনুমতি প্রদান করিলাম কিন্তু তিনি উঠিবার পূর্ব্বেই পুরোহিত আসিয়া তাঁহাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করিল ;—"কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা কি তিনি বুঝিয়াছেন ?" আমার পায়ের নিকট ভূমিতে রমণী বসিয়াছিলেন, এই কথা শ্রবণ করতঃ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"একটী বাতি আনয়ন করুন।" কৃষকদিগের ব্যবহৃত ঝিনুকের ন্যায় একটী প্রদীপ, একটু ঘৃত এবং তুলার একটী শলিতা আনীত হইলে, রমণী নিজেই প্রদীপটী সাজাইয়া জ্বালিতে বলিলেন। অবিলম্বেই প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁহার সম্মুখে মাটীতে রাখা হইল। রমণী গভীর অবজ্ঞা ভরে আমার প্রতি একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনুই মাটীতে স্থাপন করতঃ প্রদীপের জ্বলন্ত শিখায় অঙ্গুলি ধরিলেন। অঙ্গুলিটি পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ঘা হইল এবং অবশেষে প্রজ্জ্বলিত বাতির শিখায় পেনের কলম ধরিলে যেরূপ হয় সেইরূপ বাঁকাইয়া গেল। অনেকক্ষণে এইরূপ হইল, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি হস্ত একটু নড়ান নাই, একটু শব্দ করেন নাই কিম্বা তাঁহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল না। তৎপর তিনি বলিলেন,—"আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ?" আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি।" এই কথা শ্রবণ করতঃ তিনি ধীরভাবে অগ্নি শিখা হইতে অঙ্গুলী সড়াইয়া বলিল,—"তবে এখন আমি যাইতে পারি ?" ইহাতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রমণী চিতার চারিদিকে অগ্রসর হইলেন। চিতাটি জলের ধারে সজ্জিত হইয়াছিল, উহা দৈর্ঘ্য ও উচ্চে সাড়ে চারি ফিট এবং প্রস্থে প্রায় তিন ফিট, তাহাতে শুষ্কঘাস ও কাষ্ঠাদি থাকে২ সজ্জিত ছিল। তারপর কোলাহলের মধ্যে তিনি দুই কি তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। চিতায় আরোহণ করিয়া নিদ্রা যাইবার অনুকরণে পাশ ফিরিয়া শয়ান হইয়া হাতের উপর নিজের মুখ রাখিলেন। তাহার উপর কয়েক ইঞ্চি পুরু করিয়া শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠাদি এই ভাবে সজ্জিত হইল যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে উঠিয়া যাইতে পারেন। দাহকারিগণ তৎপর তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা বাঁধিতে যাইতে ছিল কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলে তাহারা অনিচ্ছা স্বত্বেও কোনরূপ রাগের ভাব না দেখাইয়া নিরস্ত হইল। তৎপর সতীর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র চিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত আহূত হইল।

"স্বামীর মৃত্যু সময়ে পত্নী নিকটে থাকিলে এই ভাবে কার্য্য হয়। কিন্তু স্বামী দূরদেশে পরলোক গমন করিলে এবং তথা হইতে শব আনয়নের সুবিধা না হইলে তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ আনা হইত। এবং বিধবা সেই বস্ত্র খণ্ডের পার্শ্বে চিতায় শয়ন করিত। চিতা কাষ্ঠে প্রথমতঃ অনেক পরিমাণে চূর্ণ ধূপধুনা এবং আমার মনে হয় খানিকটা ঘি নিক্ষিপ্ত হইত। ইহাতে প্রথম খুব ধূমা হইয়া পরে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। ধূম রাশি কর্ত্তৃক বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চিতার অতি সন্নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমি তাহা হইতে কোন শব্দ শ্রবণ করি নাই বা অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখি নাই। কেবল শুষ্ক তৃণাদি একবার ধীরে ধীরে দেহের উপর উড়িয়া পড়িয়া সব নিস্তব্ধ হইল। পুত্রটি যে চিতা জ্বালাইয়া দিয়াছিল, চিতা জ্বলা পর্য্যন্ত উহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পর তীরে উঠিয়া শোকোন্মত্ত হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। এমতে হুগলী জেলায় সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় সঙ্গতরূপে অনুষ্ঠিত সর্ব্ব শেষ সতীদাহ প্রথা নির্ব্বাহিত হইল।" *

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেকগুলি পাশ্চাত্য পর্য্যটক ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ট্যাভার্ণিয়ার, বার্ণিয়ার, থিভেনট, কার্ডন এবং কারে—এই পাঁচজন ফরাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ট্যাভার্ণিয়র সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট শাজাহান সমাসীন। ট্যাভার্ণিয়র ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্বদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইতে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ছয়বার প্রাচ্য ভূমিখণ্ডে পদার্পণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ডচ্ কোম্পানীর অধীন সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করতঃ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

---

* এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া হ্যালিডে সাহেব লিখিয়াছেন,—"The prohibition of this horrible custom which had been a subject of grave apprehension to which the government, until the time of Lord William Bentick, had always feared to apply itself was effected without the smallest opposition or difficulty. At first applications for leave to perform it were not unfrequent but being in every case sternly forbidden were at once abandoned, the Brahmins merely remarking that if the widow was not permitted to burn she would infallibly be struck dead. This never occurred in my district or any where else so far as I know."

বাটাভিয়াতে ট্যাভারর্ণিয়ের সহোদর মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাকে সমাধিস্থ করিতে ১২২৩ লাইভ্রি মুদ্রা (ফ্যাসীদেশ প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ) ব্যয়িত হয়।

ট্যাভারর্ণিয়ের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই, তবে তৎসম্বন্ধীয় তাঁহার অধিকাংশ বিবরণই ভ্রমাত্মক। তৎসমুদয়ের আলোচনার স্থান ইহা নহে। আমরা কেবল সতীদাহ সম্বন্ধেই তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিব।

ট্যাভার্ণিয়র বলেন ;—ভারতবাসিগণের একটী চির-পুরাতন পদ্ধতি এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। সুতরাং স্বামীর মৃত্যু হইলে, পত্নী অত্যন্ত কান্নাকাটি করে; কয়েকদিন পর তাহার কেশ মুণ্ডিত হয়, গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলে; বিবাহের সময় স্বামী চিরকালের নিমিত্ত শৃঙ্খলিত ও বশবর্ত্তী করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্তে ও পদে যে সকল অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছিল তাহাও সে উন্মোচন করে! এবং পরে যে গৃহে একদা সে সর্ব্বময় কর্ত্রী ছিল, সে গৃহেই ক্রীতদাসী অপেক্ষাও হীন অবস্থায় জীবনের অবশিষ্টাংশকাল অতিবাহিত করে। এইরূপ অসহায় অবস্থার দরুণ তাহাদের জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া থাকার চেয়ে মৃত পতির সহিত ভস্মীভূত হইবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিত। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বুঝাইত যে, এইভাবে মৃত্যু আলিঙ্গন করিলে পরজগতে তাহারা উভয়ে পুনরায় মিলিত হইবে এবং অধিকতর সুখ সৌভাগ্যের সহিত জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে। এই আশাতেই রমণীগণ পতির সহিত সহমৃতা হইত। তদ্ভিন্ন পুরোহিতগণ চাটু-বাক্যে তাহাদিগকে মোহিত করিত এবং বুঝাইত যে, যখন চিতার ধূমরাশির মধ্যে তাহারা থাকিবে অর্থাৎ চিতার দাব-দাহে মৃত্যু সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে ভগবান রামচন্দ্র তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া এক অলৌকিক স্বপ্নরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন; পরে তাহাদের আত্মা নানা দেহে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্যে মহা গৌরবান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হয়।

যাহা হউক কোনও রমণীই স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত সহমৃতা হইতে পারিত না এবং শাসনকর্ত্তাগণ মুসলমান প্রযুক্ত, উক্ত আত্মঘাতী প্রথা অতি অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিতেন, কাজেই অনুমতি প্রদান করিবার সময় তাহারা অতিশয় ইতস্ততঃ করিতেন। অপত্যহীনা বিধবারা সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, জোর করিয়া তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করান

হইত। কিন্তু পুত্রবতী হইলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিত, ছোট পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত সতী জীবনরক্ষা করিতে আদিষ্ট হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যে সকল রমণীকে সহমৃতা হইবার অনুমতি না দিতেন, তাহারা সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত ও দান-ধ্যান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে ব্যয়িত করিত। কেহ কেহ পথিপার্শ্বে বসিয়া খাদ্য শস্যাদি জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই উত্তেজক পানীয় পথিককে পানার্থ প্রদান করিত, কেহ কেহ তামাক সাজিবার নিমিত্ত অগ্নি সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিত। অপর কেহ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত যে, গোময়ের মধ্যে গোটা যে শস্য পাওয়া যাইবে তাহা ছাড়া আর কিছু আহার করিবে না।

নানা প্রলোভনেও রমণীকে সংকল্পচ্যুতা করিতে না পারিলে এবং অর্থ-প্রাপ্তির (ঘুষ!) কথা সহকারীর নিকট অবগত হইলে, শাসনকর্ত্তা ঘৃণার ভাব দেখাইয়া অনুমতি প্রদান করিতেন। এই সময় রমণীর আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ বাদ্যভাণ্ড বাজাইতে আরম্ভ করে এবং মৃতব্যক্তির ভবনে যাইয়া মৃতের সম্মুখে নানা প্রকার বাদ্য ও বাঁশী বাজাইয়া অতি সমারোহের সহিত মৃতব্যক্তিকে লইয়া সৎকার করিতে যাত্রা করে। যে রমণী সহমৃতা হইবে তাহার বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া, পরজগতে সে যে সুখ ভোগ করিবে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। তাহার এই মহৎ সংকল্পের জন্য তাহার সমগ্র জাতি সম্মানিত হয় এবং বিবাহ করিতে যাইবার সময় যেরূপভাবে বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া থাকে, তদনুরূপভাবে সজ্জিত হইয়া আড়ম্বরের সহিত বধ্যভূমিতে নীতা হয়। এই মিছিলের বাদ্যভাণ্ডের উচ্চ রোলের সহিত হতভাগ্যা রমণীর সম্মানের নিমিত্ত অপরাপর রমণীবৃন্দ সংগীত গাহিতে গাহিতে তাহার অনুসরণ করে। যে সকল ব্রাহ্মণ মৃত পতির অনুসরণকারিণী রমণীর সঙ্গে থাকে, তাহারা তাহার নিকট হইতে তাহার সংকল্পের দৃঢ়তার ও তেজস্বিতার প্রকাশ্য প্রমাণ আদায় করেন। অনেকানেক পাশ্চাত্য মহোদয়ের অভিমত এই যে, মৃত্যুর ভয়ঙ্করী বিভীষিকা যদ্দ্বারা মানব-হৃদয় ভয়ে আড়ষ্ট হয়, তাহা হইতে নির্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পুরোহিতগণ সহগামিনীকে মাদকদ্রব্য খাওইয়া তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত করে, কাজেই মৃত্যুর নামে যে একটা বিভীষিকা আছে তাহাতে তাহাকে অভিভূতা করিতে পারে না। কেবল এই ব্রাহ্মণগণের স্বার্থের নিমিত্তই অসহায়া রমণীগণ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়; কারণ বালা, অনন্ত, ইয়ারিং প্রভৃতি যে সমস্ত অলঙ্কার সহগামিনীর অঙ্গে থাকে তাহা ব্রাহ্মণগণই পাইয়া থাকে। চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণগণ তাহা উঠাইয়া লয়।

ট্যাভারনিয়ে বলেন,—দেশীয় রীত্যনুসারে আমি তিন রকমে রমণীগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি। গুর্জ্জররাজ্যে, আগ্রায় এবং দিল্লীতে নদী বা পুষ্করিণীর তীরে প্রায় ১২ বর্গফুট ব্যাপী একখানি কুটীর নির্ম্মিত হয়। উহা ছোট ছোট আগাছা ও কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, উহার সহিত তৈল এবং অপর কতিপয় ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলে অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জলিত হয়। উক্ত কুটীর অভ্যন্তরে সতী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকে, বালিশের ন্যায় একরকম কাষ্ঠে তাহার মস্তক রক্ষিত হয়। পাছে অগ্নির তাপে শিকার পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ একটী স্তম্ভের সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশ বন্ধন করে। এই অবস্থায় তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সে তাহার মৃত স্বামীর দেহ ক্রোড়ে করিয়া রাখে। এইভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে ব্রাহ্মণগণ কুটীর হইতে বাহির হয় এবং সতী কুটীরে অগ্নিসংযোগ করিতে অনুমতি করে। ব্রাহ্মণ এবং সতীর আত্মীয়স্বজন অবিলম্বে তদনুসারে কার্য্য করে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার সমস্ত যন্ত্রণা উপশম করিবার অভিপ্রায়ে তৈলপূর্ণ পাত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকে। সতীদাহ হইলে ব্রাহ্মণগণ ভস্ম হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন প্রভৃতি যে কোনও ধাতু থাকে সংগ্রহ করে; এই সকল দ্রব্যে তাহাদেরই একমাত্র দাবী দাওয়া।

বঙ্গদেশে আর এক ভাবে সতী দাহ হয়। এই প্রদেশে দরিদ্রা রমণীগণ দাহের পূর্ব্বে মৃত স্বামীর দেহ গঙ্গায় ধৌত করিবার জন্য আনিতে পারে না এবং নিজেও গঙ্গাস্নান করিতে পারে না। ট্যাভারনিয়ে বলেন যে, কুড়ি দিনের দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতেও আধারে করিয়া শব গঙ্গাতীরে আনিতে দেখিয়াছেন; শবের দুর্গন্ধ বিনাশের নিমিত্ত নানা প্রক্রিয়া করিলেও তাহা হইতে অসহনীয় দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। একবার ভুটানের প্রান্তস্থিত গিরিপুঞ্জ হইতে এক রমণী গাড়ীতে করিয়া স্বামীর মৃত দেহ গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল। সে কুড়ি দিন হাঁটিয়া পথ অতিক্রম করে এবং ১৫।১৬ দিন পানাহার কিছুই করে নাই। পরে গঙ্গায় স্বামীর গলিত দেহ ধৌত করতঃ নিজেও অবগাহন করিয়া, সুস্থা হয়। সতীর সম্মুখে ঢাক, ঢোল, বাঁশী প্রভৃতি নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি হইতে থাকে এবং তিনি নানারূপ উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে চিতায় উঠিয়া শয়ন করে, পরে তাঁহার উপর স্বামীর শব রক্ষিত হয়। ইহার পর তাঁহার আত্মীয়বর্গের কেহ-বা একখানি পত্র, কেহ-বা একখানি কালিকট বস্ত্র, কেহ-বা একখানি রৌপ্য বা তাম্রখণ্ড সতীর হস্তে দিয়া, তাহা তাহাদের মাতা, ভ্রাতা বা অপর কোনও আত্মীয়বন্ধুকে দিবার জন্য আদেশ

আদেশ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করে। এইভাবে আদেশ করিয়া উপস্থিত দ্রব্য সমূহ দাতাকে প্রত্যর্পিত হইলে, সতী উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আর কিছু করিতে হইবে কি না, তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। কেহ কোন উত্তর না করিলে ডাকাতা বস্ত্র দ্বারা স্বামীর দেহ জড়াইয়া ধরিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে সতী আদেশ করেন। ব্রাহ্মণ ও রমণীর আত্মীয়গণ তদ্দণ্ডেই সে আদেশ প্রতিপালন করেন। টাভার্নিয়ে বলেন, বঙ্গদেশে কাষ্ঠের অভাব প্রযুক্ত এই সকল হতভাগ্য দম্পতীর দেহ অর্দ্ধদগ্ধ হইতেই টানিয়া গঙ্গার শীতল সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুর উদরে তাহা স্থান প্রাপ্ত হয়!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

হরিষ-মঙ্গল-চণ্ডী।

অদ্য 'আরতির' পাঠকবর্গের নিকট দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রণীত শীর্ষোক্ত নামধেয় একখানি প্রাচীন পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি পুঁথিখানি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র। কেবলমাত্র ২৩ পৃষ্ঠা; তাহাতে মোট পদসংখ্যা ৩৩২। প্রাচীন তুলোট কাগজের দুইপৃষ্ঠে লেখা। লেখাগুলি অতি সুন্দর;—গোট গোট অক্ষর। লেখকের নাম নাই; কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত মুন্সী ছিলেন।

গ্রন্থকর্ত্তা নিজের কোন সবিস্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। স্থানে স্থানে 'দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র কয়', 'দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ভণে' ইত্যাদি রকমের ভণিতা ভিন্ন তদীয় পরিচয়-জ্ঞাপক অন্য কোন কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতই থাকিয়া যাইতেছেন। পুঁথিখানি আমরা ত্রিপুরাঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তাই আমরা অনুমান করি, গ্রন্থকর্ত্তাও উক্ত অঞ্চলবাসী ছিলেন।

পুঁথির রচনা কবে হইয়াছিল, নিশ্চিত বলার উপায় নাই। প্রতিলিপিখানি সন ১২৩৩ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং উহার বয়স এখন ৭৯ বৎসর হইয়াছে। কাগজের অবস্থা কিন্তু এরূপ হইয়াছে যে, ইহাকে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ভাষালোচনা করিলে পুঁথিখানি অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

ইহা একখানি চণ্ডী-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৃহৎ কাব্যকারগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে যাহা অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই অতি সংক্ষেপে ও সুকৌশলে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-উপাখ্যানের সহিত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই সুপরিচিত বলিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম না।

কাব্যের মত হইলেও ইহা ঠিক কাব্য নহে,—একরূপ ব্রতকথা বিশেষ। সংক্ষেপতঃ ইহাকে চণ্ডী উপাখ্যানের একখানি Rough Sketch মাত্র বলা যাইতে পারে। চণ্ডীকাব্যের প্রাক্‌-চেষ্টা-স্ফুরণকালেই যে ইহা বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই জন্যই আমরা ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান করি। এই উপাখ্যান সর্ব্বাদৌ কাহার কল্পিত, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই; সুতরাং এই পুঁথির অবলম্বন কি তাহা বলা সহজ নহে। এতৎসাধনকল্পে আগে চণ্ডী-উপাখ্যানের সমস্ত পুঁথির সংগ্রহ ও প্রকাশ আবশ্যক। হয়ত কথক ইত্যাদির মুখেও এরূপ আখ্যায়িকা যুগ-যুগান্তরে চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহার অবলম্বনেই প্রাথমিক বঙ্গীয় কবিগণ নিজ নিজ কাব্যহার গাঁথিয়া গিয়াছেন। একই উপাখ্যান সকল কবির অবলম্বন হওয়ায় উপাখ্যানগুলি নূতনত্ব-বর্জ্জিত ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এরূপ উপাখ্যানে কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল বলিয়াই অধুনা ধারণা হয় না।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী-উপাখ্যানের সঙ্গে মূলতঃ মিল থাকিলেও রচনা সম্বন্ধে তাহার সহিত ইহার কোনও ঐক্য নাই। ইহার ভাবা সর্ব্বত্রই সহজ, অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে চৌত্রিশাক্ষরে ভবানীর একটি দীর্ঘ স্তব আছে। তাহা এরূপ ক্ষুদ্রায়াতন গ্রন্থের পক্ষে একটু অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে, বলিতে হইবে। যাহা হউক, এরূপ ক্ষুদ্র পুঁথি সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া নিম্নে আমরা পুঁথি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতেই পাঠকগণ ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে যথারীতি গণপতি প্রভৃতি দেবগণও মুনি-ঋষিবর্গের চরণে প্রণাম জানাইয়া এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন:—

"পঠমঞ্জুরি রাগ।

শুন সর্ব্বজন, কহি বিবরণ,
পৃথিবীতে স্থানখানি।
উজানি নগর, জানে সর্ব্বনর,
ইন্দ্রের অমরা জিনি॥
বিক্রমকেশরী, তাথে দণ্ডধারী,
প্রজা সবে পূজা করে।

সেইত নগর, মহা ধনেশ্বর,
ধনপতি বাস করে॥
তাহার অঙ্গনা, লহনা খুল্লনা,
গুণে শীলে আছে ভাল।
কামদেব রতি, দোঁহার মুরতি,
রূপেতে করিছে আল॥
ইথে ধনপতি, রাজ অনুমতি,
পালিতে গৌড়েতে গেল॥
গড়াইতে পিঞ্জর, গেল সদাগর,
বৎসরেক তথা হৈল।
দুই নারী এথা, শোন তার কথা,
লহনা কপট করে॥
সাধু নামে মাত্র, লিখি এক পত্র,
দিলেক খুল্লনা করে।
পত্র পাইয়া ধনী, পড়িল অমনি,
লিখিয়াছে ধনপতি॥
ক্রোধ হৈয়া অতি, 'লিখিয়াছে পত্রি,
শোন্‌লো খুল্লনা সতি।
তোর ব্যবহার, হইল প্রচার,
বনে চল শীঘ্রগতি॥
যত অজগণ, করিতে রক্ষণ,
নিযুক্ত করিল পতি॥"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীপতি সদাগর রাজাজ্ঞায়, মশানে নীত হইয়া ভবানীকে স্তব করিতেছেন :—

থর থর কাঁপে প্রাণ দেখিয়া শমন।
স্থির হৈতে নাহি পারি কি হবে এখন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন।
থাবা দিয়া প্রাণে রাখ দাসীর নন্দন॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ভৈরবী বগলা।
দশভুজা শাকাম্বরী চণ্ডিকা বিমলা॥

দয়া করি দয়াময়ী হওত সদয়।
দূর কর মহামায়া শমনের ভয়॥
ধরণী ধরিলা তুমি কূর্ম্মরূপ হৈয়া।
ধারা করিবণ কর আকাশেতে রৈয়া॥
ধ্যান করি মুনি তোমা না পাএ দেখিতে।
ধরিলু চরণ তব রাখ মশানেতে॥
নমো নারায়ণি ভীমা অম্বিকা অভয়া।
নরশির মালাগলে, বিশ্বরূপ কায়া॥
নগেন্দ্র-নন্দিনী কালী সাবিত্রী সর্ব্বানি।
নিদানে রাখহ মোরে পতিতপাবনী॥
পুরাণে প্রধান করে সীমা দিতে নারে।
পদনখে বিরাজিত রবি শশধরে॥
পরমা প্রকৃতি তুমি ত্রিগুণধারিণী।
পার কর কারাগার বিশ্ব-বিনাশিনী॥
ফাঁফর হৈনু মাতা দেখিয়া শমন।
ফিরিয়া না চাও বুঝি ক্রোধ করি মন॥
ফেলিছ সাগরে তুমি কে করিবে পার।
ফুৎকারে মারিয়া সৈন্য করহ উদ্ধার॥
বলিরে ছলিলা তুমি বামন হৈয়া।
ব্রজাঙ্গনা ভুলাইলা বাঁশী বাজাইয়া॥
বালীবধ কৈলা তুমি রামরূপ ধরি।
বালক তরাতে কেন করহ চাতুরী॥
ভারাক্রান্ত পৃথিবীতে হইল যখন।
ভীমারূপে কৈলা তুমি অসুর নিধন॥
ভুবনমোহিনী হৈয়া অমৃত হরিলা।
ভবার্ণব মাঝে কেন তরী ডুবাইলা॥" ইত্যাদি।

নানারূপ ক্লেশভোগের পরে ধনপতি সদাগর প্রভৃতি সকলে চণ্ডীকার প্রসাদাৎ বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রচয়িতা গ্রন্থের নাম "হরিষ-মঙ্গল-চণ্ডী" দিয়াছেন। "নববিকাশে" সমগ্র পুঁথিখানি প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীআবদুল করিম ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বহু-বিবাহ।

আমার প্রবন্ধের নাম পড়িয়াই অনেকে হয়তো পাতা উল্টাইবেন। এতদিন পর আবার বহু-বিবাহ সম্বন্ধে পুনরুক্তি কেন? বহু বিবাহরূপ বিষবৃক্ষ সময়ের এবং শিক্ষার প্রভাবে সমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কালে একবারে উঠিয়া যাইবে, সে বিষয় আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? বহু বিবাহ যে একটী গুরুতর কুপ্রথা এখন সে সম্বন্ধে আর মতভেদ নাই; সুতরাং নূতন করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যকতাও নাই।

বহু-বিবাহ কুপ্রথা হইলেও সমাজে স্থান পাইয়াছিল। সুতরাং মানব-সমাজের ইতিহাস হইতে বহু বিবাহরূপ পরিচ্ছেদটী পরিত্যাগ করা যায় না। কুপ্রথাই হউক আর সুপ্রথাই হউক যাহা সমাজে একদিন স্থান পাইয়াছিল তাহা সমাজতত্ত্বের হিসাবে উপেক্ষনীয় নহে।

বহু বিবাহ কিরূপে মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; কোন্ কোন্ জাতির ভিতর বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং কখন হইতে মানবসমাজে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এই সকল তথ্য বিবাহের ইতিহাসে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় নহে।

ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ (Diodorus Siculus) বলেন, প্রাচীন ইজিপ্টের ধর্ম্মযাজকগণ ব্যতীত আর সকলেই যত সংখ্যক ইচ্ছা পত্নী গ্রহণ করিত। ইহা ভিন্ন যুদ্ধে ধৃত শত্রু-রমণীগণও উপপত্নীরূপে রক্ষিত হইত। অধ্যাপক রলিন্‌সন্ (Rawlinson) বলেন, এসিয়ার নৃপতিগণও উপপত্নী রাখিতেন। মিডিয়া এবং পারস্যদেশে বহু বিবাহ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ঋগ্বেদের সময় বহু বিবাহ ছিল এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুও অবস্থা বিশেষে বহু-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হোমারের (Homer) সময় গ্রীসের লোকেরা উপপত্নী রাখিত। উহাদের এক পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিবার অধিকার ছিল; এবং প্রায় বিবাহিত পত্নীর ন্যায় সম্মান পাইত। কিন্তু প্রায়াম (Priam) ছাড়া প্রকৃত বহু-বিবাহ কেহই করে নাই। (Grote's History of Greece) কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে গ্রীসে বহু বিবাহ স্থান পাইয়াছিল। প্রাচীন রোমে এক পত্নীক বিবাহেরই অধিক প্রচলন ছিল। তাৎকালিক লোকেরা পত্নী অপেক্ষা উপপত্নীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। রুষিয়া এবং স্কেণ্ডিনেভিয়াতে বহু-বিবাহের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

আধুনিক অনেক খৃষ্টান জাতির মধ্যেও বহু বিবাহ স্থান পাইয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সংগ্রাম (Thirty years war) অবসানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে জার্ম্মানদেশে বহু-বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সেণ্ট অগষ্টাইন স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বহু-বিবাহকে দোষাবহ মনে করেন না। মার্টিন লুথার Philip the Magnanimous-কে বিশেষ রাজনৈতিক কারণে দুই বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে অনেক অসভ্যজাতি আছে যাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত নাই। এমন কি কোন কালেই ছিল না। বহু-বিবাহকে ঐ সকল অশিক্ষিত জাতি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অনেক দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য অধিবাসীরা বহু বিবাহ করে না। কেনারিদ্বীপ এবং এঙ্গলার অধিকাংশ জাতিই একনিষ্ঠ বিবাহ করিয়া থাকে। পশ্চিম সাহারার 'মুর' জাতিদিগের মধ্যে কেহই একসময়ে দুই পত্নী গ্রহণ করে না। কালিফর্ণিয়ার কিংক্লা ও জুরক জাতি একাধিক পত্নী গ্রহণ করাকে নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। 'কারোক' নামক অসভ্য জাতিরা তাহাদের দলপতিদিগকে পর্য্যন্ত বহু-বিবাহ করিতে দেয় না। প্রত্যেকেই দাসীরূপে যতসংখ্যক ইচ্ছা রমণী রাখিতে পারে কিন্তু তাহাদিগের সহিত সহবাস করিলে ঘোরতর নিন্দা হইয়া থাকে। সিংহলের 'বেদা' জাতি কখনও বহু-বিবাহ করে না। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করে না। আণ্ডামানের অধিবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ কেহই বহু বিবাহ করে না। তাহাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাও (Divorce) স্থান পায় নাই। নিকোবর দ্বীপের উত্তরাংশে যে সকল অসভ্যজাতি বাস করে তাহারা সকলেই এক-পত্নীক-বিবাহের পক্ষপাতী এবং উহাদের সমাজে অসতী স্ত্রীলোকের বড়ই দুর্ণাম। কুচ এবং আদিম কুকীদিগের মধ্যে কেহই বহু বিবাহ করে না এবং উপপত্নীও রাখে না। 'কোল্'জাতির মধ্যে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে তথাপি কেহ বহু-পত্নী গ্রহণ করে না।

নীলগিরির বেদাগা এবং আসামের নাগাজাতিদের মধ্যে একপত্নীক বিবাহ প্রচলিত। সাওতাল এবং ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ অসভ্যজাতিরা একাধিক পত্নীর পাণি পীড়ন করে না। আবার যাহারা ভ্রষ্টাচারী এবং পরস্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্যভিচারিগণ সমাজের ভিতর স্থান পায় না।

ডেলেগার (Dalager) বলেন—আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বহু-বিবাহ করিত না। তাহাদের ভিতর শতকরা ৫ জন লোক একাধিক পত্নী গ্রহণ করিত কি না সন্দেহ।

গ্রীণলণ্ডে এবং উত্তর আমেরিকার স্থানে স্থানে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ সকল দেশে প্রথমা পত্নীই গৃহস্বামিনীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়া পত্নী স্বামীর ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছার পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া সমধিক আদরের অধিকারিণী হন।

নিকারাগুইতে (Nicaragua) যে ব্যক্তি এক সময়ে একাধিক পত্নীর পাণি-পীড়ন করে সে তথাকার আইনানুসারে নির্ব্বাসিত হয় এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে গৃহীত হইয়া থাকে। বহু-বিবাহের জন্য কিরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা!

মেক্সিকো দেশে যে ব্যক্তি বহুপত্নী গ্রহণ করে তাহার সম্পত্তি প্রথমা পত্নী এবং তদীয়া পুত্রকন্যাগণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত সম্পত্তিতে তৎপরবর্ত্তী স্ত্রী কিম্বা সন্তানগণের কোন অধিকার থাকে না। পশ্চিম ভিক্টোরিয়া, সেমেও, টিহিটী প্রদেশের অধিবাসিগণ বহুপত্নীক; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও প্রথম বিবাহিতা পত্নীর সম্মান অধিক এবং সর্ব্ববিধ সাংসারিক কার্য্যে তাহার অধিকার। পরবর্ত্তী পত্নীগণ উপপত্নী স্বরূপ গৃহে বিরাজ করিয়া স্বামীর চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে।

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, ব্রহ্মায় এবং সাওতাল পরগণায় প্রথম পরিণীতা পত্নীই পতিকুলে সর্ব্ববিধ ক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া থাকে। চীন দেশীয় লোকেরা এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে পারে না; কিন্তু উপপত্নী গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। উপপত্নী সর্ব্বদাই বিবাহিত পত্নীকে সম্মান করিয়া থাকে; তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই। চীনদেশে—A wife cannot be degraded to the position of concubine, nor a concubine be raised to the position of a wife etc.—(Westermarck)

নিগ্রোজাতিরাও প্রথমা পত্নীর হাতে গৃহস্থালীর সকল ভার অর্পণ করিয়া থাকে। দামারা, বসেটো এবং জুলু জাতিদিগের মধ্যে কেহ বহু-বিবাহ করিলে প্রথমা পত্নীকে গৃহকর্ত্রী করিয়া রাখে।

বহু পত্নীক বিবাহ অপেক্ষা বহু পত্যাত্মক বিবাহপ্রথা বিরল। লেংস্ফোর্ড (Langsford) বলিয়াছেন, পূর্ব্বে 'এলিউসিয়ান' দ্বীপে এক স্ত্রী দুই স্বামী

গ্রহণ করিত। এস্কুইমস জাতিদের মধ্যে দুইজন পুরুষ একটী রমণীকে বিবাহ করিতে দেখা যায়। লুকাহিবাতে ধনী পরিবারের মহিলারা দুইজন করিয়া পতি রাখিয়া থাকে। একজনের অভাবে কি কিম্বা অনুপস্থিতে অন্য ব্যক্তি পত্নীর মনোরঞ্জন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

কেনারি দ্বীপের রমণীরা ততোধিক সংখ্যক স্বামী পোষণ করিয়া থাকে। তথায় প্রত্যেক বিবাহিতা স্ত্রীর তিনটী করিয়া স্বামী। হোটেন্‌টট্‌স্‌ রমণীরাও একাধিক পতিকে বিবাহ করে বলিয়া শুনা যায়। মাডাকাস্‌কার দ্বীপে হোভাস্‌ (Hovas) নামক এক জাতি আছে। তাহাদের পুরুষেরা বহুদিনের জন্য দূরদেশে গমন করিলে স্বীয় পত্নীকে পরপুরুষের সহিত সহবাস করিতে অনুমতি দিয়া যায়। বিরহ-বিধুরা পত্নীর জন্য ঈদৃশ ব্যবস্থা অতিশয় বিচিত্র।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের গবর্ণর Sir Henry Ward স্ত্রীলোকের বহুস্বামী গ্রহণপ্রথা উঠাইয়া দেন। এই নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্বে সিংহলী রমণীরা দুইটী হইতে সাতটী পুরুষকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। বেদাজাতি ছাড়া এখনও মধ্যে মধ্যে অন্য অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ বহু পত্যাত্মক বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর বিবাহের স্বামী প্রায়ই এক পরিবারের লোক, অধিকাংশ স্থলেই সহোদর।

টোডা জাতিরা সকল সহোদর মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করে। এই বিবাহিতা স্ত্রীর যদি ছোট বোন থাকে, সেও তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর স্বামীকে পতিত্বে বরণ করে। Dr. Shortt বলেন—Owing, however, to the great scarcity of women in this tribe, it more frequently happens that a single woman is wife to several husbands sometimes as many as six.

টোডা জাতিদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম বলিয়াই বহুসংখ্যক পুরুষ একটী রমণীকে বিবাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

মহীশূরের 'কুর্গ' জাতি, মালবারের 'নেয়ার', ভুটিয়া, খাসিয়া এবং সাওতাল-দিগের মধ্যে বহুপুরুষ মিলিয়া একটী যুবতীকে বিবাহ করিতে দেখা যায়। তিব্বতেও স্ত্রীলোকের বহু নষ্ট-উদ্বাহ প্রচলিত। ডাক্তার সর্ট (Dr. Shortt) আর এক অদ্ভুত রকমের বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রেডিস্‌দিগের (Reddies) পূর্ণযৌবন সম্পন্না রমণী সাত আট বৎসরের বালকের সহিত পরিণীতা হয়। কিন্তু ঐ বিবাহিতা যুবতী স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পিতৃব্য কিম্বা পিতার সহিত সহবাস করিয়া থাকে। এই সহবাসজাত সন্তান উক্ত স্ত্রীর স্বামীর ঔরস-

জাত বলিয়া গণ্য হয়। যখন স্বামী যৌবনে পদার্পণ করে তখন পত্নীর বার্দ্ধক্যকাল সমুপস্থিত হয় সুতরাং তাহাকেও অপরের স্ত্রীর অভিভাবকের পদান্বেষণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক সুসভ্যজাতির ভিতরই বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ আছে। মহাভারতকার দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল লিখিয়াছেন। ষ্ট্রেবো (Strabo) বলিয়াছেন, প্রাচীন মেডিয়া (Media) এবং আরবদেশে রমণীর বহুনিষ্ট বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। পিক্ট (Picts) রমণীরা বহুস্বামীকে বিবাহ করিত। আদিম ব্রিটনদিগের কথা সিজার (Caesar) বলিয়াছেন—১০। ১২ জন সহোদর ভাই-এ মিলিয়া এক রমণীকে বিবাহ করিত। অনেক সময় পিতা পুত্র এক নারীর পাণি পীড়ন করিতেও ত্রুটী করিত না।*

স্কেণ্ডিনেভিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও রমণীরা বহুস্বামী গ্রহণ করিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ অনেক দেবদেবীর আখ্যায়িকায় এই শ্রেণীর বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বহু পত্যাত্মক বিবাহ অনেক জাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছিল এবং এখনও কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আছে তথাপি এই শ্রেণীর বিবাহ অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

সুভাষিতাবলী।

১। নেপোলিয়ন বলিতেন, স্থির-প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত জ্ঞান। শিক্ষা কর—কার্য্যকর—যত্ন কর—ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত।

২। বিদ্যা, যৌবনের অলঙ্কার, বৃদ্ধকালের আশ্রয় এবং দরিদ্রের সান্ত্বনা; বিদ্যা সন্তোষের প্রস্রবণ।

৩। যদি তোমার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি থাকে, তবে পরিশ্রম উহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবে; আর যদি তোমার বুদ্ধির অল্পতা থাকে, তবে পরিশ্রম, ঐ অল্পতা দূর করিবে।

---

* "By tens and-twelves husbands possessed their wives in common and especially brother with brothers and parents with children."

৪। অলস ব্যক্তির জীবন—আকাশের ধূম ও সমুদ্রের ফেন-মালার ন্যায়।

৫। প্রকৃত-সাহস, শারীরিক-বল-প্রসূত নহে; উহা ধর্ম্ম-প্রসূত।

৬। সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন—নির্ম্মল অন্তঃকরণ অপেক্ষা দৃঢ়কবচ আর নাই।

৭। চোর ব্যক্তি, সকল স্থানেই পুলিশ কর্ম্মচারী বিদ্যমান আছে এইরূপ আশঙ্কা করে। দোষীব্যক্তি নিজের পাপের ভারে চূর্ণ হইয়া যায়। দোষী-ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক অনুসৃত না হইলেও ভয়ে পলায়ন করে।

৮। বাক্সের মধ্যে জিনিস রাখা দ্বারা সুশৃঙ্খলা-জ্ঞান প্রকাশ পায়। নির্ব্বোধ ব্যক্তি একটী বাক্সের মধ্যে যত দ্রব্য রাখিতে পারে, নিপুণ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য রাখিতে পারে।

৯। চঞ্চলতা কার্য্য-বিনাশক ও দুর্ব্বল-চিত্ততার পরিচায়ক। চঞ্চলচিত্ত-ব্যক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ কাষ্ঠ-বিড়ালের ন্যায় অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিষ্ফল পরিশ্রম করে; সে সতত গমন করে, কিন্তু বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। চঞ্চল-ব্যক্তি অনেক পদার্থই দেখে, কিন্তু কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করে না। সে বাক্‌পটু হয় বটে, কিন্তু তাহার বাক্যে সারাংশ থাকে না।

১০। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন না করিলে গভীর বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে পারা যায় না।

১১। যে ব্যক্তি আপন চিন্তা সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাকে অনেক বৃথা কথা বলিতে হয়। পত্রাবলীদ্বারা আচ্ছাদিত ফলের ন্যায় তাহার উদ্দেশ্য বাগাড়ম্বরে আবৃত থাকে।

১২। কুসংসর্গ সংক্রামক রোগের ন্যায়। কুসংসর্গ, পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে, মনকে নীচপথে লইয়া যায়।

১৩। মন মহত্ত্ব-সম্পন্ন না হইলে ধন-সম্পত্তি এক প্রকার অপবিত্র দরিদ্রতা মাত্র।

১৪। যিনি আপনাকে জয় করিতে পারেন তিনি দিগ্‌বিজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।

১৫। ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ধন-তৃষ্ণা প্রবলা হইয়া উঠিলে, সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তিই প্রভাহীনা হয়, নীচাশয়তা ও নিষ্করুণতা অমনি দেই উপস্থিত হয়, দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষা প্রায় তিরোহিত হয়।

১৬। যদি তোমরা অবশ্যম্ভাবিনী বিপত্তি পরম্পরায় অব্যাহত থাকিতে

এবং ভবিষ্যতে সুখী হইতে চাও, তবে ধীরতা ও দৃঢ়তাদ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে সুসংস্কৃত কর।

১৭। শিশুর হৃদয়, বীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র; ইহাতে যে প্রকার বীজ বপন করিবে, আজীবন তাহারই ফলভোগ হইবে।

১৮। মিতাচার, অপ্রমাদ ও ইন্দ্রিয়-দমন, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান উপাদান-সামগ্রী।

১৯। সত্যনিষ্ঠ পুরুষের যাবতীয় কার্য্যে সুন্দর সঙ্গতি থাকে। তাঁহার আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপর সুসংবাদী হয়, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা সমাদৃত হইয়া থাকেন। তাদৃশ পুরুষ দৈবাৎ অপরাদ্ধ হইলেও লোকে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষমা করে।

২০। অন্যে তোমাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলে সন্তুষ্ট হও, অপরের সহিত তোমাদিগের সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—এই সর্ব্বজনীন পবিত্র উপদেশ চিত্ত-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখ।

২১। বাগাড়ম্বর করিতে গেলে বিস্তর মিছা কথা বাহির হইয়া পড়ে। কবিবর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—"সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।"

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।



মানবের প্রেম।

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
বিধাতার প্রেম-রাজ্যে এইত বিধান!
নদী ধায় সিন্ধু-পাশে, সিন্ধু বাধে ভুজপাশে
প্রেমভরে চুমি সুখে প্রিয়ার বয়ান।

শত ঊর্দ্ধে দিবাকর, তবুও ত নিরন্তর
সদা পূজে সরোজিনী ত্যজি লাজ ভয় !
কেহ ত বারেক তায়, নিষেধ না করে হায়,
ফুল-বালা-মুখচুমে সতত মলয়।
প্রেমডোরে বাঁধা বিশ্ব, জগৎ প্রেমের শিষ্য,
মানব-হৃদয় মুখ্য প্রেম-নিকেতন,
কিন্তু সেই মানবের, এ কি অদৃষ্টের ফের,
তার পূত প্রেম থাকে সঙ্কে গোপন !
হৃদিমাঝে প্রেম ফুটে, তথায়েই পড়ে লুটে,
নাহি মানবের হেথা প্রেমের মিলন।
শুধু মানবের তরে আছে হেথা থরে থরে,
দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুধারা, সমাজ দলন
প্রেমে হেন অপমান, সহে কি প্রেমিক প্রাণ
আছে কি পাষাণ চাপা তাদের হিয়ায় !
মানবের তরে কেন, কঠোর নিয়ম হেন,
কেন তাহাদের প্রেম পূর্ণিত ব্যথায়।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

লিলি।

দার্জ্জিলিঙ্গে হেরিলাম কি সুন্দর লিলি
একসঙ্গে শোভে যেন সুরবালা গুলি,
ছোট ছোট দলগুলি ভূষণের মত
সমীরণ সঞ্চালনে দুলিছে নিয়ত,
নিরখিয়া, পরশিয়া প্রিয় লিলিফুল
আনন্দ আবেগে মন হইল আকুল,
পুনঃ পুনঃ লইলাম ফুলের সুবাস
মনের মালিন্য সব হইল বিনাশ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

ছোট ভ্রাতার প্রতি আশীর্ব্বাদ।

মনে রেখো ভাই! তুমি ভারত-সন্তান;
রত্ন-প্রসবিনী মাতা, সুজলা সুফলা মাতা
গাও আজি গাও 'বন্দে মাতরম্' গান।

মনে রেখো ভাই! তুমি ভারত-সন্তান;
জননীর যাহা আছে, তা ফেলে পরের কাছে,
কখনো যেও না ভাই থাকিতে পরাণ!

মনে রেখো ভাই! তুমি মায়ের সন্তান;
পূজিবে চরণ যাঁর, নিবারিবে সাধ্য কার
জননীর কাজে কর সরবস্ব দান।

মনে রেখো ভাই! তুমি ভারত-সন্তান;
বড়ই দুঃখিনী মাতা, বুকভরা কত ব্যথা
পর পদাঘাতে তার চূর্ণ মনপ্রাণ।

প্রাণাধিক ভাই! তুমি মায়ের সন্তান;
জননীর দুঃখ হরি', মুছাও নয়ন-বারি,
কার সাধ্য মার তব করে অপমান।

কর মৃত বঙ্গে মাতৃ-পূজা-আয়োজন;
দৃঢ় ঐক্য-সূত্র দিয়া, বেঁধে লও কোটি হিয়া
উঠক আনন্দধ্বনি বিদারি গগন।

এতদিন করিয়াছ মা'র অপমান,
পড়ি মার পদতলে, অনুতাপ-অশ্রুজলে
পাপমুক্ত হও আজি মায়ের সন্তান।

আশীর্ব্বাদ করি হও স্বদেশ-প্রেমিক
তুচ্ছ এই দেহপ্রাণ, মার তরে করো দান
গাও 'বন্দে মাতরম্' ওরে প্রাণাধিক।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

অতিথিসৎকার।

শ্যামল ধরিত্রী ক্রোড়ে পূত তপোবন,
ফল ফুলে সুশোভিত কুসুম কানন;
ফুলে ফুলে অলি সেথা ছুটিয়া বেড়ায়,
সহকার শাখে পাখী ঈশগীতি গায়;
পুষ্পে পত্রে স্বর্গশোভা রয়েছে ফুটিয়া,
লতিকা ঘুমায়ে আছে বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সেথা আপনার মনে,
রঙ্গ ভঙ্গে ক্রীড়া করে তপবালা সনে।
সোণার সাঁঝেতে স্নিগ্ধ মারুত-কম্পনে,
ব'য়ে যায় স্রোতস্বিনী কুলু কুলু স্বনে,
কুটীর বেষ্টিয়া শোভে শ্যাম তরুকুল—
মলয়ে আকুলি উঠে মঞ্জরি মুকুল।
ব্রতশীলা অচঞ্চলা ঋষিবালাগণ,
আলবালে সিঞ্চে নীর করিয়া যতন;
কক্ষেতে কলসী বহি সুন্দর শোভন,
সলিলে তিতিয়া বক্ষ বল্কল ভূষণ।
বিস্তৃত নীবারে সেথা ভরিয়া প্রাঙ্গণ,
পরি শ্রান্ত মৃগকুল করে রোমন্থন;
প্রভাতে প্রদোষে শুভ সামবেদ-গান,
আলোড়িত করে নিত্য সুপ্ত সমীরণ;
মালিনীর পূতনীরে মরাল মরালী
মনসাধে প্রেম-মদে করে সেথা কেলি।

আহরে সমিধ পুষ্প পবিত্র তাপস
অবগাহি মালিনীতে ভাবেতে বিবশ!
কণ্বপ পালিতা সেথা মেনকা-কুমারী—
পিতা-মাতা, জন্মকথা অবাধে পাশরি,
প্রিয়ম্বদা অনসূয়া সহচরী সনে,
শুচিস্মিতা ক্রীড়ারতা পুণ্য তপোবনে!
নিষ্ক্রান্ত মহর্ষি যবে তীর্থ পর্য্যটনে,
সুশীতল সুশ্যামল রম্য তপোবনে,
আসিল নবীন এক অতিথি সুন্দর,
কন্দর্প বিজিত রূপ অতি মনোহর!
রম্য ভালে রাজটীকা শোভিছে কেমন,
পৌরব-প্রকৃতি-নাথ সৌম্য-দরশন!
চাহিয়া অতিথিপানে মুগ্ধা শকুন্তলা,
শিহরি উঠিল বালা—আবেশ বিহ্বলা!
অনুরাগ প্রকাশিল বিমুগ্ধ নয়ন,
তুষিল অতিথে বালা, সমর্পি' জীবন।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

চণ্ডীদাস চরিত—

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল বিরচিত; মূল্য ১৲ টাকা।

বহু দিবস যাবত ব্রজসুন্দর বাবু বঙ্গসাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহার ভিতর তিনি কয়েকজন প্রাচীন কবির অপ্রকাশিত পদাবলী মুদ্রিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ব্রজসুন্দর বাবুর প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

চণ্ডীদাস চরিত ব্রজসুন্দর বাবুর আরব্ধ কার্য্যের ফল। চণ্ডীদাসের সুললিত ভাবপূর্ণ পদাবলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। চণ্ডীদাসের জীবনী কবিতা, প্রেম এবং ভক্তির পবিত্র ত্রিবেণী। এরূপ কৌতূহল

পূর্ণ চরিতকথা পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ব্রজসুন্দর বাবু ভক্ত-কবি চণ্ডীদাসের পুণ্যকাহিনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ব্রজসুন্দর বাবু তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে আজ আমরা কয়জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাই? পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত গগনপটে কি খদ্যোতের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়?" আমরা, হিন্দু ব্রজসুন্দর বাবুর মুখে এইরূপ অনুদার অভিমত শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কোন্ ধর্ম্ম বড় কোন্ ধর্ম্ম ছোট এই বিষয় লইয়া অভিমত প্রকাশ করা নিতান্তই গর্হিত কাজ। একবার মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ধর্ম্ম বড়। রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিক সরল কথায় উত্তর দিয়াছিলেন—জলকে পাণি বল, ওয়াটার বল, আর আব্ই বল, স্বাদ একই। উদার ভক্ত-কবি চণ্ডীদাসের জীবনচরিতে এরূপ সংকীর্ণ ভাব স্থান পাইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

নব্য জাপান—

শ্রীউমাকান্ত হাজারী প্রণীত। কলিকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে জাপানের ভৌগোলিক বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যশাসন, শিক্ষা ও রুষযুদ্ধ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রাঞ্জলভাষায় আধুনিক জাপানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ্য। বিষয়-সন্নিবেশ ও ভাষা বিন্যাসে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে। জাপানের সহিত হিন্দুদিগের ও তাদের সামঞ্জস্য বিচার কৌতূহলপ্রদ সন্দেহ নাই।

সারস্বত ময়মনসিংহ পঞ্জিকা—

১৩১৩ সন। শ্রী গোরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

আমরা বন্দু দেখিলাম তাহাতে ইহা প্রসিদ্ধ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রতিদিন মাহেন্দ্রযোগ এবং মাসের শেষে চন্দ্রের বিভিন্ন নক্ষত্রে সংক্রমণের বিবরণ এই পঞ্জিকার বিশেষত্ব দেখিলাম। বর্ষফলের প্রচিত বচনগুলির মধ্যে—"মহাতেজা মহানগ্নি সর্ব্বদা দহতে সদা।

মনুষ্যাণাং পবানাঞ্চ নিশ্চয়ং সর্ব্ব জন্তবু।" ইত্যাদি

অশুদ্ধ সংস্কৃত মৌলিকতার চিহ্ন কি না বলিতে পারি না।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ ১৩১৩। } চতুর্থ সংখ্যা।

নবজীবন। *

বাষ্প এবং তাড়িতশক্তির সমবায়ে ইয়ুরোপের আজ যে অবস্থা, তাহার সহিত এসিয়ার অনাবিল জীবনের তুলনা করিতে যাইয়া লজ্জিত হইবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। সেই প্রাচীন ব্যবসায়-বাণিজ্য, সেই শ্রমনিপুণ শিল্পী এবং খুচরা ফেরিওয়ালার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর; সেই গ্রাম্যবাজার এবং উৎসব-তিথির মেলা, স্বদেশীয় পণ্যদ্রব্য পূর্ণ ক্ষুদ্র নৌকাশ্রেণীর সেই উজান-ভাটী ইতস্ততঃ সঞ্চালন, প্রমোদ-প্রাঙ্গণে যবনিকান্তরালবর্ত্তিনী সুন্দরী ললনাগণের দর্শন এবং ক্রয়করণাভিপ্রায়ে ভ্রমণশীল বণিকের পণ্যসামগ্রীর এবং মণি-মুক্তা-প্রবাল প্রভৃতির সে প্রদর্শনী—এ সমস্ত ব্যাপার এখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যে ভাবে যতই কেন পরিবর্ত্তন হোক্ না, এসিয়া যদি তাহার আপন প্রকৃতিকে বিনষ্ট হইবার অবসর দেয়, তবে তাহার ঘোর অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; কারণ সেই এসিয়া-প্রকৃতিই বহুযুগ ধরিয়া শিল্প এবং ললিত কলাদি পালন করিয়া আসিতেছে। তাহার সেই প্রকৃতির বিনাশে কেবল যে শিল্প-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, পরন্তু শিল্পীর আনন্দময় কলহাস্য, তাহার কল্পনার স্বপ্নরাজ্য এবং সমগ্র মানবজাতির যুগযুগান্তব্যাপী শ্রমজাত জ্ঞানগরিমা সমস্তই তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নিজের ঘরের তাঁতে বুনান বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করার অর্থ—নিজের ঘরে বাস করা,—নিজের প্রকৃতির অনুকূল অবস্থা গড়িয়া তোলা।

সময়সংক্ষেপকারী দ্রুত বাষ্পীয় শকটারোহণে কি উৎকট আনন্দ তাহা এসিয়া জানে না সত্য, কিন্তু তীর্থযাত্রী ও ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পর্য্যটন-দক্ষতা

* The Vista,—The Ideals of the East. By Kakasu Okakura.

এখনও তাহার অস্থিমজ্জাগত। ভারতীয় যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পল্লী-গৃহলক্ষ্মীগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায় অথবা সন্ধ্যাকালে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে গ্রাম্য কৃষককুলের সহিত নানারূপ কথোপকথনে ব্যাপৃত হয় তাহারাই প্রকৃত ভ্রমণকারী; তাহার নিকট গ্রাম্য-প্রান্তরস্থিত প্রাকৃতিক দৃশ্যই একমাত্র দর্শনীয় পদার্থ নহে। এখানে নানাপ্রকার অভ্যাস ও সংসর্গ, মানব-প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ ও জনশ্রুতি একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; এই পর্য্যটকগণ তৎসমুদয় এবং স্থানীয় জীবন-নাট্যের হর্ষ-বিষাদে সম্পূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করতঃ সেই সমস্তভাব ও দৃশ্যকে অধিকতর মনোরম করিয়া তোলে। আবার জাপানী কৃষকপর্য্যটক ভ্রমণব্যপদেশে কোন মনোজ্ঞ স্থানে উপনীত হইলে, তথায় একটী সরল সহজ "হোকু" (ক্ষুদ্র কবিতা) রচনা না করিয়া স্থান পরিত্যাগ করে না।

এইরূপ ভূয়োদর্শন দ্বারা সুচিন্তা ও ধর্ম্মের সম্মিলনে এবং কঠোরতা ও মৃদুতার সমবায়ে প্রাচ্য-মানব স্বভাব পরিপক্ক হয় এবং জীবন্তজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। এই প্রকারে প্রাচ্যদেশে মানবজাতি পরস্পরের সহিত পরস্পরের চিন্তা বিনিময় করিয়া থাকে. সেখানে গ্রন্থের মুদ্রিত সূচীপত্রই শিক্ষার চরমোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বৈষম্য লিখিয়া শেষ করা যায় না। প্রাচ্যের গৌরব-রবি এখানেই অস্তমিত নহে—তাহা আরও বাস্তব। যাহার প্রভাবে প্রত্যেক হৃদয় শান্তির দোলানিতে (vibration) কম্পিত হয়, যে ঐক্যতানে সম্রাট ও কৃষককে একত্র সম্মিলিত করে, সে স্বাভাবিক গভীর ঐক্যভাব সমস্ত সহানুভূতি ও অমায়িকতা প্রসব করে,—যাহা শীতরজনীতে শয্যা-পরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া জাপ-সম্রাট টাকাকুরাকে দরিদ্র প্রজার তুষারাবৃত গৃহে উপনীত করতঃ অগ্নির অভাব স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার দুঃসহ অন্নকষ্ট অবলোকন করিয়া টাঙের টাইশেকে অন্নজল পরিত্যাগ করায়—তাহাই প্রাচ্যের মহিয়সী মহিমা। জগতের শেষ ধূলিকণাও নির্ব্বাণানন্দ লাভ না করা পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্ব স্বয়ং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে বিরত হইয়া যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এসিয়ার মহত্ত্ব। যে স্বাধীনতা পূজার দরিদ্রকে মহত্ত্বের আলোকেমণ্ডিত করে, ভারতীয় নরপতিকে সামান্য সাজে সজ্জিত করে এবং পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী শাসন কর্ত্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র চীনসম্রাট যে প্রভাবে কখনও তরবারি স্পর্শ না করিয়াও সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, তাহাই প্রাচ্যের মহিমা।

ইহাই এসিয়ার বিজ্ঞান, কলা এবং শিল্পের গুপ্তশক্তি। এই সমস্ত সংস্কার বিস্মৃত হইলে,—ভারতবর্ষের সেই ধর্মজীবন, যাহা তাহার জাতীয় জীবনের মূলশক্তি, তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং সে দিন দিন নীচতা, অসত্য এবং নূতনত্বের সেবক হইয়া দাঁড়াইবে; চীন নৈতিক-সভ্যতার পরিবর্ত্তে পার্থিব সভ্যতা-সমস্যায় নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে; যে নৈতিক বল প্রভাবে চৈনবণিকের মুখের কথা পাশ্চাত্য দলিল অপেক্ষাও সমধিক সম্মানিত ছিল এবং চৈন-কৃষক অসীম সৌভাগ্য ভোগ করিত, তাহা তাহাকে হারাইতে হইবে। এবং অমর-জাতির পিতৃভূমি—জাপান, আপন নিষ্কলঙ্ক আধ্যাত্মিক দর্পণ কলুষিত করতঃ ইস্পাত তরবারিকে মাযকে পরিণত করিবে। এমতাবস্থায় এসিয়ার বর্ত্তমান সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য—এসিয়ার প্রাচীন রীতিনীতি সংরক্ষণ ও পুনঃ সংস্থাপন। কিন্তু ঐ সকল রীতিনীতি, সর্ব্বপ্রথম তাহাকে জানিয়া লইতে হইবে; অতীতের ছায়াই ভবিষ্যতের আশা। বীজমধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে, বৃক্ষ তদপেক্ষা বৃহৎ হইতে পারে না। জীবনের অর্থ—আপনাতেই প্রত্যাবর্ত্তন। এই সত্য বহুতর ধার্ম্মিকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, ডেল্‌ফিক্ দৈববাণীর প্রধান গুপ্ত উপদেশ—"আপনাকে জানিতে শিখ।" কন্‌ফিউসিয়াসের গম্ভীর স্বর "তোমাতেই সব আছে।" ভারতীয় গল্পে এই তত্ত্বই আরও গম্ভীর স্বরে তদীয় শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন যে, একদা প্রভুর আদেশে শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্মুখে সম্মিলিত হইয়াছে, এমন সময় সহসা এক বিরাটমূর্ত্তি—সেই মহান্ ঈশ্বর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শিবমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইলেন; এক বজ্রপাণি ব্যতীত সে আলোক আর কাহারও চক্ষে সহ্য হইল না। অপরের বজ্রপাণি শিষ্যগণকে অন্ধবৎ দেখিয়া বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— গঙ্গাসৈকতের বালুকণার ন্যায় অসংখ্য নক্ষত্র এবং দেবতা দেখিয়াছি কিন্তু কুত্রাপি এমন মোহনীয় মূর্ত্তি দেখি নাই। বলুন, ইনি কে? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন,—"ইনি আপনারই আত্মা।" কথিত আছে, এই কথা শুনিয়াই বজ্রপাণি উৎকৃষ্টতম জ্ঞান (নির্ব্বাণ) লাভ করেন।

যে প্রবল ঝটিকায় প্রাচ্য ভূখণ্ডকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, জাপান সেই বেগশালী প্রভঞ্জনমধ্য হইতেই আত্মতত্ত্বের কণিকামাত্র অবগত হইয়া, আপনাকে পুনর্গঠিত করিয়াছে এবং সেই আত্মতত্ত্ব পুনর্জ্জীবিত হইলেই তাহাতে এসিয়ার পূর্ব্বতন শক্তি ও স্থিতিশীলতা গঠিত হইবে।

কিন্তু বর্ত্তমানে বহুতর পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতে আমাদিগকে আন্দোলিত

করিতেছে। যামাট্যের দর্পণ যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই বিপ্লব সময়ে, জাপান সত্য সত্যই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং নবজীবন লাভের প্রয়োজনীয় উপাদান সেইখানেই অন্বেষণ করিতেছে। অকৃত্রিম পুনরভ্যুদয়ের সহিত প্রাচীন অভ্যুদয়ের কিছু পার্থক্য থাকিয়া যায়, জাপানেরও তাহাই হইয়াছে। আশিকাগা রাজগণের চেষ্টায় জাপানী শিল্প প্রকৃতি-আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, এখন তাহা সমস্ত জগতের সেবায়—মানবের সেবায় আপনাকে ধন্য করিতেছে। আমরা বুঝি, আমাদের ভবিষ্য-রহস্য-বীজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসেই নিহিত আছে, তাই অন্ধ আবেগের সহিত তাহার সূত্রানুসন্ধান করিতেছি। যদি এ চিন্তা সত্য হয়, সত্যই যদি অতীত ইতিহাসে নবজীবনের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে, তাহাতে সমধিক শক্তি সংযোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমান নীচতার অনলবৃষ্টি—জীবন ও শিল্পকলার কণ্ঠশোষ বৃদ্ধি করিতেছে।

যে ক্ষণপ্রভার সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে এই গাঢ় তমোমণ্ডল অপসারিত হইবে, আমরা তাহারই আশায় বসিয়া আছি। কারণ বর্ত্তমানের এই ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিতেই হইবে কিন্তু নবোৎসাহের শান্তশীতল বারিধারা বর্ষণে ধরণীবক্ষ সরস না হইলে তাহাতে কুসুমস্তবক প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। এবং বর্ষণের পূর্ব্বের সেই মেঘগর্জ্জন এসিয়া হইতেই, মানবজাতির সেই প্রাচীন রাজবর্ত্ম দিয়াই শ্রবণ করিতে হইবে। তাহাতে হয় আত্মশক্তির জয়, না হয় বহিঃশত্রুর হস্তেক্ষয়;—

"Victory from within, or a mighty death without."

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

পলাতক।

(১)

কলিকাতা সহরে ভয়ানক গোলমাল। ইংরাজি দৈনিক পত্রে—বড় বড় অক্ষরে কখনও লিখিত হইতেছে "ব্যাঙ্কে ভয়ানক চুরি"—কখনও লিখিত হইতেছে "বৃহৎ তহবিল তসরূপ,"—আর একখানা কাগজ খুলিয়া দেখ তাহাতে "নারাণ চাটুয্যে ধৃত হইয়াছে"—আর একখানা কাগজে "পুলিশ এখনও তাহাকে

ধরিতে পারে নাই”—আবার কোন কাগজওয়ালা লিখিয়াছেন—“ধরা পড়িয়াছিল আবার পলাইয়াছে।” এইরূপ ও নানারূপ কথা কলিকাতাবাসিগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে।—একখানা খবরের কাগজ একজন উচ্চৈস্বরে পড়িতেছে, দশজন তাহাকে ঘিরিয়া কৌতুক ও কৌতুহলে আপাদ মস্তক পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।

ট্রামে,—গাড়ীতে,—রেলে—আফিসে, রাস্তার মোড়ে সর্ব্বত্রই নারাণ চাটুয্যের কীর্ত্তি—দশজনে সমবেত হইয়া আলোচনা করিতেছে।

নারাণ চাটুয্যে—“ভারতব্যাঙ্কে” কাগজ পড়িত,—রাশি হিসাব বিভাগে সে এক-শ টাকা মাত্র মাহিয়ানা পাইত,—তাহার বয়স তিরিশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে,—তাহার চেহারাতেও কোন বিশেষত্ব ছিল না। প্রত্যহ সে দশটার সময় শেয়ালদহে ট্রামে চড়িয়া ব্যাঙ্কে যাইত,—এই পর্য্যন্ত, কলিকাতার কেহই তাহাকে চিনিত না। এক-শ টাকা মাহিয়ানার কেরাণী এ সহরে হাজার হাজার আছে সুতরাং নারাণ চাটুয্যেকে তাহার আত্মীয় স্বজন ব্যতীত আর কে চিনিবে?

কিন্তু আজ সে যেন একবারে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে; আজ প্রকাশ পাইয়াছে সে এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে দশ লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়াছে! এক শত টাকার কেরাণী দশ লক্ষ টাকা ভাঙ্গিল, এ কথাটা বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচির মত নিতান্তই অদ্ভুত। এত টাকা সে কিরূপে সরাইল,—কেহ তাহা পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই!—লোকে ইহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছে—অনেকেই ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া বলিতেছে, যাই বল আর যাই কও—লোকটার বাহাদুরি আছে।

কেবল যে এত টাকা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই তাহার বাহাদুরি তাহা নহে! সে ফেরার হইয়াছে—শিয়ালদহের বাটীতে পুলিশ তাহাকে ধৃত করিতে আসিয়া শুনিল যে কেবল অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

এই অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পাইয়া সে এমনই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে যে পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধানই পায় নাই। এইরূপ বারংবার।

এবার তাহার পলায়নের পর প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে—পুলিশ ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে টেলিগ্রাফ করিয়াছে—তাহার চেহারার বর্ণনা সর্ব্বত্র পাঠান হইয়াছে,—ডিটেকটিভগণ দেশে-বিদেশে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে—তাহার সন্ধান দিতে পারিলে সেই ব্যাঙ্ক হইতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে। কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই

নানা গুজব প্রচার উঠিতেছে। এই ধরা পড়িয়াছে—আবার প্রচার হইল, না—ধরা পড়ে নাই। কেহ রটাইল সে ব্রহ্মে পলাইয়াছে,—কেহ বলিল চন্দন নগরে লুকাইয়া আছে। একদিন রটিল সে জাপানে পৌঁছিয়াছে—কেহ কেহ বলিল সে বিলাত যাইতেছিল,—জাহাজে ধরা পড়িয়াছে।

যাহা হউক একমাস কাটিয়া গেল, নারাণ চাটুয্যের আজও কোন সন্ধান হইল না।

(২)

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর খুব রৌদ্রের সময় আহিরীটোলার এক গলির ভিতর একখানা গাড়ী আসিয়া লাগল। গাড়ী হইতে একটী যুবক ও একটী রমণী নামিয়া একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গাড়ীর ঘোড়া দুইটী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই গাড়ী বহুদূর হইতে আসিয়াছে। ঘোড়া দুটীর মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে,—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত।

তখন প্রায় বেলা একটা বাজে। পথে লোক চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়াছে। চৈত্রমাসের প্রখর রৌদ্রে যেন বিশ্ব পৃথিবী ঝলসিয়া যাইতেছে; নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এসময়ে সহজে কেহ বাটীর বাহির হইতে চায় না।

যুবকের মুখ ও মস্তক চাদরে এরূপভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে সহজে তাহার মুখ দেখিবার উপায় ছিল না। সম্ভবতঃ দারুণ রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য তিনি মাথায় এরূপ ভাবে চাদর জড়াইয়া ছিলেন।

রমণীর গায় একখানি মোটা চাদর ছিল, তাহাতেই তিনি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এমন এক সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়াছিলেন যে তাহার মুখ দেখিবার কোন উপায় ছিল না।

উভয়ে কিছুদূর এই ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া আসিয়া আর একটা গলির সম্মুখে আসিলেন, সে গলিটা আরও সংকীর্ণ। এত সংকীর্ণ যে দুইজনের পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই।

কিছুদূর গিয়া যুবক মৃদুস্বরে রমণীকে কি বলিয়া অন্যদিকে দ্রুতপদে কাঁ করিয়া সরিয়া গেল। রমণী শঙ্কিতভাবে দ্রুতপদে এই ক্ষুদ্র গলির ভিতর আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই গলির প্রান্তভাগে একটী ত্রিতল বাটী, এই বাটীর দরজায় আসিয়া গলি শেষ হইয়াছে। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ—রমণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কড়া নাড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিল,—স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতে লাগিল।

রমণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি—রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তিনি কি বাটী আছেন?"

"হাঁ—আছেন—খবর দেব?"

"না—তিনি আমায় চিনেন।"

এই বলিয়া রমণী গৃহ প্রবেশে উদ্যত হইলেন,—ভৃত্য পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রমণী বাটীর মধ্যে আসিলে ভৃত্য দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, "তিনি তেতালার ঘরে থাকেন—এই দিকে সিঁড়ি।"

রমণী কোন কথা না কহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেলেন।

ত্রিতলে একটী মাত্র ঘর। তিনি দেখিলেন ঘরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ, তিনি আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিলেন। তখন ভিতর হইতে কে বলিল, "কে?"

রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি।" তখনই দ্বার খুলিয়া গেল—রমণী ঝড়ের বেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

গৃহস্থব্যক্তি বিস্মিত ও সন্ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি!—তুমি যে আজ সহসা এখানে!"

রমণী প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "চুপ—দরজা দাও!"

রমেশচন্দ্র দ্বাররুদ্ধ করিয়া আবার সেইরূপভাবে বলিলেন, "তুমি—তুমি এখানে—তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল?"

রমণী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আগে বল তুমি ভাল আছ—তারপর তোমার অন্যকথা শুনিব।"

রমেশচন্দ্র আরও বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভাল আছি—আমার কি হইয়াছে—তুমি এখানে আসিলে কেন?"

রমণী বলিলেন, "তুমি পত্র লিখিয়াছিলে?"

রমেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আমি পত্র লিখিয়াছিলাম—সে কি?"

রমণী বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। তাহাতে কেবলমাত্র লেখা আছে :—

"মৃত্যুশয্যায়—যদি শেষ দেখা দেখিতে চাও শীঘ্র আসিও।"

রমেশচন্দ্র এক নিমিষে বিবর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া

আসিল,—তিনি ব্যাকুলভাবে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আর কি। সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

রমণী রমেশচন্দ্রের স্ত্রী—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন তাহা হইলে এ খানা তোমার চিঠি নয়।"

"না—এ চিঠি আমি লিখি নাই।"

"এ যে তোমারই হাতের লেখা।"

"জাল করিয়াছে।"

রমণী হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন "যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই—পুলিশেরই এ কাজ,—ভাবিয়াছিল তুমি নিশ্চয়ই আমার ঠিকানা জান,—এ রকম পত্র পাইলে নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকট ছুটিবে—তাহারাও তোমাকে নজরবন্দি রাখিবে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট আসিবে।"

রমণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, "আমিই শেষে সর্ব্বনাশ করিলাম।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন "তোমার অপরাধ নাই, হয়তো তাহারা তোমার ঠিক অনুসরণ করিতে পারে নাই এখন বল দেখি শুনি, তুমি এখানে কি রকমে আসিয়াছ।"

"এই চিঠি খানা পড়েই আমি দাদাকে দেখাইলাম। আমরা কেহই কোন সন্দেহ করি নাই; আর বুঝিতেই পারিতেছ, এমন ভয়ানক চিঠি পাইয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়।

"তোমার বিশেষ কোন দোষ দেখি না।"

"তাহার পর শোন, আমি দাদার সঙ্গে তখনই বাহির হইলাম। দাদা বলিলেন পুলিশ আমাদের বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছে—তাহারা আমাদের অনুসরণ করিতে পারে সুতরাং একেবারে সেখানে যাওয়া হইবে না, কোচম্যানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া আগে কালীঘাট যাইব,—তাহার পর নানাস্থান ঘুড়িয়া বেলা একটার সময় এখানে আসিব। আমরা সেই রকমই আসিয়াছি।"

"তোমার দাদা কোথায় গেলেন।"

"তিনি আমাকে এই গলির মুখে রাখিয়া কাছেই লুকাইয়া আছেন?"

"তোমাদের যাহা করা উচিত করিয়াছ—এখন ভগবানের হাত। কিন্তু শোন বিরাজ, আমাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের কর্ম্ম নয় যদিও দৈব দুর্ব্বিপাকে একান্ত ধরা পড়ি জীবিতাবস্থায় আমাকে কেহ পাইবে না, শেষে পুলিশকে

আমার মৃত দেহ বহন করাইয়া ছাড়িব।" এই দেখ বলিয়া একটা গুলিভরা পিস্তল পকেট হইতে বাহির করিয়া বিছানার উপরে রাখিলেন।

বিরাজমোহিনীর আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল; সে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া কাতরভাবে বলিল, "কি ভয়ানক! তবে কি তুমি আত্মহত্যা করিতে চাও?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "সহজে নয়—একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে কি করিব এখন ঠিক নাই।"

"এই সময়ে বাহির হইতে দ্বারে কে ধাক্কা দিল। উভয়েই চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন বাহির হইতে ভৃত্য বলিল, "একটী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন "নিম্নের ঘরে তাঁহাকে বসাও; বল পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা হইবে।"

তখন রমেশচন্দ্র স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "বিরাজ বোধ হয় এই আমার শেষ।" বিরাজের চক্ষু দু'টী অশ্রুজলে ডুবিয়া গেল মুখের উপর কাপড় দিয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই রমেশচন্দ্রই সেই পলাতক নারাণ চাটুয্যে।

(৩)

আমরা যে ত্রিতল বাটীর কথা বলিলাম, তাহাতে যে আর কেহ ছিলেন না এমন নহে। দ্বিতলের ঘরে দুইটী ভদ্রলোক বসিয়া কথা কহিতে ছিলেন। উভয়েই সমবয়স্ক,—বয়স ছত্রিশের মধ্যে,—একজনের সম্মুখে একটা বাক্স রহিয়াছে,—বাক্সের উপর কতকগুলি কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি। সে গুলি দেখিলেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায় ইনি দালালি করেন। অপর ব্যক্তি ইহার পরিচিত লোক,—বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেহ।

বন্ধু বলিলেন, "অবিনাশ বাবু—ব্যাঙ্কের চুরি সম্বন্ধে অদ্য কোন নূতন খবর শুনিলেন?"

অবিনাশচন্দ্র বাক্স বন্ধ করিয়া বলিলেন, "না—নূতন আর কই—তবে গুজবের অপ্রতুল নাই।"

"আমাদের দেশের পুলিশ যে নিতান্ত অপদার্থ তাহা এই ব্যাপারেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুনিলাম নাকি পুলিশ এবার তাহার বাটী যাইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বাটী হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল—আধ ঘণ্টা আগে সরিল,—

দশ লাক টাকা লইয়া সরিল,—আর তাহাকে ধরিতে পারিল না, ইহাতে কি বলিতে ইচ্ছা করে ?"

"তাহারও স্ত্রী-পরিবার আছে—ধরা পড়িলে আমাদের লাভ কি !"

"আমাদের লাভ বেশী কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু একরাশি টাকা !"

"তাতে আমাদের কি, যদি যথার্থই ব্যাঙ্কের দশলাক টাকা চুরি গিয়া থাকে, তবে সে দোষ নারাণ চাটুয্যের নয়,—ব্যাঙ্কওয়ালাদিগের,—তাহারা অন্ধ হইয়াছিল কেন ? নারাণ চাটুয্যেকে এত টাকা চুরি করিবার সুবিধা দিল কেন ?"

"সে কথা ঠিক।"

"এখনও আমরা নারাণ চাটুয্যের কি বলিবার আছে, তাহার কিছুই শুনি নাই—একপক্ষের কথা শুনিয়াই তাহাকে চোর জুয়াচোর বলিয়া গালি দিতেছি হয়-ত লোকটা নির্দ্দোষ হইতে পারে ; অবস্থাগত প্রমাণের উপরে লোকটা এখন ভয়ানক জুয়াচোর বনিয়া গিয়াছে ; এমন কি সে অন্য কোন জুয়াচোরের ষড়যন্ত্রেও এইরূপ বিপন্ন হইতে পারে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে, রামের অপরাধে শ্যামের মাথায় লাঠি পড়িয়াছে।

তবে যথার্থই যদি এত—"তা বটে কিন্তু এত টাকা লইয়া সে করিল কি—দু চার-শ নয়, দশ লাক টাকা—কুবেরের ভাণ্ডার, অথচ শুনিতে পাই তাহার কোন বড় মানুষি ছিল না।"

"এই জন্য তাকে আমার নির্দ্দোষ বোধ হয়, যাহাই হউক আমি তাহার বিষয় বিশেষ কিছুই জানিনা,—কেমন করিয়া বলিব ?"

এই সময়ে বাহিরের দরজায় কে সজোরে কড়া নাড়িল।

বেহারা ছুটিয়া দরজা খুলিতে গেল।

ভৃত্য দরজা খুলিয়া দেখিল একজন স্থূলোদর খর্ব্বকায় লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া,—তাহার এক চক্ষু টেরা,—মুখে বসন্তের দাগ,—গোঁফ জোড়া অস্বাভাবিক বড়,—দেখিলে লোকটার উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়,—ভয়ও হয়। তবে ইহার বেশভূষা ভদ্রলোকের ন্যায়,—পরণে ভাল কালাপাড় ধুতি, গরদের কোট, রেশমী উড়ানী. পায়ে বার্ণিস করা বিলাতী জুতা।"

সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার একটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক এই মাত্র এ বাটী আসিয়াছেন ?"

ভৃত্য কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, তিনি

তাহার পাশ কাটাইয়া সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিশেষ দরকার—তাই ছুটিয়া আসিয়াছি—বিশেষ দরকার—তাহাকে একবার এখনই খবর দাও।"

ভৃত্য নড়ে না, তাহার পিটে একটা ছোটখাট ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "যাও—যাও—শীঘ্র যাও—ভারি দরকার।"

ভৃত্য বলিল, "দাঁড়ান—খবর দি।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "চল—আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

ভৃত্য একটু ভাবিয়া বলিল, "আসুন।"

সে সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে—যে গৃহে অবিনাশবাবু তাহার বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই গৃহে আনিয়া বলিল, "ইনি সেই মেয়ে মানুষটীর সঙ্গে দেখা করিতে চান।"

অবিনাশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোন্ মেয়ে মানুষ?

তখন সেই ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাশয়,—বৃথা গোপন করিবার চেষ্টা করিবেন না—আমার সহিত চালাকিও চলিবে না।"

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর রামলাল মুখার্জ্জি।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমার বাড়ী কি জন্য অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।"

"এই বাড়ীতে পলাতক নারাণ চাটুয্যে লুকাইয়া আছে।"

"আপনার ভুল হইয়াছে—এখানে নারাণ চাটুয্যে বলিয়া কেহ নাই।"

রামলাল সহাস্যে বলিলেন, "রামলাল ভায়ার ভুল হয় না। আমরা নারাণ চাটুয্যের হাতের লেখা জাল করিয়া তাহার স্ত্রীকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম,—সেই পত্র পাইয়া সে এখানে আসিবার জন্য সকালে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল—পাছে আমরা তা'র অনুসরণ করি বলিয়া কালীঘাট গিয়াছিল, তাহার পর কত ঘুরিয়া এই বাড়ীতে ঢুকিয়াছে—এবার ভায়া জালে পড়িয়াছেন।

অবিনাশবাবু বলিলেন, "বসুন—তামাক খান—আপনার ভুল হইয়াছে। এ বাড়ীতে কেবল আমিই থাকি—আমার স্ত্রী-পরিবার কেহ এখানে এখন নাই। ত্রিতলের ঘরে রমেশবাবু নামে আমার একটী বন্ধু পীড়িত আছেন,—তাঁহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—ইহাতেই আপনি হয়-তো ভ্রমে পড়িয়াছেন।"

"না—রামলালের ভ্রম হয় না।"

"এখান হইতে উপরে যাইবার এবং নীচে যাইবার সিঁড়ী আপনার সম্মুখেই দেখা যাইতেছে—আপনিও সিঁড়ীর উপর নজর রাখিয়াছেন দেখিতেছি, সুতরাং আপনার অজ্ঞাতে কেহই উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতে পারিবে না,—তবে আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? তামাক খান। আমি বেহারাকে দিয়া রমেশবাবুকে সংবাদ দিতেছি,—তিনি এখানেই আসিবেন,—তখন আপনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিবেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী রহিয়াছে সেখানে যাওয়া কি আপনার উচিত?"

রামলাল বসিলেন না,—দাঁড়াইয়া রহিলেন,—সিঁড়ীর দিকেই তাহার অবিচল দৃষ্টি—তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, তবে খবর দিন, শীঘ্র তাহাকে এখানে আসিতে বলুন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

নববর্ষ।

এস নববর্ষ করি শুভ সম্ভাষণ;
ফুল্ল প্রাণে হাসিমুখে নব আশা লয়ে বুকে
করিতেছি বঙ্গগৃহে সাদরে গ্রহণ;
ভুলেছি অতীত কথা হৃদয়ের তীব্র ব্যথা
মুছিয়াছি চিরতরে সজল নয়ন;
যে যাতনা দুর্ব্বিসহ সহিয়াছি অহরহ
দিয়েছি বিস্মৃতিজলে চির বিসর্জ্জন,
ঢাকিয়া প্রাণের ক্ষত চির-সুহৃদের মত
নিতেছি তোমায় আজ করিয়া বরণ।
এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ।

২

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ;
নীরবে শাসন তব সদা শিরপাতি ল'ব
হইবে না শোকে দুঃখে বিচলিত মন;
চাহি না জানিতে আর ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার
কি হবে শুনিয়া বল অদৃষ্ট লিখন?

নবীন প্রভাতে আজ ম্লান প্রকৃতির সাজ,
হু হু করি বহিতেছে প্রবল পবন
শঙ্কিত বিহঙ্গ নীড়ে বসে আছে চুপ করে
নীরব নিস্তব্ধ এবে বন উপবন,
আসিতেছে যেন এক প্রলয় ভীষণ।

৩

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ;
বল বাঙ্গালীর তরে, এনেছ যতন করে
কত তীব্র অত্যাচার কত নির্য্যাতন,
সুষুপ্ত পতিত যারা হয় কি জাগ্রত তারা
না করিলে নিরমম গুরু উৎপীড়ন,
দারুণ আঘাত বিনে আসে কি শকতি প্রাণে
হয় কি ভীরুর বুকে সাহস ভীষণ?
চাহি না মমতা দয়া হোক্ উত্তেজিত হিয়া
প্রতিপদে লভি দুর্ব্বিসহ বিড়ম্বন;
অনুগ্রহ নাহি মাগি ন্যায্য স্বত্বের লাগি
যাইব না পরদ্বারে থাকিতে জীবন;
আপন শক্তির'পরে সবাই নির্ভর করে
দাঁড়াব নির্ভয়ে এবে করিয়াছি পণ।
এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ।

৪

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ;
এবার দেখিবে বঙ্গে মহোল্লাসে মহারঙ্গে
নব দৃশ্য, যাহা কেহ দেখেনি কখন।
অতৃপ্তি অনলশিখা সর্ব্বত্র দিয়েছে দেখা
আসিয়াছে সুপ্তবঙ্গে মহা জাগরণ;
খুলে গেছে মোহপাশ নাহি আর ভয়ত্রাস
সবারি হৃদয়ে এক প্রতিজ্ঞা ভীষণ;
আত্মশক্তি প্রকাশিতে সবাই সুদৃঢ় চিত্তে
করিতেছে প্রাণপণে সতত যতন;

কঠোর সাধনা বলে এবার মস্তক তুলে
উঠিবে বাঙ্গালী জাতি কাঁপায়ে গগন !
এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

পুরাণ শাস্ত্র হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস না হইলেও ইহা যে আর্য্যদিগের অতি গৌরবের সম্পত্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে পুরাণ-পাঠ পুরাণ-শ্রবণ, উপযুক্ত পণ্ডিতদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা, এবং "কথক" দ্বারা দেশীয় ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া ও তদুপলক্ষে সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়, দীন-দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র ও অর্থাদি দান চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণ যদিও কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মের অধোগতি হেতু পুরাণপাঠাদি কার্য্য দিন দিন লোপ পাইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা একদা বিলুপ্ত হয় নাই।

যদিও এক্ষণ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ পৌরাণিক বিষয়গুলিকে "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে পুরাণ পাঠ করিয়া তাহার গূঢ় অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে অজ্ঞানান্ধেরও জ্ঞানোদয় হয়।

পুরাণোক্ত বিষয় মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতান্তর্গত "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাই" হিন্দুজাতির প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যেও অনেকে গভীর জ্ঞানপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ মধ্যে গীতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও হিন্দুসমাজে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যও (শ্রীশ্রীচণ্ডী) কম আদরের গ্রন্থ নহে।

হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে যেমন গীতা পঠিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শারদীয়া মহাপূজাদিতে এবং নানাবিধ, উৎপাতিক ঘটনা—গ্রহবৈগুণ্য ও রোগোপশমনার্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে চণ্ডীও পঠিত হইয়া থাকে।

কার্য্য বিশেষে কেহ একাবৃত্তি হইতে শতাবৃত্তি—সহস্রাবৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠ করাইয়া থাকেন। জগতে বোধ হয় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য এবং চণ্ডী পাঠের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত নহেন।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সংখ্যক ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে "গীতা" ও "চণ্ডী" হিন্দুর নিকট এত আদরের সামগ্রী হইল কেন, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় সৈন্যদল মধ্যে পিতামহ, মাতুল, ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—

"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ॥
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ধনানিচ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈবচ পিতামহাঃ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি, ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই বা কি ফল? সুখভোগ ও জীবন-ধারণেই বা কি ফল? কেন না যাহাদিগের জন্য রাজ্যভোগ সুখাদির কামনা করা যায়, তাঁহারাই প্রাণ ও ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। হে মধুসূদন! আচার্য্য পিতামহ মাতুলাদি আত্মীয়গণ যদি আমাদিগকে বধও করেন, তথাপি আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিগ্ন মানসঃ॥

অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত-চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। এবং—

"ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূবহ।"

"আমি যুদ্ধ করিব না" শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কৃপাপরবশ ও রণবিমুখ দেখিয়া—

"ক্লৈব্যমাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

হে পার্থ! তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, এরূপ ক্ষুদ্র জনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য তোমাকে শোভা পায় না, হে পরন্তপ! তুমি দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ

গাত্রোত্থান কর। ইত্যাদি উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে এবং—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বগত স্থান অচল এবং অনাদি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন।

"ইহাই গীতার বর্ণনীয় বিষয়"।

আর,—

চিত্রবংশোদ্ভব সুরথ নামক জনৈক প্রজাবৎসল নরপতি দুর্জ্জয় শত্রুকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, এবং বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একাকী অশ্বারোহণে বনগমন করেন। এবং কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর মেধস ঋষির আশ্রমে যাইয়া ঋষিবরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অনন্তর এ আশ্রমে পুত্র দারাদিকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত ও বিতাড়িত সমাধি নামক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং একে অন্যের পরিচয় পাইলে সমদুঃখ প্রযুক্ত উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়া মেধস্ ঋষির নিকট গমন করেন।

অনন্তর রাজা সুরথ, মেধস্ ঋষিকে প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যে দুষ্ট অমাত্যগণকর্ত্তৃক আমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে আগমন করিয়াছি, তাহারা কে কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে কেন? এবং এই বৈশ্যই বা কেন পুত্রকলত্রাদি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের কুশলাকুশলাত্মক তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেছে? আমরা জ্ঞানবান্ হইয়াও কেন মূর্খের কার্য্য করিতেছি?

মেধস্ ঋষি কহিলেন,—রাজন্! এ সমস্তই মোহের কার্য্য। মোহ বশতঃই প্রাণিগণ মায়ার অধীন হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকে। "মহামায়ার প্রভাবেই প্রাণিগণ মমতারূপ মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়।"

তখন সুরথ বলিলেন,—"ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥ যৎ স্বভাবাচ সা দেবী যৎ স্বরূপা যদুদ্ভবা, তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্ত ব্রহ্মবিদাম্বর॥"

হে ভগবন্! আপনি যে মহামায়ার কথা বলিলেন, তিনি কে? তাঁহার স্বরূপ কি? কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইল? তাঁহার কর্ম্মই-বা কি? তত্তাবৎ

আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, দয়াপূর্ব্বক তাহা বিস্তারিতরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

অনন্তর মেধস্ ঋষি, সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্যের নিকট মহামায়ার উৎপত্তি, তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহার (মধু কৈটভ মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ আদি বিনাশরূপ) কার্য্য বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। ইহাই চণ্ডীর মূল বিষয়।

কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি বলেন,—"গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতামহাদি জ্ঞাতি-বন্ধুহত্যারূপ মহাপাতক হইতে বিরত হইয়া অর্জ্জুন যখন যুদ্ধস্থলে অস্ত্রত্যাগ করিলেন, তখন কুটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ নানারূপ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের আবরণে স্বার্থ লুক্কায়িত রাখিয়া বাক্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন—ইহাই গীতার মূল তাৎপর্য্য। যে লোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধে ভারত বীরহীন এবং আর্য্যজাতির গৌরবরবি চির অস্তমিত হয়; সেই যুদ্ধপ্রবর্ত্তক কপটধর্ম্মময়বাক্যাবলীকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়া হিন্দুগণ কেন যে এত আদর করেন তাহার কারণ বুঝা যায় না।"

আবার চণ্ডী সম্বন্ধেও অনেকে বলেন যে, "অসভ্যযুগে মধুকৈটভের সহিত বিষ্ণুর বর্ব্বরোচিত বাহুযুদ্ধ, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের মল্লযুদ্ধ, উলঙ্গিনীবেশে রণস্থলে রমণী! তাণ্ডব নৃত্য, শোণিত পান, হস্তী-অশ্ব-নরের আম-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি পৈশাচিক ব্যাপার লইয়া মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সেই গল্পমূলক চণ্ডী কেন যে হিন্দুগণের নানারূপ ধর্ম্মকার্য্যে ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে পঠিত হয়, ইহারও কারণ বুঝা যায় না।

সাহিত্য-জগতের অত্যুজ্জ্বলরত্ন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"সংস্কৃত-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র 'ঝুনা নারিকেল'; যে ইহার ছোবড়ার উপর কামড় দেয় তাহার মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ অস্ত্রদ্বারা ছোবড়া ছাড়াইয়া খুলি ভগ্ন করিতে পারে, সে তাহার সুশীতল জলপানে স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট শস্য ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সারবান উপমাটি অতীব সুসঙ্গত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর মহদুদ্দেশ্য যাহারা মসীবর্ণে কলঙ্কিত করিয়া গৌরব অনুভব করেন, তাহারা সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া যে কেবল ছোবড়াই কামড়াইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নচেৎ সমস্ত আর্য্যসমাজ যে গীতাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের সার মনে করেন, কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি

যে তাহাকে অসার প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হয়, ইহা কি তাহাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় নহে?

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দন।
পার্থ বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

বেদের সারস্বরূপ উপনিষদ সমূহ গাভী, অর্জ্জুন বৎস, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অমৃতোপমগীতা দুগ্ধ, এবং সুধীগণ তাহার ভোক্তা।

"সারথ্যমর্জ্জুনস্যা দৌ কুর্ব্বন গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥"

অর্জ্জুনের সারথ্য কার্য্যব্যপদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের হিতের জন্য অর্জ্জুনকে গীতারূপ অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণাত্মক সেই গীতাকে নমস্কার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাই গীতার উদ্দেশ্য নহে। ত্রিলোকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান বাসুদেব ধর্ম্মশাস্ত্রার্ণব মন্থন করিয়া গীতারূপ অমৃত অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার বহু টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা ইংরাজী হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। গীতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ এ পর্য্যন্ত নানারূপ আন্দোলন আলোচনারও ত্রুটী হয় নাই। এমন কি গীতা যে ধর্ম্মজগতের সর্ব্বোত্তম উজ্জ্বল রত্ন, অনেকে ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং গীতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করিব।

গীতার মূলশিক্ষনীয় বিষয় "নিষ্কাম কর্ম্মযোগ" এবং "অদ্বৈতবাদ"। যথা—"অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীং॥" কিন্তু গীতা অদ্বৈতবাদী হইলেও সাকার উপাসনার বিরোধী নহে। তাই বলিয়া গীতাকে কেহ যেন পুতুল-পূজকের রচিত গ্রন্থ মনে না করেন। গীতা যেমন সাকারবাদীর আদরের বস্তু, তদ্রূপ নিরাকার উপাসকেরও পরম ধন। গীতা নিষ্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মের উপদেষ্টা, আবার কর্ম্মযোগীরও গুরু।

গীতার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ মত এই যে, "সাধক সংসারের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি সম্পাদন করিয়াও নির্লিপ্ত সংসার-বিরাগী বা জীবন্মুক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।" এই জন্যই গীতার এত গৌরব।

গীতা যদিও হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ, তথাপি প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়—গীতা কোন জাতি বিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে। গীতা জগতের "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মোপদেষ্টা;" গীতা প্রকৃতই পরমপুরুষ

ভগবানের উপদেশ বাক্য। মনুষ্য কখনও এরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত, সর্ব্বজন পূজনীয় অভ্রান্ত-তত্ত্বের উপদেশক হইতে পারে না।

পরস্পর বিরোধী শাস্ত্রসমূহের সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সাংখ্যের জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি বিভিন্নমতের অপূর্ব্ব সম্মিলন এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সুমীমাংসা একমাত্র গীতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যাহা পাইতে বা যে যে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, সে সমস্তেরই অভ্রান্ত উপদেশ গীতাতে আছে।

কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত ধর্ম্মগ্রন্থের সহায়তায় গুরূপদেশ ভিন্নও অনেকে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও বুঝিতে অসমর্থ, দুঃখের বিষয় কোন কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি সেই সমস্ত দুর্ব্বোধ বিষয়ের অনুবাদের কিয়দংশ পাঠ করিয়া বেদকে "চাষার গান" গীতাকে "কূটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের চাতুর্য্যময় বাক্য," চণ্ডীকে মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প" এবং যাহা তাঁহাদের মত বিরুদ্ধ তাহা "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া নির্লজ্জভাবে এই সমস্ত গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থের অসারতা প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি সূত বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণো-জানাতি বৈসম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তি সুতঃ ফলং ব্যাসো বা ব্যাস পুত্রোবা যাজ্ঞবল্ক্যোথ মৈথিলঃ।"

গীতার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণমাত্র সম্যক্‌রূপ জ্ঞাত আছেন, কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ জানেন, মহর্ষি ব্যাস, জীবন্মুক্ত শুকদেব, ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য এবং রাজর্ষি জনকও কিঞ্চিৎ অবগত আছেন।

যে গীতা সম্বন্ধে মহর্ষি সূত এইরূপ উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই গীতা কূটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের স্বার্থমূলক কৌশলপূর্ণ বাক্‌জাল বলিয়া সমালোচিত হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যাহা হউক এ সকল বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কতদূর সম্বন্ধ, এবং কি জন্য হিন্দুসমাজে গীতা ও চণ্ডীর এত আদর তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য। অতএব গীতা ও চণ্ডীর তাৎপর্য্যার্থের আংশিক আলোচনা করিয়া উভয় গ্রন্থের পরস্পর সাদৃশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাধারণভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, "গীতা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধাশ্রিত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ"। আর চণ্ডী, মেধস্ ঋষির সহিত সুরথ ও সমাধি সংবাদমূলক দেবাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণন। গীতা ও চণ্ডীর বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও উভয়ের ভাবগত সাদৃশ্য অল্প নহে এবং উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রায় একরূপ। গীতাতে যে যে বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; চণ্ডীতে সেই সেই বিষয় অভিনীত হইয়াছে।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে গীতার উৎপত্তি, সুতরাং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মূল তাৎপর্য্য কি, অগ্রে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, শ্রাদ্ধকালে পঠিত হয়,—

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমস্কন্দোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্যশাখা, মাদ্রিসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণশ্চ।"

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমস্কন্দঃ কর্ণঃ শকুনী স্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধ মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী।"

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষস্বরূপ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, মহাবীর ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল, এবং সেই ধর্ম্মময় মহাদ্রুমের সমৃদ্ধির মূল কৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ।

আর দুর্য্যোধন অহঙ্কারময় মহাবৃক্ষস্বরূপ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনী তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার পুষ্প ও ফল; এবং সেই অহঙ্কারময় মহাবৃক্ষের সমৃদ্ধির মূল প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

তাৎপর্য্য এই,—এক পক্ষে ধর্ম্ম, অপর পক্ষে অহঙ্কার বা অধর্ম্ম; এক পক্ষে দৈববল বা অদৃষ্টবল, অপর পক্ষে পুরুষকার বা বাহুবল; সুতরাং ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের যুদ্ধ, বা দৈবশক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধ।

দৈব শক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধে প্রথমতঃ পুরুষকারের জয়। তৎপর অহঙ্কারাতিশয্যে অধর্ম্মের উৎপত্তি। অনন্তর ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের যুদ্ধ, সুতরাং অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন, দুষ্টের দমন এবং সাধুর পরিত্রাণ জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, বা মানবদেহ ধারণ। ইহাই গীতার একটী প্রধান কথা। যথা—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

হে ভারত! যে যে সময় ধর্ম্মের পীড়ন ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি দেহধারণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

অতঃপর গীতার সহিত চণ্ডীর কতদূর সম্বন্ধ তাহাই আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

নূতন।

চৈত্র-বৈশাখী নিশি পোহায় পোহায়
জাগো ওগো জাগো বঙ্গবাসি,
ভারতের পুণ্যময় রম্য উপকূলে
স্বর্ণতরী আসিয়াছে ভাসি।

সুদূরের হোম-গন্ধ প্রভাতী পবনে
রহি রহি আসিতেছে আজ,
ঋত্বিকের বেদমন্ত্র জেগেছে আবার
শ্যামস্নিগ্ধ তপোবন মাঝ।

হে নূতন হে বাঞ্ছিত, এসো আজ এসো
সার্থক হউক আবাহন;
পুরাতন অবসাদ দৈন্য-হিংসা-দ্বেষ
হোমানলে করেছি ইন্ধন!

স্বার্থ অসুরের রক্তে পূর্ণাহুতি দিয়া
হে সুন্দর ওহে অভিনব,
পবিত্র শান্তির ফোঁটা পরায়ে ললাটে
তোমারে বরণ করি লব।

এসো এসো চির-প্রিয়, মঙ্গল উষায়
সার্থক হউক আবাহন;
সঞ্জীবনী স্পর্শে তব ভারত-সন্তান
লভুক নবীন জাগরণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পূজার ফুল।

(বাউল সুর)

আমি জয় বঙ্গভূমি, স্বর্গ তুমি, তোমার সমান আর কে আছে ?
কে সুধায় আমায় ক্ষুধার কালে, সুধা তুলে মুখের কাছে।
তোমার জলে সুধা, স্থলে সুধা, ফলে সুধা গাছে গাছে॥
এমন ষড় ঋতু সুখের হেতু ফিরে কাহার পাছে পাছে।
(ওগো) নিত্যি নূতন, মনের মতন, কত রতন লয়ে যাচে॥
আকাশ কার সুনীল কেশে হেসে হেসে তারা-হীরায় সিঁথি রচে।
এমন ইন্দ্রধনুর মুকুট মাগো কবে কেবা পরিয়াছে॥
তোমার সরোবরে হংস চরে তরু'পরে ময়ূর নাচে।
(ওগো) আকুল করে কোকিল শ্যামা, ফুলের লহর বহে গাছে॥
তুমি অনুপমা বিশ্বরমা গড়া বিধির মনের ছাঁচে।
মা তোর মরণহরা চরণ-ছায়ায় শরণ নিলে পরাণ বাঁচে॥
(মাগো) আঁখি থাকতে দেখে না কেউ মণি ফেলে মজে কাচে।
আপন পরমায়ে নাইকো রুচি, পরের কাছে পরমা যাচে॥

ক্ষেপা বাউল।

প্রাণেশচন্দ্র।

(৬)

তিনটা বাজিয়া গেল, নৌকা আসিল না; শশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মাঘের দিন; সন্ধ্যার আর বিলম্ব কত? নৌকা না আসিলে রাত্রে এই দোকানগৃহে অপেক্ষা করিতে হইবে। সঙ্গে তাঁহার কন্যা, কন্যার মাশী ও সদঃ পরিচিত প্রাণেশচন্দ্র।

দোকানগৃহে অনেক লোক আসিতেছে, যাইতেছে, অনেক লোক রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতেছে। দিনে প্রদীপ জ্বালিলে পতঙ্গ আসে কি না দেখি নাই, কিন্তু অনেক যুবক-পতঙ্গ এই দোকানগৃহে আসিয়া বসিতেছে। বালিকা কি মুহূর্ত্ত বসিয়াছিল, এখন সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাশীর আড়ালে শুইয়া আছে। যে পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল, সে পা-খানি অনাচ্ছাদিত।

ছোট পা, সুন্দর পা, আলতা ব্যতীত আরক্তিম পা, বেদনায় আরও আরক্তিম হইয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র অনিমেষে ঐ চরণ নিরীক্ষণ করিতেছে।

প্রাণেশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। কিন্তু শবচ্ছেদের বিপত্তি সে সহ্য করিয়া উঠিতে পারে নাই। পুনরায় আসিয়া এম-এ পরীক্ষায় মন দিয়াছে। কাটিতে ছিঁড়িতে তাহার ভয় ছিল না, কাটা ছেঁড়ায় প্রাণেশের বরং উৎসাহই ছিল। কিন্তু দুর্গন্ধ তাহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে তাড়াইয়াছে। প্রাণেশ দেখিল, বালিকার পা ফুলিয়াছে, বুঝিল—উহাতে পুঁজ হইয়াছে, কাঁটা ভিতরে থাকিলে যদি এখন তাহা বাহির করা না যায় তবে ভীষণ যাতনা হইতে পারে, ক্ষত সাঙ্ঘাতিক হওয়াও বিচিত্র নহে।

প্রাণেশ চন্দ্র কি ভাবিয়া ট্রাঙ্কটী খুলিল, একবার এ কোণে একবার সে কোণে তল্লাশ করিল, উঠিয়া আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিল, "আর বেলা নাই, নৌকা আসিলে আপনারা রাত্রি সম্মুখে করিয়া যাইবেন কি? আমি চলিয়া যাইব ভাবিতেছি। একটা কথা এই, বলিয়া যাইতেছি—আপনার মেয়ের পা যেরূপ ফুলিয়াছে, উহাতে যেরূপ পুঁজ হইয়াছে, উহা এখনই কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। সম্ভবতঃ এই কারণেই খুব জ্বর হইয়াছে।

শশীধর। চলিয়া যাইবেন—ইহাও কি হয়, আমাদের বাড়ীতে আপনাকে যাইতেই হইবে।

পিতা মেয়ের কপালে হাত দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, খুব জ্বর-ত হইয়াছে; এখন কি করা যায়?

প্রাণেশ। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে পুঁজ বাহির ক'রে দেওয়া যাইতে পারে; যুগ—এই সুযোগ—আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।

শশীধর অনুমতি দিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেয়ের মাসীকে নেকড়া লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া প্রাণেশ ট্রাঙ্ক হইতে অস্ত্র খুলিল, অতি সাবধানে অগ্রসর হইয়া অতি সাবধানে ঐ সুন্দর পা খানি ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র পলকে স্ফীত স্থানে বসাইয়া দিল। মেয়েটী জাগিয়া দেখিল—বাবা ও মাসী শুশ্রূষা করিতেছেন—সম্মুখে প্রাণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া। বালিকা উঠিয়া বসিয়াছিল, লজ্জিত হইয়া আবার শুইল।

নৌকা আসিল না—সন্ধ্যা হইয়া গেল; নৌকা তখনও আসিল না। তাঁহারা দোকান গৃহে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ভাগ্যকুল বড় বন্দর হইলেও নিরাপদ নহে—দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্যের ভয় যথেষ্ট। প্রাণেশচন্দ্র সাহস দিল—সে জাগিয়া থাকিবে।

বালিকার জ্বর অনেক কমিয়া গেল। মাসী আহার করিলেন না, বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণেশ অল্প আহার করিয়া আসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন।

শীতের রাত্রি ফুরায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রাণেশচন্দ্র জাগিয়া রহিল। অর্দ্ধ-রাত্রির পর চন্দ্র উঠিয়াছে। বিশাল পদ্মার বিস্তৃত বক্ষে চন্দ্রালোক নৃত্য করিতেছে—দোকান গৃহ হইতে এই সুন্দর দৃশ্য দেখা যাইতেছিল। প্রাণেশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জাগাইয়া, তাঁহাকে জাগিয়া থাকিতে বলিয়া, পদ্মাতীরে আসিয়া বসিল। জল-বাতাস—কিন্তু তাহার শীত-বোধ নাই। বামে একখানি ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্ন অংশ অন্ধকারময় হইয়া রহিয়াছে, দক্ষিণে একটী উন্মূলিত খর্জ্জুরবৃক্ষ জলস্রোতে হেলিয়া পড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র এই জ্যোৎস্নালোকে এই পদ্মাতীরে ভগ্ন-বিনাশের লীলাস্থলে বসিয়া উচ্চ গলায় গাইতে লাগিল—

এস গো ভক্তি গঙ্গা
ভগবৎ পদ কমল হ'তে
হৃদয় মরু মাঝারে,
রজত-শুভ্র-পুণ্য-হিল্লোল বাহিনি।

এই ভক্তি-সঙ্গীতটী মুক্তি তাহার নিকট শুনিতে বড় ভালবাসিত—কতদিন মুক্তি ছাতে বসিয়া এমনি চন্দ্রালোকে মুগ্ধনেত্রে প্রাণেশের দিকে চাহিয়া এই সঙ্গীত শুনিয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে প্রাণেশের সেই মুক্তির কথা মনে পড়িল, সে দেখিতে লাগিল—চন্দ্রকরোজ্জ্বল পদ্মার প্রতি তরঙ্গে মুক্তির সেই মুখখানি নৃত্য করিতেছে। এই নৃত্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সুমিষ্ট তান উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে উঠিল। প্রাণেশের স্বর অতি মধুর বোধ হইতে লাগিল, যেন পদ্মার সফেন তরঙ্গ, কুর্ণিশ করিতে করিতে এই স্বর শুনিবার জন্য তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রাণেশ সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া আরও দেখিল মুক্তির পার্শ্বে আর একখানি মুখ—সদাঃ পরিচিত, সলজ্জ—অতি সুন্দর, অতি মধুর।

প্রাণেশের সঙ্গীত সহসা থামিয়া গেল—সে অতি দ্রুত দোকান ঘরে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—বন্দ্যোপাধ্যায় নাই, তাঁহার মেয়ে নাই, মেয়ের মাসী নাই—তাহার ট্রাঙ্কটী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

---

(৭)

প্রাণেশচন্দ্রের পলায়নের সংবাদ শুনিয়া এবং তাহার পত্র পড়িয়া মুক্তি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পড়িতে যায় পড়া হয় না; সেলাই করিতে ছুঁচ আঙ্গুলে ফোটে; স্কুলে পড়া বলিতে ভুল হয়। একটা পোষা পাখী উড়িয়া গেলে যেমন হয় তেমন হইয়াছে। কেন গেল, কোথায় গেল—মা, বাপ, দাদা ম'শায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন সদুত্তর পাইল না তখন সে একখানি পত্র লিখিল, কিন্তু ঠিকানা কি ?

বেলা প্রাতে নয়টা; মুক্তি তাহার পোষা বিড়াল-ছানাটী কোলে ধরিয়া বুকে চাপিয়া তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"বল্, প্রাণেশ দাদা চ'লে গেল কেন"। চাপ যখন অসহ্য তখন ছানাটী হাত হিচড়িয়া দিল, মুক্তি রাগ করিয়া ছানাটীকে দূরে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত বিড়াল-শিশু যখন মিঁউ মিঁউ করিতেছিল তখন মস্ত দাদা ম'শায়, তাঁর মস্ত কোট লইয়া, মস্ত পকেট লইয়া, মস্ত জুতা পায়, মস্ত লাঠি হাতে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"ওর উপর এ উপদ্রব কেন ?

মুক্তি। ও বল্‌তে পার্‌লে না কেন, প্রাণেশ দাদা কোথায় গেল।

দাদা ম'শায়। বেড়াল কি যোগী যে বলে দিতে পার্‌বে ?

মুক্তি। আচ্ছা বেড়াল যেন যোগী নয়। আপনি-ত একজন সব খবর রাখেন, বলুন্ না, প্রাণেশ দাদা কোথায় গেল।

দাদা ম'শায়। তা দিয়ে কি হবে ?

মুক্তি। একখানা পত্র লিখেছি, ঠিকানা পাচ্ছি না।

দাদা ম'শায়। প্রাণেশ কি লিখে গেছে, দেখাবে ?

মুক্তি। আপনি ঠিকানা ব'লে দিবেন ?

দাদা ম'শায়। ঠিকানা ক'রে দিব।

মুক্তি ঠিকানা পাইবার ভরসায় পত্রখানি আনিয়া দিল।

স্নেহের মুক্তি,

হঠাৎ চলে যেতেছি, কিছু ব'লে যেতে পারলাম না। কষ্ট পাবে, কষ্ট ভুলে যেও। আর কখনও দেখা হবে কি না জানি না। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প রাখিতে পারে না, সে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবার অযোগ্য। তোমার জন্য অনেক করিব, অনেক খাটিব ভাবিয়াছিলাম, তা হলো না। তোমাদের নিকট বা

পেয়েছি তার জন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকুন। তোমার মা-বাপকে আমার প্রণাম জানাইবে। যদি কখনও তোমাকে পত্র লিখিতে লিখি খুব বড় পত্র লিখিও। তবে এখন যাই। ইতি— শ্রীপ্রাণেশ—

দাদা ম'শায় দু'বার পত্রখানি পড়িলেন। কোমল-হৃদয় দাদা ম'শায়ের চোকে জল দেখা দিল।

মুক্তি। এখন বলুন ঠিকানা!

দাদা ম'শায়। আমি-ত বল্‌বো বলি নি, ঠিকানা ক'রে দিব বলেছি।

মুক্তি। আচ্ছা ক'রেই দিবেন, দিবেন-তো?

দাদা ম'শায়। তুমি কি লিখেছ, দেখাবে?

মুক্তি। পত্র দেখাই আর আপনি তখন বল্‌বেন—"আমি তো বলেছি, ঠিক্ না-করে দিব, বলেছি।"

দাদা ম'শায়। খুব-ত জব্দ করেছিস্। বল্‌ছি ঠিকানা ক'রে দিব।

মুক্তি। ঠিকানা ব'লে দিন্ আর না দিন্, পত্র দেখাচ্ছি, দেখুন।

মুক্তি পত্র আনিয়া দিল।

শ্রীচরণ কমলেষু—

দাদা! চলে গেলেন, এমন ক'রে চলে গেলেন, আমাকে একটু ব'লেও গেলেন না। আমি কত কষ্ট পাব তা আপনি একটুও ভাবেন নি। ভাবিলে আপনার ছোট বোন্‌টীর প্রতি এরূপ ব্যবহার কর্‌তেন না। আমি কার কাছে এখন পড়্‌বো? Pilgrim's Progress আর পড়া হবে না। আমি কার সঙ্গে তেমন আবদার কর্‌বো? আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। "অযোগ্য" কথাটা লিখ্‌লেন কেন? একবার পারেন নি, আবার পারবেন। আমি আপনাকে কি বল্‌তে পারি? আমার লক্ষ অনুরোধ, আপনার পায় পড়ি, আপনি আমার সব আবদার রাখেন, শীঘ্র আসিবেন।

আপনার স্নেহের ছোট বোন্
মুক্তি।

দাদা ম'শায় পত্রখানি একবারের অধিক পড়িলেন না, পড়িতে পারিলেন না, তাঁহার চোকের জল এবার গড়াইয়া পড়িল। বালিকার চিত্ত তিনি বুঝিলেন, বলিলেন—"আমি ঠিকানা ক'রে দিব, পত্র আমার কাছে থা'ক্।"

এই বলিয়া দাদা ম'শায় তার মস্ত পকেট হইতে কয়লা, কুল, তেঁতুল টেবিলের উপর সাজাইলেন। অপর্য্যাপ্ত। দাদা ম'শায় চির কুমার—এই

অপর্য্যাপ্ত দানে হিংসা করিবার জন্য তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহ নাই। বালক বালিকাই তাঁর সব। তিনি নিত্য সব দিয়া নিত্য সন্ন্যাসী, তিনি নিত্য সব সংগ্রহ করিয়া নিত্য সংসারী।

মুক্তি। দাদা ম'শায় আমার এখন কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না; এসব আর কাউকে দেবেন।

দাদা ম'শায়। এ গুলি তুমি না লইলে আমার যে ভাল লাগ্‌বে না। আমার ভাল লাগ্‌ছে না,—তাই কি তুমি ভাল বাস্‌বে।

মুক্তি। না, কখনো না। সব নিচ্ছি। তেঁতুল আগে, নুণ এনেছেন-তো?

দাদা ম'শায় পকেট হইতে এক শিশি নুণ বাহির করিয়া মুক্তির হাতে দিলেন, বলিলেন, "এখন জিব-তালুতে টক্ শব্দ তোল। এই টক্ শব্দ থেকেই "টক্" কথাটা হ'য়ে থাক্‌বে। বসন্ত, সাহানা সব রাগ-রাগিণী যোগ কর্‌লেও তোদের মুখে একটা টক্ শব্দের তুল্য মিষ্ট হয় না।"

মুক্তি। আপনার যে কথা!

মুক্তি তেঁতুল খাইতে খাইতে, টক্ টক্ শব্দ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দাদা ম'শায়। এখন ভাল লাগ্‌ছে তো?

মুক্তি আবার বর্ষণ বিমুখ ঘন মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল।

দাদা ম'শায়। অমন গম্ভীর হ'য়ে থাক্‌লে আমার কান্না পায়। ঠিকানা ক'রে দিলেই তো হলো।

মুক্তি। কবে দিবেন?

দাদা ম'শায়। দিন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

মুক্তি। ঐ তো আপনার দোষ; তবে আমি চল্লেম।

দাদা ম'শায়। দাঁড়া, এই নে ঠিকানার অর্দ্ধেক।

তিনি একখানি কার্ড বাহির করিয়া দিলেন। লেখা—"প্রাণেশবাবু ভাগ্যকুল নামিয়াছেন, সঙ্গে একটী ব্রাহ্মণ, একটী স্ত্রীলোক বিধবা, ও একটী কন্যা পরমাসুন্দরী।"

মুক্তি। এ কি?

মুক্তি দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। দাদা ম'শায়ের পুনঃ পুনঃ ডাকেও আর ফিরিল না। দাদা ম'শায় ব্রজেন্দ্রবাবুকে কার্ডখানি দেখাইয়া, কি পরামর্শ করিয়া, চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

নেতৃগণের কর্ত্তব্য।

কর্জ্জনের গর্জ্জনে নিদ্রিত বাঙ্গালী জাগিয়া বসিয়াছিল ; ফুলারের 'ফুলারের' জ্বালাময় স্পর্শে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে নেতৃগণের প্রদর্শিত পথে তাহারা দলবান্ধিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশে সুবাতাস বহিতেছে সন্দেহ নাই। বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া নৌকার কর্ণ ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই নাবিকের কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না ; নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া গাছ-পাথর অতিক্রম করিয়া, উত্তাল তরঙ্গমালার ভিতর দিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে নৌকা লইয়া যাইতে হয়, সুতরাং তাহাকে চারিদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হয়—নৌকার পুরাতন ছিদ্রপথে জল প্রবিষ্ট হইলে কৌশলে সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। সুবাতাসে বাঙ্গালা দেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে নেতৃগণ পাল তুলিয়া হালধরিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের সতর্ক চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে কিন্তু পুরাতন ছিদ্রপথে যে, জল ঢুকিয়া পড়িল সেদিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। আর কতকদিন এ ভাবে চলিলে "ডুব্‌বে তরী খান" আমাদের "ডুব্‌বে তরী খান"।

বাহিরের শত্রু অপেক্ষা ভিতরের শত্রু হইতে ভয় বেশী। বনের সাপ ঘরে ঢুকিবে তারপর কামড় দিবে—সহজ কথা নয় ; কিন্তু শয্যাতল হইতে সর্প উঠিয়া দংশন করিলে উপায় নাই। অমিত বলশালী ইংরাজ ন্যায়ের সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালীর একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, ইহাতে আমরা ভীত নই কিন্তু বঙ্গজননীর কোলের ছেলে গোল বাঁধাইয়া তুলিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। যে হিংসানলে যে আজীবন পুড়িয়া মরিলাম, আবার সেই বিষ—আবার সেই দলাদলি, মারামারি! মা জগত্তারিণি! বাঙ্গলা দেশকে রক্ষা কর।

বাঙ্গালী চিরকালই দলাদলি-প্রিয়। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীশিশু ক্রীড়াক্ষেত্রে দল গড়িতে আরম্ভ করে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের শতকাজে সে কেবল গড়িতেই রহে। মুনি অষ্টাবক্র মাতৃগর্ভে থাকিয়া সমগ্রই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—অবস্থা দৃষ্টে বলিতে ইচ্ছা হয়, বাঙ্গালী-শিশুও দলাদলি তন্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। মায়ের আহ্বানে মায়ের ভবনে সন্তান ফিরিয়া আসিবে, মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে, ইহার মধ্যেও হিংসা-দ্বেষ, ইহার মধ্যেও দলাদলি! হায়রে দুর্ভাগ্য জাতি!

মত-বিভিন্নতায় বাঙ্গালীর নেতৃগণ স্বদেশী আন্দোলনে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয় দলের উদ্দেশ্য এক কিন্তু বিরোধ কার্য্যপ্রণালী নিয়া। বিধাতার সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। এখানে একটীর মত আর একটী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে সাম্যের আশা একবারে নাই বলিলেও চলে। মতবিরোধ সর্ব্বত্রই আছে ও থাকিবে। যদি ন্যায় ও শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, যদি সরলভাবে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লড়াই চলে তবে ক্ষতি নাই; বরং সত্য আবিষ্কারের জন্য এরূপ লড়াইর আবশ্যকতা আছে। মাঠে মল্লদ্বয় শান্তভাবে পরস্পরের বল পরীক্ষা করুক—তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই সূত্রে যদি এক দলের লোক অন্য দলের আখ্‌ড়া লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে আরম্ভ করে তবে প্রাণঘাতী মহাসমর অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের মুক্তমাঠে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটা মত যখন বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল আমরা তখন সোৎসুকচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম অনতিবিলম্বেই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে অথবা ইহার একটা সুখ-সমাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু যে দেশ দলাদলির চির লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে দেশের লোক হিংসা-বিদ্বেষের বিষ-ছুরিকা পরস্পরের বক্ষে বিদ্ধ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে অনুক্ষণ ব্যাপৃত, যে দেশের লোক অপরের উন্নতিকে স্বীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করে, সে দেশে মতবিরোধ সহজে মীমাংসিত হইতে পারে না। তাই আজ বঙ্গব্যাপী এক সর্ব্বনাশকর মহাসমরের আয়োজন দেখিতেছি।

আমরা নেতৃগণের কাহারও নিন্দা করিব না। তাঁহারা সকলেই অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ এবং জ্ঞানবান্ পুরুষ। সকলেই স্বদেশ-উন্নতির মহামন্ত্রে দীক্ষিত এবং স্বদেশের কল্যাণব্রতে নিয়োজিত। আমরা জানি, দোষ সন্ন্যাসীর নয়, দোষ চেলার; অত্যাচার সেনাপতির নয়, অত্যাচার সেনার। কোন কোন নেতার পৃষ্ঠচররূপে এমন দুই একটী লোক অবস্থান করিতেছেন যাঁহারা আজন্ম কেবল হিংসা-দ্বেষেরই অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছেন এবং নিন্দাকে বৈরনির্য্যাতনের অমোঘাস্ত্র নিরূপণ করিয়া তদ্দ্বারা তূণ পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। ইহাদের কালাকাল পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, সুযোগ পাইলেই শরসন্ধান করিতেছেন। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গবিভাগ নিষ্ফল হইয়াছে কিন্তু এই শ্রেণীর কালাপাহাড় হইতে বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথর সাহায্যে আমরা অন্ত পরস্পরবিরুদ্ধ মত দুইটীর ভালমন্দ বিচার করিতে চাই না; সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, উভয় মতের বিশেষ বিশেষ অংশের একীকরণে একটা সর্ব্ববাদী সম্মত অভিনব মত সৃষ্ট হওয়ার একান্ত আবশ্যকতা আছে। এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু নরেও কাজ হইবে না, শুধু সিংহেও কাজ হইবে না; উভয়ের সংমিশ্রণে যে নরসিংহমূর্ত্তি গঠিত হইতে পারে তাহারই প্রয়োজন।

এখনও সময় আছে; দেশের নেতৃগণ কালাপাহাড় দমনে আপন আপন ব্যক্তিগত শক্তি নিয়োগ করুন। পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নপরায়ণ হউন; হিংসা-দ্বেষ বমন করিয়া ফেলুন, ওরূপ দূষিত জিনিস পেটে রাখিতে নাই; মান-অভিমানের কিরীট-কুণ্ডল চূর্ণ করিয়া ফেলুন, দরিদ্রের এ রাজবেশ কেন? সকলেই এক দুঃখিনী জননীর সন্তান—সকলই ব্রহ্মাত্মক জীব এই সাম্যমন্ত্র উচ্চারণ করুন। সকলে সারি বাঁধিয়া মাতৃপূজার "সারি" গাহিতেং সম্মুখদিকে অগ্রসর হউন—পর্ব্বত টলিবে, পাষাণ গলিবে।

সুভাষিতাবলী।

২২। পরের কটূক্তি যদি সহিতে না পার, তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর।

২৩। ক্রোধ, অজ্ঞানতা হইতে আরব্ধ হইয়া জ্ঞানোদয়ে পর্য্যবসিত হয়।

২৪। পুরোদ্বার দিয়া ক্রোধ প্রবেশ করিলে, পশ্চাদ্দ্বার দিয়া সদ্‌গুণাবলী পলায়ন করে।

২৫। কীর্ত্তি, ধর্ম্মের তুল্য-মূল্য নয়।* ধর্ম্মাপচয়ে প্রশংসালাভ—হীরক-বিনিময়ে কাচ গ্রহণের তুল্য।

২৬। উৎকট যশোলিপ্সু ব্যক্তি সতৃষ্ণনয়নে জনতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

২৭। যে আপনার বন্ধু আপনি নয়, সে কাহারও বন্ধু হইতে পারে না।

২৮। উৎকট যশোধর্ম্মাদিগের পারিপার্শ্বিকগণকে বিশ্বাস করা যায় না।

২৯। চাণক্য বলিয়াছেন—যিনি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে সহায় থাকেন, তিনিই বন্ধু।

৩০। এই জীবলোকে শারীরিক ও মানসিক এই দুই প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীর অসুস্থ হইলে মন, এবং মন অসুস্থ হইলে শরীর

পীড়িত হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে কেবল একটী দুঃখদ্বারা অপর একটী দুঃখ আকর্ষণ করিয়া দুইটী অনর্থ প্রাপ্ত হয়।

৩১। যেমন পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তি নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগের সমুদয় কার্য্য দর্শন করিতে পারেন, সেইরূপ জ্ঞান-প্রাসাদারূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞলোকদের সমস্ত কার্য্য অনুভব করিতে পারেন। তিনি মন্দমতি অজ্ঞলোকদিগকে শোকের অবিষয়ীভূতস্থলে শোক করিতে দেখিতে পান।

৩২। যাহাদ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের বোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। সেই বোধ-চক্ষুদ্বারা যিনি অজ্ঞাত-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্—তিনিই চক্ষুষ্মান্।

৩৩। আলস্যে দুঃখ ও দক্ষতায় সুখোদয় হয়। ঐশ্বর্য্য, শ্রী, কীর্ত্তি প্রভৃতি সম্পত্তি, নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন অলস ব্যক্তিতে কদাচ অবস্থিতি করে না।

৩৪। অভ্যুদয়-সময়ে লোকে মনে করে, আমি একজন অসামান্য মনুষ্য, আমি মহাকুল-প্রসূত, আমি যাহা মনে করি, তাহা করিতে পারি। এই তিন প্রকার অভিমানে লোকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়। এই পৃথিবীতে ধনী, নির্ধন, বলবান্, দুর্ব্বল, সুবোধ ও বুদ্ধিহীন সকলেই জরা-মৃত্যুর অধীন। যিনি পরাক্রম-প্রভাবে সাগরাম্বরা-ধরার অধীশ্বর হইতে পারেন, তিনিও জরা-মরণের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিমান করিবার অধিকার কাহারও নাই। ক্ষুদ্র বংশে জন্মিয়াও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তিও পতঙ্গবৎ প্রণষ্ট হয়।

৩৫। অদীন-ভাবে প্রিয়বাক্য বলিবে; শূর হইয়াও শ্লাঘা-বিহীন হইবে; দাতা হইয়াও অপাত্রে দান করিবে না। অস্তব্ধ হইয়া মানবগণের সৎকার করিবে

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

খোকার দপ্তর—শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। খোকার দপ্তর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। বঙ্গীয় শিশুসাহিত্যে এইরূপ

চিত্রসুন্দর রসমধুর পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যিনি শিশুচরিত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন এবং যিনি শিশুহৃদয়ের যথাযথ প্রতিকৃতি স্বীয় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন; শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তাঁহারই মাত্র অধিকার। মনোমোহন বাবুর সে অধিকার আছে। গ্রন্থকার শিশুদিগের রুচি অনুযায়ী বিবিধ বিষয়াবলম্বনে, এক একটী সরল ও সরস কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুনিপুণ চিত্রশিল্পী প্রিয়গোপাল মনোরম চিত্রসাহায্যে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মধুর কবিতা, মনোহর চিত্র ও পরিপাটী মুদ্রণ এই ত্রিবিধ সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে গ্রন্থখানা শিশুপাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'খোকার-দপ্তর' বঙ্গের খোকা-সম্প্রদায়কে সুস্বাদু মিঠাই-মণ্ডা অপেক্ষাও অধিক প্রলোভনে আকৃষ্ট করিবে।

সুখপাঠ — শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। গ্রন্থে রচয়িতার নাম নাই। না থাকুক, স্কুলপাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকারের যে ক্ষমতা আছে, 'সুখপাঠ' পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। গ্রন্থখানা গদ্য-পদ্যময়। শিক্ষোপযোগী বিবিধ বিষয়ের সমাবেশে, ভাষার সরলতায় ও রচনা-লালিত্যে বইখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণ পরিচয়ের পর এই গ্রন্থখানা বালক-বালিকাগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে। 'সুখপাঠ' বালকশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা এরূপ গ্রন্থের আদর দেখিলে সুখী হইব।

বাল্যসখা—শ্রীকরুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। মূল্য এক আনা। এই গ্রন্থখানা প্রথম শিক্ষার্থিগণের জন্য লিখিত। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে, অধুনা যে শ্রেণীর পুস্তক শিশুপাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সমালোচ্য গ্রন্থখানাও সেই শ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। আজকাল প্রথম শিক্ষার্থিগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব নাই তবে আর বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কেন?

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩। } পঞ্চম সংখ্যা

বীরপূজা।

[ময়মনসিংহ সুহৃদ্ সমিতির প্রতাপাদিত্য উৎসবে পঠিত।]

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজ এক অনির্ব্বচনীয় সুখময়ী স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। গভীর তমসাচ্ছন্ন অতীতের স্তর ভেদ করিয়া বাঙ্গালীর শৌর্য্যের পুণ্যালোক আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। তিন শত বৎসরের কথা; এইরূপ জ্যোৎস্না-বিধৌত বৈশাখী-পূর্ণিমা-রজনীতে বাঙ্গালীর গৌরব-রবি প্রতাপাদিত্যের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুললিত বেদমন্ত্র-ধ্বনিতে, উৎসবের কলকোলাহলে, গীত-বাদ্যের সুমধুর আলাপনে, পুরবাসিনী মহিলাবৃন্দের উলুরবে রাজগৃহ মুখরিত হইয়াছিল। মঙ্গল দীপাবলীতে অট্টালিকাশ্রেণী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। দুর্গপ্রাকার হইতে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়াছিল। নানাদেশ হইতে কত লোক রাজসমীপে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতে আসিয়াছিল। বাঙ্গালী একদিন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিল। স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুখ অনুভব করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী আপন রাজার মস্তকে বিজয়-মুকুট পরাইয়া ধন্য হইয়াছিল। সে দিন তাহারা অনুভব করিয়াছিল "দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়।" হায়! সে দিন গিয়াছে। সেই বৈশাখী পূর্ণিমার সুবিমল শশধর আজ নিবিড় জলদাবৃত। এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখী-পূর্ণিমা-রজনী আসে, সুনীল গগনে চারু-চন্দ্রমা বিকাশ পায়। কিন্তু ও সুধাংশুকরে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা নাই; থাকিলে এ মৃতজাতি নবজীবন লাভ করিত, বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রকাশিত হইত, বিলুপ্ত শৌর্য্য ফিরিয়া আসিত, প্রণষ্ট শক্তি জাগরিত হইত। এখনও বাঙ্গালী জীবিত

রহিয়াছে; কিন্তু সেই বৈশাখী পূর্ণিমার সুবিমল চন্দ্রকরোদ্ভাসিত বাঙ্গালীর বদনে একদিন যে গৌরবের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সে হাসি এখন চিরম্লান হইয়াছে। বাঙ্গালীর মুখ আজ কলঙ্ক-কালিমা-রঞ্জিত।

সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, বীরকেশরী প্রতাপের জন্মভূমি আজ অরণ্যে পরিণত। পুণ্যতীর্থ প্রতাপের রাজধানী আজ শ্বাপদগণের আবাসস্থান। চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণী এখন ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কাল! তোমার কি মহতী শক্তি! তোমার কি নির্ম্মম হৃদয়! তোমার বিধ্বংসী-স্রোতমুখে কত রত্নখচিত রাজসিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছে; কত কোহিনুর-শোভিত রাজমুকুট তোমার পদতলে দলিত হইতেছে; কত কনকসৌধকিরিটিনী-নগরী তুমি ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু কাল! জড় জগতেই তোমার শক্তি সীমাবদ্ধ। অন্তর্জ্জগতে তোমার প্রভাব অব্যাহত নহে। তুমি বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে বৈশাখী পূর্ণিমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। অনন্ত কাল প্রবাহে সেই স্মৃতি দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী যতই হীনবীর্য্য হউক না কেন, যতই অধঃপতিত হইয়া থাকুক না কেন, বৈশাখী-পূর্ণিমার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকিবে। সেই স্মৃতিই বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর আশা। সেই সুখময়ী, উৎসবময়ী, গৌরবময়ী বৈশাখী-যামিনীর স্মৃতিই বাঙ্গালীর হৃদয়ে নবীন আকাঙ্ক্ষা, নবীন উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বাঙ্গালীর বীর্য্য, বাঙ্গালীর প্রতিভা এই বৈশাখী-পূর্ণিমার সহিত চির বিজড়িত। এই পুণ্য স্মৃতি যতদিন প্রাণে জাগরুক থাকিবে ততদিন বাঙ্গালীর ধ্বংস নাই। বৈশাখী-পূর্ণিমার স্মৃতি বুকে ধরিয়াই বাঙ্গালী উঠিবে; বাঙ্গালী আবার গৌরব-মণ্ডিত হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। যে বলিবে বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালী দুর্ব্বল, আমরা তাহকে বৈশাখী-পূর্ণিমার কথা বলিব।

বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এতদিন আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তাহারা আমাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে ঘৃণিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে নিন্দিত এবং অজ্ঞাত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। এই দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া তাহারা অনেক মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছে। যে জাতীর পূর্ব্বপুরুষদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস আছে, সে জাতি প্রাচীন মহত্ব সংরক্ষণে যত্নবান হয়—একবার হারাইলে লুপ্তগৌরব উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেই জন্যই ফিরিঙ্গি ঐতিহাসিকগণ আমাদিগকে

বুঝাইয়াছিল আমরা চিরদিনই ভীরু, চিরদিনই কাপুরুষ। এতদিন বাঙ্গালীর ঐ সকল অমূলক কুৎসা পাঠ করিয়া আমাদেরও সেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ফিরিঙ্গীর বিদ্যালয়ে যে সকল ইতিহাস পাঠ্য তাহাতে ভারতবর্ষের কোন বীর-কেশরীর বীরত্বের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়, এই আর্যাভূমে কেবল কাপুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভারতজননী স্মরণাতীত কাল হইতে যে বীর-মাতা বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন ইহা কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সাবধান জনক-জননী যেমন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র স্বীয় সন্তানের করে প্রদান করিতে ভীত হন সেইরূপ ইংরেজ, ভারত-ইতিহাসের সমুজ্জ্বল বীরগাথা আমাদের বিদ্যালয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দিতে সাহস পায় না। পাছে তাহাদিগের হৃদয়ে অতীত-লুপ্ত-গৌরব-উদ্ধারের অদম্য বাসনা জাগরিত হয়। পাছে তাহারা মহিমামণ্ডিত পূর্ব্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রয়াস পায়, পাছে কেঁচো তুলিতে বিষধর সর্প বাহির হইয়া পড়ে। তাই ইংরাজের ইতিহাসে জালিয়াৎ ক্লাইব মহাপুরুষ; কিন্তু শিবাজী অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পরপীড়ক পরস্বাপহারী হেষ্টিংস দেবতুল্য ব্যক্তি; কিন্তু বাঙ্গালীর মুকুটমণি স্বদেশবৎসল প্রতাপাদিত্য, সীতারাম দুর্ব্বৃত্ত দস্যু মাত্র। ইংরেজের ইতিহাসে সকল যুদ্ধেই ইংরেজ জয়ী। একবার একটা সিংহ নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। সে এক গৃহের বারেন্দায় একটা প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সেই প্রতিমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে এক সিংহকে একজন মনুষ্য জুতা মারিতেছে। সিংহ সেই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছিল যদি সিংহকর্ত্তৃক এই প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইত তাহা হইলে উহা অন্য আকার ধারণ করিত। ইংরেজ এ দেশের বীরপুরুষদের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছে কিন্তু এখন দেখাইতে চায় যে বাহুবলে বিশাল ভারতবর্ষটা জয় করিয়াছিল। এই একটা বিরাট মিথ্যা কথা প্রচার করিবার মানসেই ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এদেশবাসীদিগকে নিতান্ত হীন কাপুরুষ বলিয়া পরিচিত করিতেছে। কিন্তু ইংরেজ আর আমাদের প্রাচীন মহত্বের ইতিহাস আমাদের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। আমরা লুপ্ত গৌরবের সন্ধান পাইয়াছি। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অতীতের তমসাচ্ছন্ন স্তর ভেদ করিয়া প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি ফুটিয়া উঠিতেছে। আমাদের বীর্য্যবন্ত, প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে আমরা চিনিয়াছি, তাঁহাদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছি। তাই এখানে আজ প্রতাপাদিত্য উৎসব। তাই বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজ বৈশাখী-পূর্ণিমার সুখময়ী, গৌরবময়ী স্মৃতি—

আজ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে বীরপূজার আয়োজন—কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।

বীরপূজার মহাফল। বীরের স্মৃতি চর্চ্চায় বাহুতে শক্তি আসে, হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, প্রাণে নবীন আশার মুকুল ফুটিয়া উঠে। প্রতাপের বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তিকাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিব। আবার সুখময়ী বৈশাখী-পূর্ণিমা-যামিনীর আগমন আশায় বিনিদ্র নয়নে প্রতীক্ষা করিব! কে জানে, বাঙ্গালীর ভাগ্যে কি আছে, হয়-তো কাল সমুদ্র মথিত করিয়া যুগ যুগান্তে সুনির্ম্মল নীল-নভোমণ্ডলে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আবার সমুদিত হইবে। আবার বাঙ্গালায় নবীন উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইবে; বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে বাঙ্গলার আকাশ নিনাদিত হইবে, বাঙ্গালীর মলিন অধর প্রান্তে আবার গৌরবের হাসি ফুটিয়া উঠিবে। ভাই নিরাশ হইও না। দিন ফিরিবে, আমরা জাগিব, আমরা উঠিব। বিধাতার দৈববাণী হইয়াছে আমরা উঠিব। আমাদের উন্নতি অনিবার্য্য। সত্য সত্যই মরা গাঙ্গে আবার বাণ আসিয়াছে। ভাই চিরদিন কোন জাতি পতিত থাকে না। চিরদিন কাহারো দুঃখে অতিবাহিত হয় না। আবার বৈশাখী পূর্ণিমার প্রতীক্ষায় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হও। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাই; আত্মশক্তি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা নাই। প্রতাপের জীবনী পাঠ কর, প্রতাপের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ কর—বাঙ্গালীর দিন ফিরিবে। একা প্রতাপ কি অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন মনে হইলেও বিস্ময়ে হৃদয় পুলকিত হয়। ভাই তোমরা নিঃসহায়, নিঃসম্বল ভাবিয়া নিরাশ হইও না। সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। তোমরা সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, সকল ভয় হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া প্রতাপের ন্যায় দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, দেখিবে তোমাদের উন্নতির পথ চিরমুক্ত। প্রতাপ মুহূর্ত্তের জন্য ভাবেন নাই কে তাহার সহায় হইবে, একবার মুখ ফিরিয়া দেখেন নাই—কে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে। যদি প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম তোমাদের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে তোমার সেই প্রেম সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারিবে। একটা প্রদীপ দ্বারা সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া যায় এক কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাবানলের সৃষ্টি করিয়া দেয়। একা বুদ্ধ সমগ্র এসিয়া বাসীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, একা চৈতন্য বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, একা প্রতাপ প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বিরাট হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একা সীতারাম জাহাঙ্গীরকে বিধ্বস্ত করিয়া

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বদেশ প্রেম চাই, স্থির সংকল্প চাই, সংযম চাই, অধ্যবসায় চাই নতুবা সফল মনোরথ হইবার আশা সুদূরপরাহত। সাধনার অনল প্রজ্জলিত কর। ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র আশা বিসর্জ্জন দাও ব্যক্তিগত শোকদুঃখ ভুলিয়া জাতীয় শোকদুঃখকে আপনার করিয়া লও। জাতির উদ্ধারব্রতকে একমাত্র জীবনের লক্ষ্য কর।

আজ এস্থানে বীরপূজার আয়োজন হইয়াছে। তাই কথায় বীরপূজা হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা বীরের পূজা করিতে হয়। পুণ্যশ্লোক প্রতাপাদিত্যের পরলোকগত আত্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জোড় করে অবনত মস্তকে বল ভাই আজ হইতে তোমরা মায়ের সন্তান হইবে, আজ হইতে মায়ের সেবা-ব্রতে এই নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিবে। এই চির স্মরণীয় বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বল "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

পলাতক।

অবিনাশচন্দ্র ভৃত্যকে উপরে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া বলিল, "বাবু, এখনই আসিতেছেন।"

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, "এখনই আসিবেন—বসুন, তামাক খান।"

রামলাল বসিলেন না—সেইখানে দাঁড়াইয়াই হুঁকা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। হুঁকা লইয়া তামাকু টানিতে টানিতে বলিলেন, "নারাণ চাটুয্যে বড়ই ভোগাইয়াছে—তা'কে ধরিতে পারিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার আছে; সুতরাং সকল পরিশ্রম তখন এক রকম পোষাইয়া যাইবে। ভায়া আর আমার হাত এড়াইতে পারিতেছেন না—এইবার ঠিক জালে পড়িয়াছেন। হুঁ বাবা,

বারবার মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার মুরগী তোমার বধিব পরাণ।"

অবিনাশবাবু আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই যে মহাশয়ের কবিতাতেও বেশ দখল আছে, তা থাক্ কিন্তু আপনি বড় ভুল করিতেছেন।"

রামলাল হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয় কতবার বলিব যে রামলাল ভুল করেন

না। এক্ষণ মাত্র এক উপায়ে আমার হাত এড়াইতে পারেন—আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিতে পারেন, আমার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়াতে ছাই দিতে পারেন" বলিয়া হুঁকাতে খুব জোরে একটা টান দিলেন।

অবিনাশচন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সেটা কি?"

রামলাল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিষ খাওয়া—গলায় দড়ি দেওয়া—পিস্তল দিয়া মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়া—তা সে যে রকমের লোক শুনিয়াছি তাহাতে তিনটার একটাও সে করিতেছে না। এইবার তাহাকে আচ্ছা রকমে জব্দ করিয়া দিব; সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত হইবে।"

এইরূপ কথায় প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল—তখন রামলাল সহসা কথা বন্ধ করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "মহাশয় আপনার বন্ধু—কি নাম বলিলেন,—এখনও আসিলেন না—জানি, কেন আসিতেছেন না,—আর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। বাধ্য হইয়া আমাকেই যাইতে হইল।"

এই বলিয়া তিনি হুঁকাটা রাখিয়া দ্রুতপদে তেতালার সিঁড়ির দিকে চলিলেন,—অবিনাশচন্দ্র ও তাহার বন্ধুটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তেতালার সোপানশ্রেণী অতি অপরিসর, তাহাতে অন্ধকার। তাহারা কয়েক সোপান উঠিয়া দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোক নামিয়া আসিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা,—অবগুণ্ঠনে তাহার মুখ আবৃত। তাঁহাদের উঠিতে দেখিয়া, রমণী এককোণে প্রাচীরের দিকে দাঁড়াইল,—তাঁহারা দেখিলেন, সে অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে, অতি কষ্টে ক্রন্দনধ্বনি চাপিয়া রাখিতেছে।

রামলাল তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে উপরে একটা বন্দুকের শব্দ হইল—শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"যা ভেবেছি—বদমাইশ শেষে তাই করিল—একদম সব মাটি" এই বলিয়া রামলাল তিন লাফে উপরে উঠিলেন,—অবিনাশচন্দ্র ও তাহার বন্ধু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। ত্রিতলস্থ কক্ষের সম্মুখে আসিয়া রামলাল সবলে দ্বারে ধাক্কা মারিলেন। দেখিলেন দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ,—তিনি সবলে দ্বারে ধাক্কার উপরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বার কিছুতেই খুলিল না।

ক্রোধ ও নৈরাশ্যে রামলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিলেন, "শালা শেষে গুলি করিয়া মরিল,—এত পরিশ্রম সব মাটি করিল,—আমার প্রোমোশন মাটি হইল,—পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া কত কি

করিব মনে করিয়াছিলাম, সব গেল।

সে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় অবিনাশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ করিয়া চাহিয়া আর কি দেখিতেছেন? ডাক্তার চাই—শীঘ্র একজন যাও—একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস—এখনও হয় ত সে মরে নাই—এখনও বেটাকে বাঁচাইতে পারিলে আমার পাঁচ হাজার টাকা মারা যায় না।"

কেহ নড়েন না দেখিয়া তিনি আরও গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আমি পুলিশের লোক জান না—আচ্ছা শিক্ষা দিয়া দিতেছি।"

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, "কি হুকুম করেন্ বলুন।"

"আমি এখান থেকে যেতে পারি না, যাবার যো নাই—একজন ডাক্তার এখনই ডেকে আন।"

অবিনাশচন্দ্র বন্ধুকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। নিকটেই একজন বৃদ্ধ ডাক্তার বাস করিতেন।

তখন রামলাল বলিলেন "শীঘ্র একটা সাবল বা সেইরকম একটা যা কিছু পান আনুন—দরজা ভাঙ্তে হবে।"

অবিনাশচন্দ্র সাবলের অনুসন্ধানে চলিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিল,—অবিনাশচন্দ্র আসেন না দেখিয়া, রামলাল ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে বারংবার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পর অবিনাশচন্দ্র আসিলেন, ভৃত্য সাবল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

তখন রামলাল দ্বারে সবলে সাবল মারিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃদ্ধ ডাক্তার মহাশয়ও আসিলেন।

তখন দ্বার ভাঙ্গিবার জন্য সকলে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পাড়ার অনেক লোক আসিয়া সেইখানে সমবেত হইলেন। বাড়ীতে একটা খুব গোলমাল পড়িয়া গেল।

(৫)

পুনঃ পুনঃ সাবলের আঘাত করায় দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল।

রামলাল, ডাক্তার বাবুকে সংক্ষেপে বলিলেন, "পলাতক নারাণ চাটুয্যেকে অনেক পরিশ্রমে এই বাড়ীতে ধরিয়াছিলাম,—আমার খবর পাইয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে—গুলি করিয়াছে—দেখুন যদি কোন উপায়ে তাহাকে বাঁচাতে পারেন, নতুবা আমার প্রোমোসন—পাঁচ হাজার টাকা একদম সব মাটি হয়—

ডাক্তার বোধ হয় রামলালের কোন কথাই শুনিলেন না,—তিনি বলিলেন ইহার

"সকলে ঘরের মধ্যে যাইবেন না,—আগে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি, ব্যাপার কি ?—গোলমাল আমি ভালবাসি না—বাহিরে থাকুন।"

অগত্যা সকলে বাহিরে থাকিলেন,—কেবল ডাক্তারবাবু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল—তাই ঘরটী কতকটা অন্ধকার—ডাক্তারবাবু সেই অন্ধকারে দেখিলেন, গৃহের একপার্শ্বে একটা দেহ পতিত রহিয়াছে,—তিনি সত্বর সেই দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাহির হইতে রামলাল পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মরিয়াছে—একবারে মরিয়াছে—না একটু আশা আছে—যেমন করিয়া হোক ইহাকে বাঁচান,—ডাক্তার মশাই আপনাকে খুব খুসী করিব।

ডাক্তার বাবু তাহার কথায় কোন উত্তর দিলেন না। বাহিরে রামলালের মাথা তখন অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। রামলাল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেমন দেখিলেন—আছে তো—বাঁচিবে তো ?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "বাঁচিবে না কেন ? কোন আঘাত লাগে নাই।"

রামলাল সোৎসাহে বলিলেন "মার দিয়া কেল্লা—তবে আর কি—কি হইয়াছে দেখিলেন ?"

"কেবল অজ্ঞান হইয়াছেন মাত্র।"

"ওঃ—কেবল অজ্ঞান—এখনই ভাল হয়ে যাবে।—হাতকড়ি সঙ্গেই আছে এখনই পরাব কি ?"

"ভয়ে বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছেন—বালিকা বইত নয়।"

রামলাল লাফাইয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "বালিকা !—সে কি মহাশয় !"

ডাক্তার বাবু বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি কি বলিতেছেন ?"

রামলাল বলিল "আমি পলাতক নারাণ চাটুয্যের কথা বলিতেছি—সে এই ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে।"

ডাক্তার বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—"মহাশয় গরমে আপনার মাথাটা খারাপ হইয়াছে গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন,—নতুবা চিকিৎসার আবশ্যক হইবে।"

রামলাল আরও চটিয়া উঠিল, বলিল "আমার মাথা খারাপ হইয়াছে ?"

ডাক্তার বাবু অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন। "হাঁ—নিশ্চয়,—এই ঘরে

একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক অজ্ঞান অবস্থায় আছেন,—আর কেহ নাই।"

রামলাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোক!" তখনই তিনি লম্ফ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই আবার লম্ফ দিয়া বাহিরে আসিয়া উভয় হস্তে উভয় জানুতে উপর্য্যুপরি সজোরে কয়েকটা চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "শালা—আমার চক্ষে ধূলো দিয়ে পলাইল—স্ত্রীর চাদর মুরী দিয়ে আমার চক্ষের সাম্‌নে, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল—আমি মুর্খের মত এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছি—ওঃ আমি কি গাধা?"

রামলাল লম্ফ দিতে দিতে উন্মত্তের ন্যায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল—

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এই ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেই স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইবে;—কোন ভয় নাই।"

ডাক্তার বাবু একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ঔষধ আনিতে ছুটিল।

যখন বিরাজমোহিনীর জ্ঞান হইল, তখন তাহার পার্শ্বে একব্যক্তি বসিয়াছিলেন।

চক্ষু মেলিয়াই তাহাকে বলিলেন। "দাদা।"

দাদা বলিলেন 'হাঁ, ভয় নাই—তাহাকে ধরিতে পারে নাই—সে পালাইয়াছে।'

বিরাজমোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন 'ভগবান আমার সহায়।'

বিরাজমোহিনী একটু সুস্থ হইলে তাহার দাদা তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

তখন অবিনাশচন্দ্র মন খুলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার সেই বন্ধুও খুব হাসিতে লাগিলেন—বলিলেন, "নারাণ বাবু সে একজন ক্ষণজন্মা লোক তাহাতে সন্দেহ নাই—আমি এক বিন্দুও সন্দেহ করি নাই—সিঁড়িতে আপনার সন্দেহ হইয়াছিল?"

"হাঁ—হইয়াছিল বই কি!"

"আমার কিছুমাত্র হয় নাই—রামলালেরও হয় নাই।'

"লোকটা চালাক খুব—ঠিক সময়ে বন্দুকের আওয়াজ না হইলে সন্দেহ হইত।"

"নারাণ বাবু—ভাবিয়া চিন্তিয়া এ সব করিয়াছিলেন—আপনি ইহার কিছুই জানিতেন না?"

"না—কিছুই নয়—তাহাকে একজন অপরিচিত লোক চাহে বলিয়াই সে বুঝিয়াছিল পুলিশের লোক—অমনই পালাবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল—তাহার বাহাদুরী আছে—বলিতে হইবে।"

"হুঁশিয়ার—তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ?"

"হাঁ, সে আমার বন্ধু—পরম বন্ধু, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি।"

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

হুমায়নের আউট্ যাত্রা।

(১৫৪০ খৃঃ অঃ)

(৪)

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে বর্ণিত ঘটনার পর যুবরাজ কামরান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু যুবরাজের সহচরগণকে সশস্ত্র দেখিয়া সম্রাটের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। সম্রাট ভ্রাতৃ-প্রেমে কুটিলতা নাই ভাবিয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। উভয় ভ্রাতা মিলিত হইলে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর যুবরাজ সম্রাটকে বলেন,—

"জাঁহাপনা! এ দাস হিন্দুস্থানে প্রবেশের পর হইতে বড়ই অসুখে কালাতিপাত করিতেছে। কতকগুলি দুর্ঘটনায় আমার অনুচরবৃন্দ নির্লজ্জের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। এখন আমাকে কাবুলে (১) যাইবার আদেশ প্রদান করুন। তথায় বিষয় কার্য্যের সুব্যবস্থা এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুজুরে হাজির হইব।" সম্রাট তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপর সম্রাট মুলতান-যাত্রা স্থির করেন। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী রাভিনদী অতিক্রম করিয়া হেজারা নামক পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আট মাইল অতিক্রম করিয়া শিবির সন্নিবেশ করে। এই স্থানে সম্রাট জানিতে পারিলেন, যুবরাজ হিন্দল এবং যোগদার কুপরামর্শীর চক্রান্তে সম্রাট-সৈন্যদল পরিত্যাগ করতঃ কতিপয় অনুচর সহ গুর্জ্জর অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বেহার জেলার শাসনকর্ত্তা কেলানবেগের নিকট হইতে একখানি লিপি

---

(১) কাবুল, সম্রাট বাবরের প্রিয় আবাস স্থান ও রাজধানী ছিল। See Edinburgh Gazetteer.

আগত হয়। তাহাতে বেগ সম্রাটকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং সাধ্যানুসারে সম্রাটের কার্য্যসাধনে যত্নবান হইবেন, প্রতিশ্রুত হয়েন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপ আর একখানি পত্র যুবরাজ কামরানের নিকটও প্রেরিত হয়। সম্রাট তৎবিষয় জ্ঞাত না থাকায়, তৎক্ষণাৎ বেগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ বেহার অভিমুখে অগ্রসর হন। বৈকালিক উপাসনার পর মোগল-সৈন্য চেনাবনদীর উপকূলে উপনীত হইলে, সম্রাট তার্দি বেগকে প্রথম পথ প্রদর্শকরূপে নিজ অশ্বারোহণে নদী সন্তরণ করিতে আদেশ করেন। তার্দির অশ্ব কিয়দ্দূর সন্তরণ দিয়া অগ্রসর হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে। তদ্দর্শনে সম্রাট একটী হস্তী নামাইতে আদেশ করেন। হস্তী সাঁতার দিতে আরম্ভ করিতেই, সম্রাট স্বয়ং নিজ অশ্ব লইয়া নদীতে অবতরণ করেন। তাঁহার অনুচরগণও তৎপথানুসরণ করে কিন্তু মাত্র ৪০ জন ব্যক্তি পরপারে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। তৎপর সমস্ত রাত্রি, পথ অতিক্রমের পর প্রাতঃকালে সকলে বেহারে উপনীত হন।

বেহারে পৌঁছিয়া সম্রাট দেখিলেন, যুবরাজ কামরান কেবল যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহা নহে, তিনি কেলান বেগকে বন্দী ও তাহার গৃহ-সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। যুবরাজের এই অবৈধকার্য্যে কুলী কুর্চি নামক জনৈক সম্রাটানুচর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সম্রাট তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন,—"আমি লাহোরে এই প্রস্তাব একবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই এখনও তাহাতে সম্মত হইব না। যাও, আমার জন্য একটী নূতন অশ্ব আনয়ন কর, আমি খুসাবে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা হোসেন সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" অনতিবিলম্বে অশ্ব আনীত হইলে, সম্রাট খুসাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় উপনীত হইলে হোসেন ও তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কেলান বেগের সহিত কামরান যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তোমার সহিতও যদি সেইরূপ করিবার চেষ্টা করে, তবে তুমি কি করিবে?" হোসেন উত্তর করিলেন,—"আমি সম্রাটের অনুরক্ত ভৃত্য, আপনার হিতার্থেই আমি জীবন উৎসর্গ করিব।" অতঃপর সম্রাট তাঁহাকে মোগল-সৈন্যের সহিত যোগদান করিতে বলেন, হোসেন তাহাতে কোন আপত্তি করেন না।

পরদিবস সকলে খুসাব ত্যাগ করিয়া মুলতান যাত্রা করিলেন। বার মাইল অতিক্রমের পর তাঁহারা এক সংকীর্ণ পথে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার কিছু

পরেই দুইটা রাস্তার সঙ্গম স্থল, একটী কাবুল অভিমুখে অপরটী মুলতান অভিমুখে গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট-সৈন্য এবং কামরানের অনুচরগণ একই সময়ে এই সঙ্গমস্থলে উপনীত হয়। সম্রাট অগ্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু কামরান তাহাতে আপত্তি করিয়া নিজেই অগ্রে যাইবেন, বলেন। কামরানের এই ব্যবহারে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মির্জ্জা আবুবেক নামক এক সাহসী যোদ্ধা এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া যুবরাজের সম্মুখে যাইয়া তীব্র ভাষায় তাঁহার অবাধ্যতা বুঝাইয়া দেন, যুবরাজও তাহাতে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। এই অবসরে সম্রাট-সৈন্য পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রে মুলতানের রাস্তায় অগ্রসর হইল, কামরান কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পর সম্রাট গুলবালুচ পৌঁছিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় তিনি শুনিলেন, যুবরাজ হিন্দল ও যোগদার—যাহারা পূর্ব্বেই সম্রাট-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—বেলুচিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তাহারা তাঁহাদিগকে গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হইতে দিবে না এই স্থানে আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে, আফগান সেনাপতি খোয়াজ খাঁ এখনও সম্রাটের পশ্চাতানুসরণ করিতেছে এবং তাঁহাদের ৪০ মাইল পশ্চাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যুবরাজ হিন্দল ও যোগদার আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া সম্রাট-শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সম্রাটের পদ-বন্দনা করিলেন।

খুসাব হইতে যাত্রা করিয়া সামান্য অভিযানে সম্রাট-সৈন্য আউচের (১) নিকটবর্ত্তী হইল। তথা হইতে বক্সালেঙ্গা নামক এক পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় এবং তৎসঙ্গে 'খাঁ জাহান' (পৃথীশ্বর) উপাধি সম্বলিত একখানি ফারমানও তাঁহাকে দেওয়া হয়। একখানি তাস্, একখানি ঢাল এবং চারিটী হস্তী তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদত্ত হয়। এই সম্মানের বিনিময়ে মোগল-সৈন্যের খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের নিমিত্ত এবং জিনিষপত্র বহনের জন্য নৌকা (২) সরবরাহ করিতে লেঙ্গা আদিষ্ট হন। বক্সী নিজে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিতে আগমন করেন না, কিন্তু নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করেন।

বক্সী লেঙ্গার প্রদত্ত নৌকাতে আউচের নিকটে নদী উত্তীর্ণ হইয়া, হুমায়ুন সৈকত-ভূমি অতিক্রম করিয়া বিকারে উপনীত হইলেন। তথায়

---

(১) 'The Oxydracæ of the Greeks',—Stewart.

(২) Vessels of 200 tons may ascend the river Indus 760 miles. See Edinburgh Gazetteer.

টাট্টার (১) শাসনকর্ত্তা শাহ হোসেন সুলতানের উদ্যানে তিনি শিবির সন্নিবেশ করেন। শাহ হোসেন, সম্রাট তাইমুরের বংশাবতংশ, কাজেই 'সম্রাট' উপাধি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর সম্রাট, যুবরাজ হিন্দালকে তদীয় অনুচরবৃন্দ সহ সেওয়াস্তান জেলার পাত্‌নগরাভিমুখে এবং মির্জ্জা যোদগারকে নদীর চল্লিশ মাইল ভাটিতে বেবিলতে যাইতে আদেশ করেন। কাবের বেগ এবং রেভারেও (পীর জাদে) মীর জাহিরকেও দূত স্বরূপে টাট্টার শাহ হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন।

দূতগণ নিরাপদে টাট্টায় উপনীত হন কিন্তু অনেক দিন গত হইলেও সম্রাট তাহাদের কোনও সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারেন না। তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে হয় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, না হয় তাহাদের কার্য্যের কতদূর কি হইয়াছে জানাইতে, বলিয়া পাঠান। প্রত্যুত্তরে তাহারা সম্রাটকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে লিখিয়া পাঠান; তাহারা যে সকালে প্রতিনিবৃত্ত হইবে তাহারও ইঙ্গিত করেন। অতঃপর বহুদিবস অতিবাহিত হইল তত্রাচ তাহারা ফিরিলেন না বা আর কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। কাজেই সম্রাট পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন,—"যদি তোমরা শাহ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে না পার, তবে অবিলম্বে বিকারে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে।" এই আদেশ প্রাপ্তমাত্র কাবের বেগ কার্য্যসাধন মানসে সঙ্গীকে রাখিয়া একাকী টাট্টা পরিত্যাগ করিলেন। আসিবার সময় গুটিকয়েক তাম্বু ও গালিচা, নয়টী অশ্ব, একটী উষ্ট্র ও খচ্চর ইত্যাদি কতিপয় সামান্য দ্রব্য শাহ হোসেনের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হন এবং তাহাই সঙ্গে করিয়া রওনা হন।

টাট্টায় যাহা ঘটিয়াছিল ও যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন, কাবের বেগ তৎসমুদয় সম্রাটকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শাহ হোসেন প্রথমতঃ সম্রাটের সহিত যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন কিন্তু পরে কোন ছলে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি কি করিবেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় আমাদের অভিযান হইতে নিবৃত্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই ঘটনার পূর্ব্বে যুবরাজ হিন্দাল, সম্রাটের পক্ষ হইতে সেওয়ান বা সেওয়াস্তান জেলা অধিকার করিয়া লইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু

(১) The Pattala of the Greeks.

সম্রাট তৎকালে তাহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জানান—"সেওয়ান শাহ হোসেনের শাসনাধীন; আমি তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না।" এখন দূতের বাচনিক সমস্ত অবগত হইয়া সম্রাট, যুবরাজকে তৎবিষয় বলিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে, সম্রাট-সৈন্য শীঘ্রই তোমার সহিত মিলিত হইবে, তৎপর তুমি তোমার কথামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।

অতঃপর সম্রাট যাত্রা করিলেন এবং চারিদিনে বাহেলিতে উপনীত হন। তথায় মির্জ্জা যোগদার শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাটের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যোগদার মহাসমারোহে আতিথ্য সৎকার করিলেন। তৎপর দিবস সম্রাট পুনরায় যাত্রা করিলেন। তিনি মির্জ্জাকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি স্বয়ং যুবরাজের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে যাইতেছেন। তুমি যেখানে আছ সেইখানেই অবস্থান কর, পরে তোমার কর্ত্তব্য বিষয় জানান যাইবে।

তিন দিন পথানুসরণ করিয়া সম্রাট, ইন্দাসের কুড়ি মাইল পশ্চিমস্থিত পাত নগরে উপনীত হইলেন। যুবরাজ হিন্দল, নগরের বহির্ভাগে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইলেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের ও পুরন্দর নামক ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি ছিলেন, তৎকালে শত বর্ষ পর্য্যন্ত দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে মহাবলশালী অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইলে সমগ্র দেবগণকে জয় করিয়া মহিষাসুর স্বয়ং ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

দেবাসুরের যুদ্ধও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের ন্যায় দেবশক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধ।

শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিলে ইন্দ্রত্ব লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সেই জন্য ইন্দ্রের এক নাম "শতক্রতু"। পুরন্দর শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দৈবশক্তি প্রভাবে (অদৃষ্টবলে) ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহিষাসুর পুরুষকার প্রভাবে বাহুবল দ্বারা পুরন্দরকে পরাজয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং দেবশক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধে প্রথমতঃ পুরুষকারেরই জয় হইল। কিন্তু যখন গর্ব্বান্ধ মহিষাসুর অধর্ম্মাচারী হইয়া দেবগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখন ক্রুদ্ধ দেবগণের শরীর হইতে ঐশীশক্তি আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুরের (বা অধর্ম্মের) বিনাশ এবং দেবগণকে (বা সাধুদিগকে) রক্ষা করিলেন।

এস্থলে চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে দেবগণ সেই অসুরনাশিনী ঐশীশক্তির স্তব করিয়া বর প্রাপ্ত হইলেন যে, আবার যখন দেবগণ কোনরূপ বিপদে পতিত হইয়া সেই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইবেন তখন আবার তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

অপরঞ্চ—

"পুরা শুম্ভ নিশুম্ভাভ্যা মসুরাভ্যাং শচী পতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ॥

পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় গর্ব্ব ও শক্তিবলে দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়া, তাহারাই চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, যম ও বরুণের অধিকার গ্রহণ করিল এবং তাহারা বায়ু ও অগ্নির কার্য্যও সম্পাদন করিতে লাগিল।

এস্থলেও পুরুষকারের নিকট দৈবশক্তি পরাভূত। দৈবশক্তি-সম্পন্ন শতক্রতু ইন্দ্রের অদৃষ্টায়ও অধিকার শুম্ভ নিশুম্ভ পুরুষকার প্রভাবে অপহরণ করিল।

অনন্তর দেবগণ, শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত, তিরস্কৃত এবং স্বর্গরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, অপরাজিতা শক্তিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবগণের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া কৌষিকী নাম্নী ঐশী শক্তি হিমালয়ের শিখরদেশে মনোহারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন।

শুম্ভাসুর দূতমুখে কৌষিকীর অলোকসামান্য রূপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিলে পর, দেবী বলিলেন—"যে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবে, আমি তাহারই গৃহিণী হইব।" শুম্ভাসুর

দেবীর এবম্ভূত গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে চিত্তাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং ধূম্রলোচন নামক অসুরের প্রতি দেবীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সেই সূত্রে দেবীর সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই যুদ্ধে শুম্ভ-নিশুম্ভ সসৈন্যে নিধন প্রাপ্ত হইল।

এস্থলে দেবগণকে দেবী বলিয়াছিলেন,—

"ইত্থং যদা যদা বাধাদানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয় ॥
* * * * *
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনিণাং ত্রাণ কারণাৎ ॥"

এইরূপ যখন যখন দানবকর্ত্তৃক (অধর্ম্মদ্বারা) পীড়া উপস্থিত হইবে, সেই সেই সময় আমি অবতীর্ণা হইয়া অরিকুল সংহার (অধর্ম্মের নাশ) করিব এবং মুনিদিগের (সাধুগণের) পরিত্রাণের জন্য আমি রাক্ষসগণকে (দুষ্কৃতের) নিধন করিব।

এস্থলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্ত" গীতার এই ভগবদুক্তির সহিত চণ্ডীর এই—"ইত্থং যদা যদা বাধা" ইত্যাদি, দেবীর উক্তির কিরূপ অভিন্নভাব, একবাক্যতা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গীতাতে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা, এবং দৈব অপেক্ষা পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং চণ্ডীতে দেবাসুর সংগ্রামাভিনয়ে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ফলতঃ গীতা ও চণ্ডী উভয় গ্রন্থেই—

"উৎযোগিনঃ পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥"

এই বাক্যের পোষকতা করিয়া অদৃষ্টবাদী অলস ব্যক্তিকে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু পুরুষকারের যখন অপব্যবহার হইয়াছে, অর্থাৎ সাধুতার পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতে অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে, তখনই ভগবান্ দেহ রচনা করিয়া ঐশীশক্তি প্রভাবে দুষ্কৃতের (অধর্ম্মের) বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা সাধুর পরিত্রাণ করিয়াছেন।

সুতরাং ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে; গীতা ও চণ্ডীর প্রধান উদ্দেশ্য এক।

গীতার আর একটী প্রধান উপদেশ,—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ॥

স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

আসক্তি হইতে কামের উৎপত্তি, কামের অপূর্ণতায় ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্যতা), সংমোহ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গীতার এই উপদেশটী চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ উপলক্ষে অভিনীত হইয়াছে। যখন দেবগণের স্তুতিতে পরিতুষ্টা হইয়া জগদম্বা কৌষিকী নাম্নী মনোহারিণী রমণীরূপে হিমালয়ের শিখরদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড-মুণ্ড নামক অসুরদ্বয় নিরুপমা রূপবতী দেবীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল,—মহারাজ! একটী পরম রূপবতী রমণী রূপপ্রভায় হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এরূপ অলোকসামান্য অতুল রূপরাশি কেহ কখন অবলোকন করে নাই। অতএব এই রমণীর বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করুন। ত্রিলোকের যে স্থানে যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল সে সমস্তই আপনি আপনার গৃহে আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ স্ত্রীরত্ন কেন আপনি গ্রহণ করিতেছেন না? দৈত্যেশ্বর শুম্ভ, চণ্ডমুণ্ডের এতদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব নামক অসুরকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

আসক্তিই পাপের প্রধান কারণ। আসক্তি হইতে ভোগতৃষ্ণা জন্মে। যথা—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ।

অনন্তর দৈত্যরাজ শুম্ভের আদেশে, সুগ্রীব দেবীর নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

হে দেবি! আমি ত্রিলোকের পরমেশ্বর দৈত্যেন্দ্র শুম্ভের দূত, তাঁহাদ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। যাঁহার আজ্ঞা দেবগণ মধ্যেও কখন প্রতিহত হয় না; সমস্ত শত্রুগণ যাঁহাদ্বারা নির্জ্জিত হইয়াছে, সেই দৈত্যেশ্বর শুম্ভ আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তর্কবাচস্পতি।

অশ্রু।

অশ্রু! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার ঐ স্বচ্ছ-সুন্দর রত্নোজ্জ্বল মূর্ত্তিটী আমার বড়ই লাগে; তোমার অন্তর-রাজ্যের মধুস্রাবী অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র পান করিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি। অশ্রু! মনে করিয়া দেখ, মাতৃকোল হইতে নামিয়া যখন ধীরে—অতি ধীরে জ্ঞানরাজ্যে প্রথম পা ফেলিতে ছিলাম, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তোমায় আমায় প্রথম আলাপ পরিচয়, তারপর কত দীর্ঘ অবসর কাটিয়া গিয়াছে—কখন নীরব মধ্যাহ্নে ছায়াশীতল কাননাভ্যন্তরে, কখনও স্নিগ্ধ অপরাহ্নে স্তব্ধ তটিনীর তটভূমে, কখনও বা নীরব নিশীথে নিরালোক রুদ্ধকক্ষে তোমায় আমায় কত দেখাদেখি মিশামিশি ভালবাসাবাসি চলিয়াছে। আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি, যতদিন আমি আছি, ততদিন তুমি আমার, আমি তোমার; ক্ষণকালের জন্যও তোমাকে চক্ষুর বাহিরে দিতে ইচ্ছা হয় না। তাই নয়নকোণে তোমার শয়ন-মন্দির রচনা করিয়া দিয়াছি।

অশ্রু! তুমি কি ছিলে, কোন্ যুগে কার অভিশাপে অবনীতে প্রথম অবতীর্ণ হইলে কোরাণে পুরাণে তাহার সন্ধান পাই না। গোড়া ঐতিহাসিক যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় নিয়া মাথা ঘামায়; অশোকের জীবনী আলোচনায় সময় কর্ত্তন করে; দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দশের বাহাবা পাইবার ব্যর্থ আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করে—কেবলি চর্ব্বিত-চর্ব্বণ নকল-তরজমার বাড়াবাড়ী—কেবলি উঞ্ছবৃত্তির কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির আয়োজন—মৌলিক চিন্তার অবসর তাহার নাই। তাই তোমার জীবনের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হয় নাই। না হোক্, আজ শম্বুক সাহায্যেই সমুদ্র সিঞ্চন করিব; আজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তাই ত্রিকালদর্শী পুরুষের ন্যায় তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিব; আজ অপরিপক্ক জ্ঞান লইয়াই তোমার জীবনী আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন ও জীবন ধন্য করিব।

অপৌরুষেয় গ্রন্থে যাহার প্রসঙ্গ নাই, পৌরুষেয় গ্রন্থাদিতেও সে তত্ত্বের মীমাংসা নাই, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অন্য উপায় নাই। সুতরাং তোমার জন্ম-মৃত্যুর কাল নিরূপণ করিতে যাইয়া অশ্রু! বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই শরণ লইতে হইল। কার্য্যদৃষ্টে কারণ নির্ণয় কর, বিজ্ঞানের এই সনাতন উপদেশানুসারে তোমার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছি, তুমি স্বর্গের কেহ ছিলে; মানুষের

প্রতি তোমার প্রীতির ভাব এবং তাহার সহিত তোমার অচ্ছেদ্যবন্ধনরূপ কার্য দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছ, তুমি জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে আদি মানবের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছ এবং শেষ মানবের সঙ্গে প্রলয়-জলধিজলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে। বিজ্ঞানের প্রসাদাৎ তোমার আবির্ভাব-তিরোভাবের সময় নির্ণীত হইল, এক্ষণে তোমার মর্ত্তাসংসারের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তোমার শক্তি-সামর্থ্য ও সুকর্ম্ম-কুকর্ম্মের পরিচয় গ্রহণ করিব।

অশ্রু! তুমি কি? তুমি সংসার-মরুভূবক্ষে শান্তির ফোয়ারা অথবা নিদাঘ-নিপীড়িত সংসারাকাশের বর্ষমান নবঘন। তুমি কি? তুমি মানুষের শীতের কম্বল, গ্রীষ্মের অম্বল; তুমি যোগের প্রত্যাদেশ, রোগের ভেষজ; তুমি দুর্ভিক্ষের অন্নসত্র, প্রণয়দরবারের প্রেমপত্র,—অথবা ইহা অপেক্ষাও যদি কোন প্রিয় জিনিস মানুষের থাকিয়া থাকে তবে তুমি তাহাই। তুমি সুখে দুঃখে সকল সময়েই মানুষের সহচর, সুতরাং প্রকৃত বন্ধু।

অশ্রু! তুমি অসাধ্য সাধনের শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ। তুমি বিন্দু হইয়াও সিন্ধুর ন্যায় ক্ষমতাশালী। মানুষের ভাষা যখন ভাবের বোঝা বহন করিতে অসমর্থ হয়, তখন তোমার ঐ বিন্দুদেহে, সিন্ধুর আকাশ-প্রতিবিম্ব ধারণের ন্যায় আমূল মানব হৃদয়টা প্রতিবিম্বিত করিয়া দাও। দর্শক উহাতে কখনও বিষাদের খরকরবাল প্রহারজনিত ক্ষতচিহ্ন সন্দর্শনে সহানুভূতির আরোগ্যকর প্রলেপ হস্তে সে হৃদয়-অধিকারীর নিকট উপস্থিত হয়; কখনও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার রমণীয়া কমনীয়া রসবিলাসিনী প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার উপাসনায় আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিতে ব্যাকুল হয়। কখনও বা অপার্থিব প্রেমের জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা বরাভয়দায়িনী সনাতনী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে জগৎস্রষ্টার প্রশংসাকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলে। সেই জন্যই হৃতপত্নিক রামচন্দ্রের অপাঙ্গে অশ্রুবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়া শাখামৃগের মর্কটপ্রাণও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজ্যভ্রষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অশ্রুতে সত্যসন্ধ সংযমী রঘুকুলপতির হৃদয়েও জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই কুরুসভামধ্যে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা যাজ্ঞসেনীর অশ্রুতে কুরুকুলধ্বংসের একটা মহাপ্রতিজ্ঞা অদৃশ্যে জাগিয়া বসিয়াছিল। সেই জন্যই বৈষ্ণবকবির মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী আয়ান-গৃহিণীর কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুপাতে মথুরার আভীর অন্তঃপুর হইতে একটা উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল-ভাবে বৃন্দাবনের তমাল-তরুর দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সেই জন্যই নন্দের

চাঁদের প্রেমাশ্রুতে সমস্ত নদীয়ার বাণ ডাকিয়াছিল এবং ধ্রুব-প্রহ্লাদের অশ্রুপাতে স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল। অথবা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ জন্য এতদুরেই বা যাই কেন—এই দৃশ্যমান জগতে, দুঃখীর বিষাদ-বিদগ্ধ-বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বহুদিন পর মিলিত দম্পতি অথবা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্মুখে দাঁড়াইলে এবং ধ্যানমগ্ন পুণ্যাত্মা সাধু সজ্জনের সমীপবর্ত্তী হইলে, ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়।

অশ্রু! তুমি দর্শককে যেমন শ্রান্ত কর, আশ্রিতকে আবার তেমনি শান্ত কর। মানুষ যখন দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, যখন তাহার শোক-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের কুলে কুলে ভীমবেগে আঘাত আরম্ভ করে, সে যখন অনন্যগতি হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুকামনা করিতে থাকে, সেই সঙ্কট সময়ে অশ্রু! তুমি তাহার নয়নকোণে আসিয়া দেখা দেও, তোমাতে কি আছে জানি না, কিন্তু দেখিতে পাই, তোমার আবির্ভাবে সে উন্মত্ত সিন্ধুর তরঙ্গফণা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—তুমি বিন্দু হইয়াও সে সিন্ধুবারি রৌদ্রতেজে শুষ্ক করিয়া দাও, মানুষ অকুল হইতে কুলে পঁহুছে। আহারাভাবে যেমন মৃত্যু ঘটে, অতি আহারও আবার তেমনি মৃত্যু সহচর অতিসারকে আহ্বান করিয়া আনে। অতি দুঃখে যেমন জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়, অতি সুখ তেমনি আবার জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। তাই সুখে দুঃখে সকল সময়েই নরের নয়নকোণে তোমার আবির্ভাব দেখা যায়। ধন্য অশ্রু! ধন্য তোমার জীবন! তুমি নীরবে মানবমণ্ডলীর কি মহান্ উপকারই না সাধন করিতেছ।

খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেল' বলিতেছেন—

"জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল। ভোজগৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপগৃহে যাওয়া ভাল। হাস্য হইতে মনস্তাপ ভাল।" উপরোক্ত বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এইরূপ দাঁড়ায়—হাসি অপেক্ষা অশ্রু ভাল। কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য! রৌদ্রতাপে আকাশ পরিষ্কৃত হয় না, বর্ষণ চাই। হাসিতে হৃদয়ের গুরুভার বিদূরিত হইতে পারে না, অশ্রুর আবশ্যক। সেই জন্যই অশ্রু! তোমায় এত ভালবাসি।

বলিয়াছি অশ্রু! আমি কেন তোমায় এত ভালবাসি। লোকের গালি-নিন্দা-উপেক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমি তোমায় ভালবাসিতেছি এবং ভালবাসিব। তবে তুমি এখানে সেখানে অমন ছুটাছুটি করিয়া ফের কেন?

তোমার অঙ্গের কাছে দেখিলে আমার মনে যে নিদারুণ হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয় অশ্রু!—আমার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমার অন্তর যে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। তাই বলি অশ্রু! তোমার এই আশ্রিত প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে ফেলিয়া আর কোথায়ও যেও না।

পাটলিপুত্র

শাক্যবংশাবতংস ভগবান্ বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি সময়ে বিম্বসার মগধের অধিপতি ছিলেন। এই সময়ে রাজগৃহ নগর মগধের রাজধানী ছিল। ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, তিনি রাজগৃহে পদার্পণ করা মাত্র তত্রত্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া গেল। স্বয়ং নরপতি বিম্বসার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। মহিষী ক্ষেমাদেবী ভিক্ষুণী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। নগরে মহাগোলযোগ হইল; কিয়ৎকালের জন্য মহামায়ার প্রভাব রাজগৃহ হইতে অন্তরিত হইল। রাজগৃহবাসিগণ সংসারে বীতরাগ হইলেন।

এই সুযোগে বিম্বসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া রাজগৃহের সিংহাসন অধিকার করেন। অজাতশত্রু প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে বর্ত্তমান পাটনা নগরের স্থান পাটলিগ্রাম বলিয়া কথিত হইত। পাটলির সংলগ্ন ভাগীরথীর উত্তর তীরে উজ্জীয়গণ বাস করিতেন।

উজ্জীয়গণ অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। উজ্জীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে দমন করার জন্য অজাতশত্রু পাটলিগ্রামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভগবান্ পাটলিগ্রাম দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—"উত্তরকালে এই গ্রাম এক পরম রমণীয় নগরে পরিণত হইবে।" অজাতশত্রু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কুশীনগরের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে ভগবান নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।

অজাতশত্রুর বংশধর উদয়াশ্ব পাটলিপুত্র নগর সংস্থাপন করেন। এই বংশীয় শেষ নরপতি রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এই নরপতি শকাব্দার ৪৯৫ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্তর নন্দবংশীয় প্রথম নরপতি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মগধের রাজধানী প্রথমতঃ গিরিব্রজ নগরে অবস্থিত ছিল, পরে রাজগৃহ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। রাজগৃহ নগরের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা প্রাচীরের কার্য্য সম্পাদন করিত। পর্ব্বতোপরি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। রাজগৃহ এক্ষণ রাজগীর পাঁহাড় বলিয়া কথিত হয়। বারাণসীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কতিপয় উন্নত স্তূপ রাজগৃহের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

নন্দবংশীয় নরপতিগণের সময় পাটলিপুত্র নগর মগধের রাজধানী ছিল। তাঁহারা শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে যুনানী সম্রাট সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তদনন্তর সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত মগধ-সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যুনানী দূত মিগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে কতিপয় বৎসর বাস করেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্র নগর দর্শন করেন। আমরা তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে পাটলিপুত্রের বিবরণ প্রদান করিব।

পাটলিপুত্র নগর সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী; এই নগর কখন কখন কুসুমপুর বলিয়া কথিত হয়। যেস্থানে হিরণ্যবাহু নদ স্রোতস্বতী ভাগীরথীতে সম্মিলিত হইয়াছে পাটলিপুত্র সেই সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। হিরণ্যবাহুর বর্ত্তমান প্রচলিত নাম শোণনদ। সম্রাটের প্রাসাদ ভাগীরথী তটে অবস্থিত ছিল; তাহা সুগাঙ্গ প্রাসাদ বলিয়া কথিত হইত। পাটলিপুত্র দীর্ঘে আট ক্রোশ এবং প্রস্থে দেড় ক্রোশ বিস্তৃত ছিল; কাষ্ঠময় প্রাচীর দ্বারা নগরের চারিদিক পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর অতি সুদৃঢ়। নগরে প্রবেশ করার জন্য ৬৪টি দ্বার ছিল। শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়ান এই কাষ্ঠময় প্রাচীর দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই প্রাচীরের উপরে ৫৭০ টি গুম্বজ ছিল। নগরের মধ্য হইতে শর সন্ধান করার জন্য প্রাচীর মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র ছিল। কাষ্ঠময় প্রাচীর রক্ষার্থ প্রাচীর সংলগ্ন অসংখ্য কাষ্ঠময় স্তম্ভ ছিল। প্রাচীরের বাহিরে সুগভীর পরিখা ছিল, পরিখা প্রস্থে ৪০০ হস্ত পরিমাণ এবং বিংশতি হস্ত পরিমাণ গভীর। নগর জ্যামিতির চতুষ্কোণ সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় ছিল।

মিগাস্থিনিস বলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নগর পর্য্যবেক্ষণ জন্য ত্রিশ জন কার্য্যকারক নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচ পাঁচ জনে এক এক ভাগ, এই নিয়মে

ইঁহারা ছয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একদল পরিশ্রমার্জ্জিত দ্রব্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় দল বিদেশীয় ব্যক্তিগণের আদর অভ্যর্থনা করিতেন; তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিতেন; ইঁহাদের কার্য্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; ইঁহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন গোপনে তাহা অনুসন্ধান করিতেন; বিদেশীয় ব্যক্তিগণ পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় ইঁহারা দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিতেন; বিদেশীয় কোন ব্যক্তি পাটলিপুত্র নগরে পরলোক গমন করিলে তাঁহার সৎকার করিতেন, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন এবং বিদেশীয় কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহার চিকিৎসার উপায় করিয়া দিতেন।

তৃতীয় দল জন্ম মৃত্যুর তালিকা করিতেন। চতুর্থ দল বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিক্রেতাগণ যে ওজন দ্বারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, ইঁহারা তাহার শুদ্ধতা পরীক্ষা করিতেন এবং পণ্য দ্রব্য যাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে বিক্রয় হয় ইঁহারা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

পঞ্চম দল শিল্প দ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেন; কোন বিক্রেতা পুরাতন ও নূতন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে না পারেন তৎপ্রতি ইঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন।

ষষ্ঠ দল রাজকীয় কর আদায় করিতেন।

এই ছয় বিভাগ ব্যতীত রাজকীয় অন্যান্য কার্য্যকারকও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় পণ্য দ্রব্য বিক্রয় স্থান পরিদর্শন করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি সৈন্যদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিতেন। মগধ সাম্রাজ্য মধ্যে প্রধান প্রধান যে সমস্ত নদ নদী প্রবাহিত ছিল; এই সমস্ত নদ নদীতে বাণিজ্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য একশ্রেণীর কার্য্যকারক নিযুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ দেশীয় পয়ঃপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে একদল কার্য্যকারক দেশের ভূমি জরিপ করিতেন। যাহারা স্থানে স্থানে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া হিংস্রজন্তু বধ করিত তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা এক দলের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। একদল দেশীয় কাষ্ঠ বিক্রেতা, সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং খনি খননকারকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই শ্রেণীর কার্য্যকারকগণ রাজ্য মধ্যে বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য এক একটী কাষ্ঠ পুতিয়া রাখিতেন। *

একদল কার্য্যকারক রাজকীয় প্রাসাদ অট্টালিকাদির তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহারা সর্ব্বসাধারণের উপাসনার মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, এবং দেশীয় বন্দরের পর্য্যবেক্ষণ করা ইহাদের কার্য্য ছিল।

নগরে প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য কতিপয় প্রাড়্‌বিবাক নিযুক্ত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত সৈনিক বিভাগে কতিপয় কার্য্যকারক নিযুক্ত ছিলেন। ইহারাও ছয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম দল যুদ্ধ-তরীর নৌসেনাপতির আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন এবং সৈন্যগণের ও পশ্বাদির আহার্য্য ইত্যাদি ও যুদ্ধোপযোগী বিবিধ দ্রব্যসম্ভারবাহী গো-শকট সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন; দ্বিতীয় দল যুদ্ধ সময়ে বাদ্যকর, অশ্বের পরিচর্য্যাকারক এবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। পশ্বাদির জন্য উপযুক্ত ঘাস সংগ্রহ করার ভার ইঁহাদের প্রতি ন্যস্ত ছিল।

এই সমস্ত কার্য্যকারক মধ্যে তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ত্বাবধান করিতেন, চতুর্থ দল অশ্বারোহিগণের, পঞ্চম দল, রথারোহিগণের এবং ষষ্ঠদল হস্ত্যারোহিগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

অশ্ব এবং হস্তী রাখিবার জন্য অশ্বশালা ও হস্তীশালা নির্দ্দিষ্ট ছিল। যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রাদি রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত অট্টালিকা ছিল।

চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্র নগর দেখিয়াছেন কিন্তু শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিয়ান্‌ সাঙ্‌ পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন। অতএব ইহার মধ্যে কোন সময়ে (সম্ভবত শকাব্দার পঞ্চম শতাব্দীতে) পাটলিপুত্র নগর ধ্বংস হইয়াছে। পাটলিপুত্রের বর্ত্তমান নাম পাটনা; কিন্তু শোণনদ বর্ত্তমান পাটনার নিকট ভাগীরথীতে সম্মিলিত হয় নাই। কালে শোণের গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন সাময়িক কোন কোন নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে বৈদিক সরস্বতী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। কোন কোন নদ নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জিলা দুইভাগ করিয়া ময়মনসিংহ নগরের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত; এক্ষণ ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ নগর হইতে ত্রিশক্রোশ ব্যবধান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; ব্রহ্মপুত্র নদ এক্ষণ ময়মনসিংহ জিলার পশ্চিম সীমা। এক্ষণ সে নদ তথায় যমুনা নদী নাম ধারণ করিয়াছেন। অতএব শোণনদ পাটনার নিকট গঙ্গায় সম্মিলিত হয় নাই এজন্য পাটলিপুত্র এবং পাটনার অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

১৭৯৮ শকাব্দে পাটনার চকবাজারের নিকটবর্ত্তী একস্থানে পুকুর খনন করা হইয়াছে। খনকগণ কোন স্থানে আট হাত কোন স্থানে দশ হাত পরিমাণ খনন করিলে পাটলিপুত্রের কাষ্ঠময় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান পাটনাই প্রাচীন সাময়িক পাটলিপুত্র ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

এক সময়ে তাম্রলিপ্ত নগর বঙ্গীয় উপসাগরের তটে স্থিত ছিল; এই নগর হইতে অর্ণবযান সিংহল, যাবা প্রভৃতি দ্বীপে এবং তথা হইতে চীন দেশাভিমুখে যাত্রা করিত। চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং জলপথে প্রথমতঃ তাম্রলিপ্ত বন্দরে পদার্পণ করেন। এক্ষণ তাম্রলিপ্তের ভগ্নাবশেষ তমলুক সমুদ্রতট হইতে বহু দূরবর্ত্তী।

পাঁচশত বৎসরের অধিক হইবে শোণনদ গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পাটনার নিকট শোণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন।

মিগাস্থিনিস্ বলেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। যে সমস্ত নগর বৃহৎ নদ-নদীর বা সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল তাহার প্রাচীর কাষ্ঠময় ছিল, কিন্তু যে নগর নদ-নদী বা সমুদ্রের তটে অবস্থিত ছিল না তাহার প্রাচীর ইষ্টকময় ছিল।

পাটলিপুত্রের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন; মেজর রেনেল বলেন যে, এই নগর দীর্ঘে পাঁচ ক্রোশ এবং প্রস্থে এক ক্রোশ ছিল। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। মিগাস্থিনিস্ বহুকাল পাটলিপুত্র নগরে বাস করেন; তৎপ্রদত্ত বর্ণনায় সন্দেহ করার কি কারণ আছে? প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান নগর এরূপ দীর্ঘ থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগর দীর্ঘে আট ক্রোশের অধিক ছিল, মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজারের সন্নিকটে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মোগল সম্রাটগণের রাজধানী দিল্লীনগর ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত; সাজাহানাবাদ সহ দিল্লীর শেষ প্রান্ত আটক্রোশ হইতে অধিক।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

(৮)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ঘরে ছিলেন তাহা দোকানঘর হইতে একটু দূরে। প্রাণেশচন্দ্র যখন দেখিল—এই ঘরে কেহ নাই, তাহাদের জিনিসপত্র নাই, দরজা জানালা খোলা রহিয়াছে, তখন সে মনে করিল, ইঁহারা অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, দোকানদারকে সংবাদ দিতে পারেন নাই; তাহা না হইলে ঘর এরূপ খোলা পড়িয়া থাকিত না। তিনি বিলম্ব না করিয়া দোকানদারের ঘরের নিকট যাইয়া তাহাকে ডাকিলেন। বহুবার ডাকিবার পর একটু মৃদু মেয়েলী গলায় কে বলিতে লাগিল "ওগো ওঠ, কে ডাক্‌ছে।" স্বয়ং নিদ্রাদেবীর নাকে নস্ত ধরিলে বুঝিবা তাহাকে জাগান যাইতে পারিত; কিন্তু নিদ্রিত মহাজন দোকানদারকে চৈতন্য করান মেয়ে-সুরের পক্ষে সহজ হইল না। প্রাণেশ-চন্দ্রের ঘন ডাক, মেয়েটীর মুখ ছাড়িয়া হাতের ধাক্কা, ধাক্কার বর্দ্ধিত বেগের অনুপাতে খাটের মড়মড় শব্দ—দোকানদার ঘুমের ঘোরে "চোর আস্‌ছে", "প্রিদীম জ্বাল্" বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিল। তখন প্রাণেশচন্দ্র বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ঘরে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা কোথায় গেল—সে তাহার কিছু জানে কি না। দোকানদার বাহির হইয়া পড়িল, বলিল—"কিছু জানি না, ওরা ভাড়ার পয়সা পর্য্যন্ত দিয়া যায় নাই। চলেন-ত দেখি কি অইল।" উভয়ে যাইয়া ঘর ও ঘরের চারিদিক অনুসন্ধান করিল, ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

দোকানদার। ম'শায় ব্রাহ্মণ।

প্রাণেশ। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

দোকানদার ভক্তির সহিত প্রাণেশের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "আপনি ওনাদের কি অন।"

প্রাণেশ। কিছু নয়।

দোকানদার। তবে ওনাদের সঙ্গে মিল্‌লেন্ কেম্‌তে।

প্রাণেশচন্দ্র সমস্ত বলিলেন।

দোকানদার। তবেই অইছে, আপনার ডরেই ওনারা পলাইচে; সঙ্গে যুবতী মাইয়া।

প্রাণেশচন্দ্র। বল কি, তা'হলে আমার তোরঙ্গটা রেখে যেতো। তাও কি

হয় ত আমার ভয়ে পলাবে, আমার মামার বাড়ীর নিকটের লোক—আত্মীয়তাও আছে।

দোকানদার। আমার মনে কয়, আজকা রাত্রে অনেক লোক আমার দোকানে আনাগোনা কর্‌চে—এমন তো আর দেখ্‌চি না, পদ্মাপাড়ের লোক—আপনার কোন কু-মতলব আছে জানাইয়া ঠাকুরকে আপনার সঙ্গ ছাড়্‌বার জইন্য ঘর হইতে বাহির কর্‌চে, পরে তারা কি কর্‌চে না কর্‌চে কে জানে।

প্রাণেশ বসিয়া পড়িল। সেই সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্বৃত্তগণের ভীষণ অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছিল, প্রাণেশ-চন্দ্র তাহা পড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েটীর প্রতি লাঞ্ছনার আশঙ্কা করিয়া একবারে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। এখন কি করা যায়, থানা কত দূর, কাহার পরামর্শ লওয়া যায়। ভদ্রঘরের বিষয়, বহুলোককে জানানইবা যায় কি করিয়া—প্রাণেশচন্দ্র চিন্তার অকূলসাগরে ভাসিতে লাগিল।

দোকানদার। ঠাকুরের নাম শশী বারুয্যা।

প্রাণেশ। হাঁ, শশী বাড়ুয্যে।

দোকানদার। এখানে থাক্‌তে ডর পাইয়া যদি আর কোন ঘরে যাইয়া থাকেন—ডাক্‌মু।

প্রাণেশ। ডাক।

দোকানদার। "ও বাড়ুয্যা মশয়, ও শশী বাড়ুয্যা ঠাকুর, ও ঠাকুর মশয়" বলিয়া গলা উচ্চে চড়াইয়া, শেষ শব্দের তান সুদীর্ঘ করিয়া ডাকিতে লাগিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ পদ্মা কল কল ধ্বনি করিতেছে। এই কল ধ্বনিতে দোকানদারের ডাক মিশাইয়া যাইতে লাগিল। বন্দরের বিপণিতে বিপণিতে এবং নদীর আঁকে বাঁকে প্রহত হইয়া এদিকে ওদিকে ডাকের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠিল।

কোন উত্তর আসিল না। গভীর রাত্রি—কেহ কোন সাড়া দিল না।

প্রাণেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল—কেনই বা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, কেনই বা পদ্মাতীরে আপন গানে মুগ্ধ হইয়া এত সময় কাটাইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিলাম, মুক্তিকে ফেলিয়া আসিলাম, সে যেন স্বপ্ন—ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম; মেয়েটীর প্রতি কেমন এক মমতা জন্মিল—এও যেন স্বপ্ন!

দোকানদার প্রাণেশকে অনেক প্রবোধ দিল। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিতে বলিল, সেই ঘরে লইয়া গেল, প্রদীপ আনিল, শয্যা করিয়া দিল, বলিল, "ভয় পাইবেন না, আমি কাছেই আছি।"

দোকানদার আপন ঘরে চলিয়া গেল। প্রাণেশচন্দ্র শুইল না, ঘরের মধ্যে হাঁটিতে লাগিল। পাহাড় মাথায় করিয়াও বুঝিবা চলা যায়, দুশ্চিন্তার পাষাণ-চাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, প্রাণেশ বিছানায় বসিল, বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, শুইয়া পড়িল—নিদ্রা আসিয়া নিমেষে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

পূর্ব্বদিকে উষার আলোক দেখা দিয়াছে; কিন্তু কোয়াসার আঁধারে আলোক ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দোকানদার ব্যস্তসমস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ও ঠাকুর মশয়, উঠ, শিগ্‌গির আইসা"

প্রাণেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কোন সংবাদ পাইয়াছ?"

দোকানদার। কথা কইও না ঠাকুর, আমার সঙ্গে আইস।

প্রাণেশচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল॥

---

(৯)

কলেজষ্ট্রীট—পুস্তকের দোকানের সারি পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণের প্রায় সকল বংশের ভিন্ন ভিন্ন সাজ সজ্জার বহু দোকান। এদিকে ওদিকে মুসলমানগণও দুই একখানি দোকানের কপালে "ব্রাদার" বসাইয়া পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইংরেজের নিউমেন, থেকারের সে বিপুলতা সে সৌন্দর্য্য এখানে নাই। গৃহগুলি ক্ষুদ্র, আলমারিগুলি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রের চাপে পড়িয়া পুস্তকগুলি একে অন্যের গায়-মাথায় পিষিয়া যাইতেছে। দোকানের মুখভাগে বাক্স সম্মুখে করিয়া কেরাণী বসিয়াছেন। তাহার বামে দক্ষিণে দাঁড়াইবার স্থান অনেক স্থলেই সঙ্কীর্ণ; অনেক স্থলে পথে দাঁড়াইয়াই পুস্তক চাহিতে হয়। কলেজষ্ট্রীট—কলেজের কেল্লা। এদিকে প্রেসিডেন্সী, সিটী, এলবার্ট, কেথিড্রেল—ওদিকে বিদ্যাসাগর হইতে বেথুন, বেথুন হইতে এসেম্ব্লি সমস্তই এই কেল্লার সীমানার অধীন। দোকানগুলি কেল্লার কারখানা। পুস্তকগুলি কারখানার গুলি-গোলা, অস্ত্র-শস্ত্র। পুস্তকের দোকানে বাঙ্গালি বালকগণের গতিবিধি যথেষ্ট।

* * * কোম্পানি একখানি পুস্তকের দোকান। সম্মুখভাগ সেইরূপ সঙ্কীর্ণ। কিন্তু দোকানের পশ্চাতের একটী প্রকোষ্ঠ অতি প্রশস্ত, এবং সুসজ্জিত। রাত্রি বারটা। চারিদিকের লোকের সাড়া শব্দ নাই। কিন্তু এই

প্রকোষ্ঠ কখনও গুরু বিষয়ের আলোচনায় গম্ভীর, কখনও হাস্যামোদে উছলিয়া উঠিতেছে।

এই প্রকোষ্ঠের এক আলমারিতে লেফেইটী, গেরিবল্ডী, মেজিনী, কসুথ্ প্রভৃতির জীবনচরিত, অন্য আলমারিতে এলিসন, গিবন্স, গ্রোট, বেক্রফট প্রভৃতি রচিত ইতিহাস। কোন আলমারিতে নিউমেন্, মার্টিনো, পার্কার চেনিংএর ধর্ম্মগ্রন্থ, কোনদিকে ব্রাদার হেল্প, বুক অব্ মার্টার প্রভৃতি আত্মোৎসর্গের গ্রন্থ রহিয়াছে; যাহার প্রতি যেরূপ নির্দ্দেশ আছে. উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি সেই অনুসারে পুস্তক পড়িতেছেন। এককোণে কতকগুলি মুদ্গার ও ডম্বেল—৺ নবগোপাল ও ৺ অম্বু বাবুর পুরাতন শিষ্যগণ এখানে অপরাহ্ণে কুস্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে আসিয়া একখানি টেবিলের চারিদিকে সমবেত হইলেন।

অনন্ত। তবে কি প্রাণেশচন্দ্রের কোন সংবাদ লওয়া হইবে না?

দাদা ম'শায়। লওয়া হইয়াছে—এই কার্ড পড়।

অমৃত। দাদা ম'শায়ের দৃত সর্ব্বত্র।

ইস্মাইল। ভাল এক কথা—দাদা ম'শায়, সকলেরই দাদা ম'শায় হলেন কিরূপে?

করুণা। তাই-ত—বাপ, মা, মেয়ে, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সকলেরই দাদা-ম'শায়। এ কেমন?

অনাদি। ব্রহ্মা পিতামহ যেমন।

ইস্মাইল। ও-সব কথা আমরা বুঝি না। তোমাদের দাদা ম'শায়ই থাকুন, আমরা বল্‌বো ভাই-সাহেব।

অনন্ত। তা কখনই হবে না। তোমাদেরও দাদা ম'শায় বল্‌তে হবে। দাদা ম'শায়ের অনুবাদ 'ভাই সাহেব' হ'তে পারে, কিন্তু দাদা ম'শায়, ভাই-সাহেব হ'তে পারেন না—হ'তে দিব না।

ইস্মাইল। এই বুঝি তোমাদের হিন্দু মুসলমানের মিলন!

দেবেন্দ্র। অনুবাদেই বিবাদ, মূল লইয়া তর্ক আরম্ভ হইলে বোধ করি, একটা ওয়াটারলু হইয়া যায়।

দাদা ম'শায় ইস্মাইলের মাথার ফেজ-টুপীটি পলকে তুলিয়া পলকে নিজ মাথায় পরিলেন।—দাঁড়াইলে মাথা সকলের উপরে—বসিলে মাথা সকলের

উপরে—ফেজের ঝুটিওয়ালা উঁচু চূড়ার মত্ত দাদা-ম'শায় আরও মস্ত দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্ত দাদা মহাশয়ের মাথা হইতে টুপী তুলিয়া লইল।

ইস্মাইল। এই টুপীটাই সইতে পার্‌লে না, কেতাব-কোরাণ সহিত আস্ত মুসলমানকে সহিবে কিরূপে ?

অনন্ত তাহার গলার পইতা ইস্মাইলের গলায় তুলিয়া দিল—বলিল, "সও-তো দেখি কেমন, ভাই সাহেব।"

কথা বলিতে না বলিতে, পইতা গায় পড়িতে না পড়িতে ইস্মমাইল যেন সাপে ধরিল বলিয়া লাফাইয়া উঠিল।

অমৃত। এইরূপ! এইরূপ!

দাদা ম'শায়। টুপী এক, পইতা আর; কিন্তু বাঙ্গলার মাটি এক, বাঙ্গলা ভাষা এক; বাঙ্গলার মাটিতে দাঁড়াইয়া বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহি', হিন্দু মুসলমান—দুই এক। অনন্ত একটু বেশী হিন্দু; ইস্মাইল, ওর তামাসা ধরিস্‌ না।

দাদা ম'শায় ইস্মমাইলকে কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—"প্রাণেশ-চন্দ্রের সম্বন্ধে কি করা যায় ?"

অমৃত। যে পাতিল ফুটিবার ফাঁটিয়া গিয়াছে—গিয়াছে-সে গিয়াছে—তার আবার খবর কি ?

দাদা ম'শায়। দেখ ওরূপ বলো না, আমার অঙ্কশাস্ত্রে বিয়োগ নাই সব, যোগ। হারালে চল্‌বে কেন, হারাণকে আবার ধর্‌তে হবে।

অনন্ত। ও ব্রাহ্মণই বা কে, ও বিধবাই বা কে, ও পরমাসুন্দরী কন্যাই বা কে, এদের সঙ্গে প্রাণেশ জুটলোই বা কিরূপে!

করুণা চুপে চুপে বলিল "কি—রূ—পে, ঐ রূপেই হয়ত মজাইয়াছে।"

অনন্ত করুণার কাণে কাণে বলিল—"রূপে মজিলে প্রাণেশ, ব্রজেন্দ্র বাবুর মেয়েকে এমন ভালবাসিত না।"

করুণা অনন্তের কাণে কাণে "রূপ না থাকলেও মেয়েটীর লাবণ্য আছে।"

হরেন্দ্র পুস্তক পড়িতেছিল, সে মাথা তুলিয়া বলিল "আমি সব শুনতে পাচ্ছি—

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা,
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।

দাদা ম'শায়। ও সব কাণা কাণি, মল্লিনাথের টীকা টিপ্পনী, থাক্। মূল কথা।

হরেন্দ্র। তবে কি ভাগাকুল ব'লে ছুটবো।

দাদা ম'শায়। তুমি গেলে তোমার পড়া বন্ধ হবে। তোমার যেয়ে কাজ নাই। দেখি, ব্রজেন্দ্র বাবুকে বুঝি।

তাহাই স্থির হইল; তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। অধিবেশনের অবসানে নিয়ম—কোন দিন বায়রণের Isles of Greece আবৃত্তি, কোন দিন আনন্দমঠের বন্দে মাতরং গান, কোন দিন কমলাকান্তের দুর্গোৎসবের অভিনয় হয়; ইত্যাদি।

অনন্তের গলা অতি মিষ্ট। অনন্ত মধুর কণ্ঠে তন্ময় হইয়া গাইল—

বন্দে মাতরং

নীরব নিশীথে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের মুক্ত পুলকিত জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

গান সমাপ্ত হইতে না হইতে দাদা ম'শায় বলিলেন, "অনন্ত ইস্‌মাইলকে আলিঙ্গন কর।" মুহূ

অনন্ত ইস্‌মাইলকে কোল দিল, ইস্‌মাইলের টুপী আপন মাথায় তুলিয়া লইল; ইস্‌মাইল অনন্তের উপবীত গলায় পরিল, বলিল—"আজ হইতে তোমরা আমাকে ইস্‌মাইল বন্দ্যোপাধ্যায় বলিও।"

সকলে। বা!

একে অন্যকে, সকলে দাদা ম'শায়কে কোল দিয়া এক আনন্দের কল-কোলাহল তুলিল।

এক হৃদয় এক প্রাণ লইয়া সকলে আপন আপন বাসায় চলিয়া গেল।

ওগো মরিব, আমি মরিব।

১

ওগো মরিব, আমি মরিব!
পিশাচ সনে　সাধন রণে
নাহি ডরিব, নাহি ডরিব!
নীরব নিঝুম শ্মশান মাঝার,
গভীর নিশার নিবিড় আঁধার,

পিশাচী-ছলনা,　পিশাচী-বেদনা,
'মা ভৈঃ' বলি,
চরণে দলি,
আপন ব্রত পালিব!
মরিতে হয়, মরিব!

---

* এই কবিতাটী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "প্রবাসী"তে প্রকাশিত সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "আয়, আজি আয়, মরিবি কে" নামক সুন্দর কবিতাটীর উত্তরে লিখিত।

২

ওগো মরিব, আমি মরিব!
কণ্টক-বনে জীবন-পণে
আমি পশিব, আজি পশিব!
সকল বিপদ, সকল বিষাদ,
মানি লব মনে দেব-আশীর্ব্বাদ,
শ্বাপদের ডাক বাজাইবে শাখ—
অরাতিগণে
সমুখ রণে
বীরেরমত মরিব!
মরিতে হয়, মরিব!

৩

ওগো মরিব, আমি মরিব!
সাগর-বুকে মনের সুখে
আমি ভাসিব, একা ভাসিব!
উঠুক ঝটিকা চৌদিক বেড়িয়া,
নাচুক ঊর্ম্মি গগন চুমিয়া,
দিবস-রজনী বাহিয়ে তরণী
বিশাল সিন্ধু
সলিল-বিন্দু
পুলকে জানি তরিব!
মরিতে হয়, মরিব!

৪

ওগো মরিব, আমি মরিব!
আর্য্যের সুত গরিমাযুত
নাহি ভুলিব, নাহি ভুলিব!
আর্য্যের করম, আর্য্যের ধরম,
আর্য্যের গৌরব, আর্য্যের সরম,
চিত্ত ভরিয়া রক্ষা করিয়া
দেব-ভবনে
সংগোপনে
আপন বাস রচিব!
মরিতে হয়, মরিব!

৫

ওগো মরিব, আমি মরিব!
দেব-বালার কুসুম-হার
আমি পরিব, গলে পরিব!
জীবনের সাধ, জীবনের আশা,
পুরাইবে তারা দিয়ে ভালবাসা,
অমির ধারায় সকল হিয়ায়
চেতনা লব
ধরিয়া লব,
অমর-বেশ পরিব!
মরিতে হয়, মরিব!

৬

ওগো মরিব, আমি মরিব!
শ্মশান মাঝে সাধক-সাজে
আমি পূজিব, শ্যামা পূজিব!
বুঝি শুনা যায় মার অট্টহাসি,
শাণিত কৃপাণ উঠিছে বিকাশি'
হৃদয়-বাহিরে মরমে বাহিরে
চরণে মার
ভার্য্যা ভার
হরষে আজি সঁপিব!
মরিতে হয়, মরিব!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বন্দে মাতরম্।

মায়ের গান

(জাতীয় সঙ্গীত)

সঙ্গীত মানব হৃদয়ে অপরিসীম উন্মাদনার সৃজন করিয়া দেয়। অবিরাম পরিশ্রম ও কালি কাগজ ব্যয় করিয়া, বাগ্মী নিরবচ্ছিন্ন বক্তৃতার [illegible] মেদেনী কাঁপাইয়া তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে যে কাজ সংসাধন করিতে পারেন [illegible] সুগায়ক সঙ্গীতের সাহায্যে এক মুহূর্ত্তে তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন; এরূপ দৃ[illegible] বিরল নহে। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে লোকের প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগাই[illegible] তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে লেখ[illegible] শক্তিশালিনী লেখনী, বাগ্মীর বজ্রনাদী কণ্ঠ প্রতিনিয়তই কার্য্য করিতেছে [illegible] আমাদের বিশ্বাস এ ক্ষেত্রেও সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা অধিক—কারণ সঙ্গী[illegible] প্রাণের ভাষায় কথা কয়।

বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমতঃ কয়ে[illegible] জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া "মায়ের গান" নামক সঙ্গীত পুস্তকের প্রচার ক[illegible] বিধাতা বাঙ্গালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, বাঙ্গালী জাগিয়াছে—বাঙ্গালী আ[illegible] মাকে চিনিয়াছে, তাই দেড় মাসের ভিতরে উপর্য্যুপরি "মায়ের গান" চারিটী সংস্করণ সম্পাদন করিয়াও আমরা গ্রন্থগ্রহণেচ্ছু সকল ব্যক্তিকে গ্রন্থ [illegible] উঠিতে পারি নাই। লোকের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবার পঞ্চম সংস্ক[illegible] ৫০০০ গ্রন্থ ছাপান হইতেছে। "মায়ের গানে" নিম্নলিখিত দেশপ্রসিদ্ধ মাতৃ[illegible] চিন্তাশীল মহাত্মাগণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতগুলি স্থান প্রাপ্ত হইয়া[illegible]

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিপিনচন্দ্র পাল
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠা[illegible]
[illegible]পহরণ ব[illegible]

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

" কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

" রজনীকান্ত সেন

" প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ঁ মনোমোহন বসু

শ্রীমতী সরলাদেবী প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাতনামা লেখকের অনেক পরিচিত সঙ্গীতও "মায়ের ...এ সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটী অতি মনোরোম গ্রাম্য-সঙ্গীত ...হইয়াছে। যাঁহারা "মায়ের গান" লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর ... কারণ প্রতিদিন অসংখ্য গ্রাহক আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন ... অর্ডার পাঠাইতেছেন। বিলম্ব করিলে নিরাশ হইবেন। ঁশারদীয় পূজার ... গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ সাধন অসম্ভব।

মূল্য এক আনা।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেড় আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

প্রতি শত পাঁচ টাকায় পাইবেন। ৫ আনার কম ভিঃ পিঃ হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে, ময়মনসিংহের পল্লীগ্রামে অনেক ...তন স্বদেশী সঙ্গীত গীত হইতে শুনা যায়। উক্ত সঙ্গীতগুলির রচয়িতা অর্দ্ধ-...শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত কৃষক-সমাজ। সরলপ্রাণের সরলভাব উক্ত গ্রাম্যগীতি...লিতে অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। মাঠে হাল চষিতে চষিতে কৃষকগণ যখন দল ...বাঁধিয়া উক্ত সঙ্গীতগুলিতে স্বর-যোজনা করিতে থাকে তখন প্রাণে এক ...ভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। ...ান বস্তুতই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ...লিতে ইচ্ছা হয় "কে বলে মা তুমি অবলে, বহুবল ধারিণীং"। আমরা বহু যত্নে ...ঠের কৃষকগণের মুখ হইতে সে সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি এবং ...হারা "স্বদেশী-পল্লী-সঙ্গীত" নামাকারে দ্বিতীয় গ্রন্থ-প্রচারে উদ্যত হইয়াছি।

উক্ত গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

প্রকাশক

শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত

সুহৃদ্ যন্ত্র, ময়মনসিংহ।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, আষাঢ় ১৩১৩। } ষষ্ঠ সংখ্যা।

ভূরশুট রাজ্য।

প্রাচীনকালে যে সকল পরাক্রমী ও ঐশ্বর্য্যশালী বাঙ্গালীর বিস্তৃত সম্পত্তি, জমিদারী এবং রাজত্ব কালপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ভূরশুট-রাজ্য তাহাদের অন্যতম। বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্থান ভূরশুট পরগণা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, মুসলমান শাসন সময়ে তাহা সুবিস্তৃত ভূভাগকে অধিকার করিয়া একটা ক্ষমতাশালী ও সুপ্রশস্ত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই প্রসিদ্ধ পরগণায় ১৫৩ খানি সমৃদ্ধ সম্পন্ন গ্রাম এবং প্রায় দুইশত ক্ষুদ্রপল্লী সংযুক্ত ছিল। হাবড়া জেলার আমতা গ্রামের নিকট বসন্তপুর হইতে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া গ্রাম পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ভূরশুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরগাণার একদিক পেঁড়ো এবং অন্যদিক পেঁড়ো নামে খ্যাত; দুইদিকেই এক নামের দুইটি গ্রাম অবস্থিত। এক্ষণে পেঁড়ো নামে যে স্থানটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে একটা ষ্টেশন বলিয়া পরিচিত, তাহা এক সময়ে মুসলমানদিগের প্রবল প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল; হিন্দুরা ইহাদের নানাবি অত্যাচারে সশঙ্কিত থাকিত। অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হইত না। এখনও হাটে বাজারে মুসলমানের প্রতি সপ্তাহে গো-হত্যা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইংরেজশাসনে মুসলমানে আর সে প্রভুত্ব বা ধন-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং ধার্ম্মিক হিন্দু এখন নিরাপদ। পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো উপনগরে যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও মসিদ ইত্যাদি দেখিতে পা যায় তাহা হিন্দু-রাজাদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি; এক সময়ে এইগুলি ধর্ম্মপরা হিন্দুর দেবালয় ও সাধুর আশ্রমরূপে ব্যবহৃত হইত। মুসলমানেরা বলপূ নিরীহ হিন্দুর হস্ত হইতে এইগুলি অপহরণ করিয়া মসিদ ও আজান্-মিং

পরিণত করিয়াছে। বারদ্বারীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এখনও অতি পরিষ্কার রূপে স্তম্ভসমূহের গাত্রে মহাদেব, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী মাহানাদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে পাণ্ডব শেখর নামে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন. বর্ত্তমান পেঁড়ো তাঁহারই রাজ্যভুক্ত ছিল। যবনেরা তাঁহাকে সংহার, পুস্তকালয় দাহন, প্রাসাদে অগ্নিপ্রদান এবং মন্দিরসমূহ ভগ্ন করিয়া দিয়া ঐ রাজত্ব অধিকার করে। ঐ রাজার নামে এই রাজ্য পাণ্ডুয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমতা একটী মহকুমা। আমতার নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর নামক গ্রামে এখনও প্রাচীন দুর্গের (গড়ের) নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, উভয়দিকের সীমা মধ্যে যে বিস্তৃত রাজত্ব বা জমিদারী ছিল তাহাই একদা ভুরশুটরাজ্য বলিয়া সম্বোধিত হইত। ভুরশুট-রাজবংশে অনেক প্রখ্যাত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ভুরশুট রাজবংশে বঙ্গভাষার গৌরব এবং বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ কবিবর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কুলগত উপাধি মুখোপাধ্যায়, গোত্র ভরদ্বাজ। কুলের মুখুটি। আদিপুরুষ হইতে বংশাবলী সম্পূর্ণভাবে লিখিত হইলে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামের "মুখোপাধ্যায়" উপাধিধারী সুবিখ্যাত জমিদারগণ এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (কাশ্মীররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী), মিষ্টার ঋষিবর মুখোপাধ্যায় (প্রধান জজ, কাশ্মীররাজ্য), কবিবর কৃত্তিবাস ওঝা (রামায়ণ প্রণেতা) এবং চুঁচুড়ার বিখ্যাত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, প্রভৃতি এই বংশসম্ভূত। আমরা এস্থলে কেবল ভুরশুট পরগণার রাজাদিগের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। আদিপুরুষ ভূসিংহ, ইঁহার পুত্র মুরারি ওঝা। মুরারি ওঝা শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন বিংশ-পুরুষ এবং উৎসাহ দেব হইতে ৭ম পুরুষ। মুরারির পুত্র ভৈরব, শৌরি, মদন অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও ব্যাস। এই কয়েক পুত্রের মধ্যে বনমালীর সন্তানের নাম কৃত্তিবাস ওঝা, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। একমাত্র বাঙ্গালা রামায়ণ ইঁহারই প্রণীত। এই সুমধুর ও সুপরিচিত বাঙ্গালা রামায়ণ দেশের যে কত প্রকার মহোপকার সাধন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বনমালীর সহোদরের নাম মদন, ইঁহারই বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ইঁহারই বংশসম্ভূত পুরুষদিগের এস্থলে নাম দেওয়া গেল। মদনের পুত্র

রাঘব, তস্য সুত দেবানন্দ, তাঁহার পুত্র প্রয়াগ তস্য সন্তান জগদীশ, ইঁহার সুত গোপাল, গোপালের পুত্র রামনারায়ণ, ইঁহার সন্তান রামকান্ত, ইঁহার পুত্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মুখোপাধ্যায়), তস্য সন্তান কবিবর ভারতচন্দ্র। রামকান্ত সর্ব্বপ্রথমে ভূমিপাল, ভূপতি, ভূপাল ও রাজা উপাধি গ্রহণ করেন, এই জন্য রামকান্ত রায় "ভূপতি রায়" বলিয়াও খ্যাত হইয়াছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের পুত্রগণ মধ্যে ভগবতীচরণ ও রামতনু প্রসিদ্ধ। ভগবতী নিঃসন্তান, রামতনু-পুত্র তারকনাথ তস্য সুত অমরনাথ তাঁহার সন্তান পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। কবিবর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময় হইতে চব্বিশ-পরগণান্তর্গত মুলাযোড় গ্রামের ভাগিরথী তটে ইঁহাদের বসতি হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের জন্মবর্ষ ১৬৩৪ শক, ১১১৯ সাল। কবিকেশরী ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, সত্যপীরের কথা, সত্যনারায়ণের কথা, নাগাষ্টকম্ প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা এবং বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক, গান, পদ্য ইত্যাদি বিরচণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সমাজকে সজীব রাখিয়াছেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর অতুলনীয় কাব্য। কবিবর ভারতচন্দ্র হিন্দি, পারস্য, আরবী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ সন্তান, অপর তিন সহোদরের নাম চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন ও দয়ারাম।

কবিবরের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীমৎ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের জননীকে বিবাদসূত্রে কটূক্তি করায় বর্দ্ধমানের সেনারা মহারাজাজ্ঞানুসারে নরেন্দ্রনারায়ণের দুর্গ ও প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়, মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুর পল্লীর নিকট নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন; ঐ গ্রামের নিকট সারদা গ্রামের আচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার পারস্যভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা হইয়াছিল। ঐ গ্রামের সুযোগ্য জমিদার শ্রীমৎ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয় তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং বিশিষ্ট সহায় ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া ভারতচন্দ্রের পিতা (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ) হীনাবস্থায় পতিত হয়েন, এজন্য কবিবরকে অনেকপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ক্রমে ভারতচন্দ্র রায় বর্দ্ধমানের মহারাজার কর্ম্মচারিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া রাজবাটীতে আগমন পূর্ব্বক পৈত্রিক সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিতে

সমর্থ হয়েন, কিন্তু ভ্রাতারা নিয়মিতরূপে মহারাজার শুল্ক প্রদানে অশক্ত হওয়ায় বর্দ্ধমানের মহারাজা ইঁহাদের অনেক ইজারা খাসভুক্ত করিয়া লয়েন, ভারতচন্দ্র ইহাতে আপত্তি করায় কারাগারে আবদ্ধ হয়েন। কৌশলে কারাগার হইতে তিনি মুক্ত হইয়া কটক, পুরীধাম, বৃন্দাবন, কাশীধাম, প্রয়াগ এবং হুগলী জেলান্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণে মনুষ্যেরা বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ হয়; ভারতচন্দ্রও নানা ভাষা, নানা শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া বহুদর্শী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। Travels complete education অর্থাৎ ভ্রমণে বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে পরিব্রজন নিতান্ত আবশ্যক।

এই সময়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান "শ্রোত্রিয় পালধি" বংশীয় বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান (গোঁদলপাড়া নিবাসী) বাবু রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কবিবরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সুপারিশে ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই রাজবাটীতেই তাঁহার উন্নতি, প্রখ্যাতি, দেশব্যাপী সুখ্যাতি এবং অমরকীর্ত্তি স্থাপনের উপায় নির্ণীত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্র মুলাযোড়ে বাস করিয়াও নিরাপদ ছিলেন না, সেখানেও বর্দ্ধমানের রাজবাটীর লোকেরা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ বর্দ্ধমানের মহারাজাদিগের সহিত কলহ করায় ভূরশুট পরগণার রাজগণও তাঁহাদের রাজস্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মহাকবি ভারতচন্দ্র গুণাকর ১১৬৭ সালে (১৬৮২ শকাব্দে) ৪৮ বর্ষ বয়ক্রমকালে বহুমূত্ররোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রণীত সুবিখ্যাত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ১৬৭৪ শকে বিরচিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি "চণ্ডী নাটক" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"এই ত্রিলোক সংসার সমস্তই আমার অধীন, সমস্ত দেবতারাও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সমস্ত দেবগণের যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আমিই ভোগ করিয়া থাকি। ত্রিভুবনে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠরত্ন আছে সে সমস্ত এবং গজরত্ন ঐরাবতও আমারই অধীন। ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন যাহা দেবেন্দ্রের বাহনরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, দেবগণ তাহাও প্রণিপাত পূর্ব্বক আমাকেই অর্পণ করিয়াছে। হে শোভনে! আমি আর অধিক কি বলিব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতির যাহা যাহা শ্রেষ্ঠরত্ন ছিল, সম্প্রতি সে সমস্তই নতশিরে আমাকে অর্পণ করিয়াছে। হে দেবি! এক্ষণ আমরাই সর্ব্বপ্রকার রত্নের উপভোক্তা এবং তোমাকে আমরা ত্রিলোক মধ্যে স্ত্রীরত্নভূতা বলিয়া মনে করি, অতএব (স্ত্রীরত্নস্বরূপা) তুমি আমাদিগকে আশ্রয় কর। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তুমি যখন স্ত্রীরত্নস্বরূপা তখন তুমি আমাকে অথবা আমার অনুজ অতুল পরাক্রমশালী নিশুম্ভকে ভজনা কর। তুমি আমাদিগকে ভজনা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইবে। ইহা মনে মনে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া আমাদিগের মধ্যে একজনকে পতিরূপে গ্রহণ কর।"

কি অসাধারণ গর্ব্ব! যদিও সমস্তই সত্য বটে, তথাপি এরূপ আত্মাভিমান আসুরিক ভাবেরই পরিচায়ক। এরূপ আত্মশ্লাঘা নিতান্ত পাপাবহ, এবং এইরূপ গর্ব্বই পতনের কারণ। দেবী দূতের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন :—

হে দূত! তুমি যে বলিলে, "শুম্ভ ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং নিশুম্ভও তৎসদৃশ"; সে সমস্তই সত্য, তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। কিন্তু আমি যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিরূপে তাহার অন্যথা করিব? আমি অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। "যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে, যে আমার দর্প চূর্ণ করিবে, সংগ্রামে যে আমার তুল্য বলশালী হইবে, সেই আমার ভর্ত্তা হইবে। অতএব মহাবলশালী শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ এখানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে জয় করিয়া অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করু।"

দেবীর এইরূপ গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া দূত বিস্মিত হইয়া কহিল,—

"ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা স্তস্থুর্যেষাং রণেঽগ্রতঃ।

শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখং॥"

ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না, তুমি অবলা হইয়া সেই শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত সংগ্রামের বাসনা করিতেছ?

তথাপি দেবী বলিলেন —

"কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা।"

আমি পূর্ব্বে যখন আলোচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কি করিব।

তখন দূত অমর্ষপূরিত চিত্তে দৈত্যরাজ শুম্ভের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" (গীতা)

"বাসনা চরিতার্থ না হইলেই ক্রোধের উদয় হয়।" দূতের এইরূপ বাক্য শ্রবণে অসুরেশ্বর শুম্ভ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলেন,—

"হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্য পরিবারিতঃ

তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণ বিহ্বলাং।"

হে ধূম্রলোচন! তুমি সত্বর নিজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্তা রমণীকে বলদ্বারা কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নিপীড়িত করিয়া (আমার নিকট) আনয়ন কর।

"তৎ পরিত্রাণদঃ কশ্চিৎ যদি বা তিষ্ঠতেঽপরঃ।

স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষ গন্ধর্ব্ব এব বা॥

যদি সেই দুষ্টা রমণীর পরিত্রাণকর্ত্তা কেহ থাকে, তবে সে দেব হউক, যক্ষ হউক, গন্ধর্ব্ব হউক তাহাকে বধ করিবে।

অনন্তর দৈত্যেশ্বর শুম্ভের আদেশে ধূম্রলোচন দেবীর নিকট যাইয়া, কর্কশ-ভাবে শুম্ভের আদেশ জানাইল, দেবী প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, ধূম্রলোচন দেবীর প্রতি ধাবমান হইল। দেবী অমনি হুঙ্কারদ্বারা তাহাকে ভস্ম করিলেন। অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্র দেবীর ক্রোধাগ্নিতে ধূম্রলোচন পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। তৎপর ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্যও সমরে নিহত হইল। দৈত্যাধিপতি শুম্ভ সসৈন্যে ধূম্রলোচনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন।

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ।" (গীতা)

"ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্যতা) জন্মে।" ক্রোধের আতিশয্যে দৈত্যেশ্বর শুম্ভ কার্য্যাকার্য্য বিবেক পরিশূন্য হইলেন।

তখন চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাপরাক্রমশালী অসুরদ্বয়কে আজ্ঞা করিলেন,—হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে গমন কর, এবং তথায় যাইয়া সেই রমণীকে শীঘ্র আনয়ন কর। তাহাকে কেশাকর্ষণ অথবা বন্ধন করিয়া আনিবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা তাহাকে প্রহার করিবে, এবং যখন সেই দুষ্টা রমণী মৃতপ্রায় হয়, তখন তাহার সিংহকে বিনাশ করিয়া ঐ অম্বিকাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসিবে।

রমণীর প্রতি এইরূপ বলপ্রকাশ যে নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য, তাহা আর অধিক বলিতে হইবে না। অথচ দেবগণ যাহার নিকট পরাভূত তাহাকে দমন। করিবার ও অন্য উপায় নাই। সুতরাং

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" ইত্যাদি।

ভগবদ্বাক্যানুসারে অধর্ম্মের বা দুষ্ক্রিয়াশক্তের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন বা সাধুদিগের পরিত্রাণ জন্য ঐশীশক্তির আবির্ভাব (অবতারের) প্রয়োজন চণ্ডীতেও "ইত্থং যদা যদা বাধা"—ইত্যাদি পরমেশ্বরীর বাক্যানুসারেও ঐশীশক্তি আবির্ভাবের আবশ্যকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

শুম্ভাসুরের আজ্ঞানুসারে চণ্ড-মুণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল মসী (সেফালিকা পুষ্পের বৃন্তের ন্যায়) বর্ণ হইল, এবং তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে ললাটফলক হইতে করালবদনা "কালী" বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। যথা—

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা নরমালা বিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা।
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বা ললন ভীষণা॥
নিমগ্না-রক্ত নয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা॥"

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিতা কালীর এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণন শুনিয়া কেহ কেহ হয়-ত কালীকে আদিমকালের ঘোর অসভ্যা পার্ব্বত্য-নারী বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করিতে পারেন, এবং—

"সা বেগেনাভি পতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীনামভক্ষয়ত তদ্বলং॥

সেই মহাভীমা কালী অসুরসৈন্য মধ্যে অতি বেগে আগতিতা হইয়া মহাসুরদিগকে আহত করিতে করিতে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ নরমাংস ভক্ষণদ্বারা আদিম অসভ্যতা প্রতিপন্নের আরও সুযোগ পাইতে পারেন। কিন্তু যদি নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা যায়, তবে বুঝিতে পারিবেন এ "কালী" সামান্যা রমণী নহেন, ইনি লোকক্ষয়কর মহাকাল শক্তিভূতা সংহাররূপিণী "কালী"। গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ বর্ণন উপলক্ষে যে,—

"ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশাল-নেত্রং।
দৃষ্টাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমস্তান্ বদনৈর্জ্জলদ্ভিঃ॥"

এবম্ভূত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার একি রূপ? তখন ভগবান্ উত্তর করিলেন,—

"কালোঽস্মি লোক ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আমি লোকক্ষয়কারী কালস্বরূপ, সম্প্রতি আমি দুষ্ক্রিয়াশক্ত লোক সকল সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণ বুঝিতে পারিবে এই করালবদনাও সেই লোকক্ষয়কারী কালের শক্তিভূতা—কালোদ্ভবা,—"কালী"।

বিশ্বরূপের কালানল সন্নিভ করালবদনে যেমন,—

"যথা প্রদীপ্ত জ্বলনং পতঙ্গা।
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগা॥
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥"

পতঙ্গগণ যেমন মরণের জন্য অতিবেগে ধাবিত হইয়া প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই দুষ্ক্রিয়াশক্ত লোক সকল মরণের নিমিত্ত অতিবেগে তোমার করাল-মুখ বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে।

এ স্থলেও সেইরূপ কালী,—

"পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশ গ্রাহী যোধ ঘণ্টা সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈক হস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥

তথৈব যোধসঙ্ঘৈশ্চ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ন্ত্যতি ভৈরবং॥"

করালবদনা কালী পার্শ্বরক্ষক হস্তিপক যোদ্ধা এবং ঘণ্টাদি সমন্বিত হস্তী সকল একহস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং অপর হস্তে সারথিসহ রথ, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী গ্রহণপূর্ব্বক বদনে নিক্ষেপ করিয়া দন্তদ্বারা অতি ভীষণরূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

এ কি, সাধারণ নারীর কার্য্য? এ সেই মহাকালের করাল বক্ত্র। এ সেই কালরূপিণী কালী দুষ্কৃতের বিনাশার্থ ঐশীশক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া কালপূর্ণ অসুরগণকে হস্তী, অশ্ব, রথাদি সহ মহাকালের করালবক্ত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রলয়ঙ্কর মহাহবে সংহাররূপিণী ঐশীশক্তির রণরঙ্গিনী চামুণ্ডাবেশে তাণ্ডব নৃত্য হৃদয়ঙ্গম করা ভক্ত-ভাবুকের কার্য্য। সাধারণ দৃষ্টিতে কালীরূপ যে, আদিম অসভ্য নগ্ন-রাক্ষসী ভাবাপন্না নারীর কল্পনা আনয়ন করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

চন্দ্রগুপ্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে কোশলরাজ্য মহাপরাক্রম শক্তিরূপে বিখ্যাত হয়। এই সময় কোশলরাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশলের শাসনাধীনে উন্নতির সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। মহাকোশলরাজ্য এক-দিকে গিরিপ্রান্ত হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত, অপরদিকে—পশ্চিমে কোশল এবং রামগঙ্গা নদীতীর ও পূর্ব্বগণ্ডক পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণে কতিপয় ক্ষুদ্র নরপতি স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতেন। পূর্ব্বকোশল বহুকাল শকদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে কিন্তু ক্ষমতাশালী লিচ্ছবিগণের প্রতিবন্ধকতায় উত্তরকালে উন্নতিলাভে অক্ষম হয়। ইহার দক্ষিণদিকে মগধ এবং চম্পা নামক দুইটী ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। মহাত্মা গৌতম-বুদ্ধের বাল্যকালে মগধগণ শেষ সংগ্রামে জয়লাভ করায় এই কলহের চিরসমাপ্তি ঘটে। ভারতের সুদূর দক্ষিণপূর্ব্বে এই নূতন নক্ষত্রের অভ্যুদয় ব্যাপার আলোচনা করিলে নানা নয়ন-মনোহারী চিত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই নবশক্তির অভ্যুদয় ও বিস্তৃতি বিষয়ে যোগীন্দ্রনিগের বিস্তৃতারণ্যে

বিবরণী ও "Ceylon Chronicles"এ অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, মগধরাজ যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেন। মগধের অভ্যুদয়েই কোশল-রাজ্যের অবনতি সূচিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম-কোশলে মগধের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। দূরবর্ত্তী পঞ্জাব ও উজ্জয়িনী প্রদেশও মগধরাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকর্ত্তৃক শাসিত হইত। ভারতের এই সময়ের ইতিহাসে প্রথম দেখা যায় যে, আফগানিস্থান হইতে আর্য্যভূমিতে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বাভি-মুখীন বঙ্গদেশ এবং হিমালয় হইতে মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত এইবিস্তীর্ণ ভূভাগ একচ্ছত্র শাসনাধীন হয়। মগধরাজ্য কীকট দেশ নামেও পরিচিত ছিল। মহাভারতে মগধ ও কোশল সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়,—

ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ।

অর্দ্ধোক্তাঃ কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্যাঃ কৃৎস্নানুশাসনাঃ ॥ ৮। ৪৫। ৪৮'

আসিরিয়া এবং মিশরের ন্যায় ভারতের সমস্ত প্রাচীন রাজধানীগুলির ভূ-বক্ষ উত্তমরূপে খনন করিয়া না দেখা পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না, কিরূপে এই মহান্ পরিবর্ত্তন প্রকৃত প্রস্তাবে সংগঠিত হইয়াছে। পরি-বর্ত্তনের ক্রম ও কারণ সমূহ অপরিজ্ঞাত হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐরূপ পরিবর্ত্তন ব্যাপার প্রকৃতই সংঘটিত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণী বহুদিন হইল বিস্মৃতির অঙ্কে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে স্থলবিশেষে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সোয়ানবেক (Schwanbeck) মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ম্যাক্রিণ্ডেল (Mecrindle) সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ Ancient India গ্রন্থে অনূদিত হয়। গ্রন্থকারগণের উদ্ধৃত এই সকল অংশগুলির প্রতি নিঃসন্দেহে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা মেগাস্থিনিসের নিজের লিখিত কি না তৎসম্বন্ধেও ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে গ্রীক্ পর্য্যটক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বহুকাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া নানারূপ প্রত্যক্ষ ও জনশ্রুতিমূলক এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সকল কথা সত্য বলিয়া সুধী-সমাজে গৃহীত হয় নাই। গ্রীক্ পণ্ডিতগণও মেগাস্থিনিসের বিবরণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতে তিন বিঘত পরিমাণ উচ্চ মনুষ্য আছে, ইহাদের কাহারো কাহারো নাসিকা নাই, নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত মুখের উপরিভাগে দুইটী ছিদ্র

মাত্র আছে। হোমরের বর্ণনানুসারে এই তিন বিঘত মনুষ্যের বিরুদ্ধে ক্রেণ ও পাটিজ পক্ষীরা যুদ্ধ করিত। কারণ উহারা ইহাদের ডিম্ব বিনাশ করে। মেগাস্থিনিসের এই সকল কথা কি বিশ্বাস্য? কেহ কি বলিতে পারেন তিন বিঘত উচ্চ মনুষ্য সত্য সত্যই ভারতে বাস করিত? তৎপর আপাদলম্বিত কর্ণ বিশিষ্ট ইন্‌টকোইটাই জাতি, অশ্ব হইতেও দ্রুতগমনশীল; অকুকাভিজ জাতি, কুকুরের ন্যায় কর্ণ বিশিষ্ট মনুস্যাটাই জাতি, নাসাগ্র বর্জ্জিত অমুকটারিজ প্রভৃতি অদ্ভুত মনুষ্যজাতির বিবরণ এবং স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা প্রভৃতি নানা অদ্ভুত পশুপক্ষীর বিবরণও তুল্যরূপে অবিশ্বাস্য। Strabo এই সকল বিষয় একবারে রচা কথা বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎ স্বত্ত্বেও ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার মূল্য সামান্য নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচুর অদ্ভুত বিবরণের মধ্য হইতে এই ঐতিহাসিক বিবরণ উদ্ধার করিতে পারিলে, তাহা হইতে নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। মেগাস্থিনিস মগধ-রাজধানী পাটলিপুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরীর নাম পালিব্রোথা—এরণোবস্ (Erannoboas) ও গঙ্গার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এই নগরী দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টেডিয়া (প্রায় দশ মাইল; এক ষ্টেডিয়াতে ২২২ গজ হয়) এবং প্রস্থে পনর ষ্টেডিয়া (প্রায় দুই মাইল) ছয় শত ফিট প্রস্থে এবং ত্রিশ হস্ত গভীর একটী পরিখা দ্বারা এই নগরীর চতুঃপার্শ্ব পরিবেষ্টিত এবং উহার চারিদিকে ৫৭০টি গম্বুজ (tower) ৬৪টি তোরণ-দ্বার ছিল। মেগাস্থিনিস আর একটী আশ্চর্য্যকর কথা বলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীই স্বাধীন, তাহাদের মধ্যে একজনও ক্রীতদাস নাই।

৩০০ খৃষ্টাব্দের পাটলিপুত্রের এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়। রিজ ডেভিড্‌স্ মহোদয় তাঁহার নবপ্রচারিত Buddhist India নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"The number of towers allows one to every seventy five yards, so that archers, in the towers, could cover the space intervening between any two. The number of gates would allow one to each 660 yards, which is quite a probable and and convenient distance. The extent of the fortifications is indeed prodigious."

ভারতবাসীর ধারণা যে, তাহাদের প্রাচীন নগরাদি বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পোষকতায় যখন প্রমাণেরও অভাব নাই তখন পাটলিপুত্রের আকার

ও প্রাকার সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু দাসপ্রথা সম্বন্ধে পর্য্যটকের উক্তিটির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে মন অগ্রসর হয় না। কারণ নানা প্রমাণ পরম্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালের দাসপ্রথা ভারতবর্ষের একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু গ্রীক্ লেখক যখন ইহার বিপরীত উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, মেগাস্থিনিসের সময় ভারতবর্ষে যে ভাবে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়াছিল। যে সময়ে লেখকের স্বদেশ, গ্রীসে দাসপ্রথা প্রবলবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, সে সময়ে ভারতের দাসপ্রথা কেন যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাহা বুঝা যায় না *। মেগাস্থিনিসের এবম্প্রকার বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেন নাই। আমাদের এইরূপ অনুমানের আর একটী কারণ এই যে, তিনি ভারতীয়গণকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই যে,—ভারতীয় মূর্ত্তিপূজকদিগের সংখ্যা মুসলমানগণের ৫। ৬ গুণ বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিপুল জনসঙ্ঘ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকর্ত্তৃক শাসিত হয় এবং সহজেই মুসলমান নরপতিগণের প্রাধান্য স্বীকার করে। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে, জাতীয় কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাহারা আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপে পরস্পর হইতে বিভিন্ন এবং পরস্পরে ঐক্যবিহীন, তখন সে আশ্চর্য্যভাব তিরোহিত হয়। * * * লোকে সাধারণতঃ ৭২টি জাতির কথা বলিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের সাতটি প্রধান। যথা,—(১) দার্শনিক পণ্ডিত, (২) কৃষকশ্রেণী, (৩) পশুপালক, (৪) শিল্পব্যবসায়ী; (৫) যুদ্ধব্যবসায়ী; (৬) গুপ্তচর বা পরিদর্শকশ্রেণী এবং মন্ত্রীমণ্ডলী। মেগাস্থিনিস কার্য্যক্ষেত্রে ভারতবাসীকে যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই সাতটিজাতি কল্পনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ভারতের জন্মগত এই যে চতুর্ব্বর্ণ, মেগাস্থিনিসের নিকট তাহা

---

* প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকা স্বত্বেও যে তাহা বিদেশী ভ্রমণকারিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই তাহার কারণ ভারতবাসীরা দাসদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত না; তাহাদিগকে আপন পরিবারের লোকের ন্যায় সস্নেহে পালন করিত। তজ্জন্য বিদেশী ভ্রমণকারীরা তৎকালে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়া মনে করিয়াছেন।
Vide R. C. Dutt's History of Ancient India আঃ সঃ।

ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বশ্রেণীর বাহিরের লোকের সহিত কেহ উদ্বাহ করিতে এবং স্ব-ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকারী নহে *। যেমন সৈনিক-ব্যবসায়ী পুরুষ কখনও কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে বা শিল্প ব্যবসায়ী কখনও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না।" বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে কাহারও প্রতি বাণিজ্যের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও প্রতি সৈনিক বিভাগের ভারার্পিত হয়। তাহাদের কেহ নদ-নদী পরিদর্শন, মিশর দেশের ভূমি পরিমাপের ন্যায় জমি মাপ করিতেন এবং কেহ বা জল নির্গমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা পরিদর্শন ও সকল শাখাপথে যাহাতে সমান জল যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

তাহাদের প্রতিই শিকারিগণের (সম্ভবতঃ রাজানুগৃহীত শিকারী) তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া তদনুসারে পুরস্কৃত করিবার ভার অর্পিত ছিল। ইহারা রাজস্ব আদায় এবং ছুত্রধর, সূত্রধর, লৌহকার ও খনিজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যবসায়িগণের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। ইহারা রাজপথ নির্ম্মাণ এবং প্রত্যেক দশ ষ্টেডিয়া পর পর একটী করিয়া পথ প্রদর্শক ও দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ স্থাপন করিতেন।

যাহাদের প্রতি নাগরিক বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, তাহারা ছয় দলে বিভক্ত, এক এক দলে পাঁচজন করিয়া লোক থাকিত। প্রথম দলের সভ্যগণ প্রধানতঃ দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। দ্বিতীয়-দল বিদেশীয় আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনাদি করিত। আগন্তুকগণের অবস্থানের যে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাও আমাদের মনে হয় না। কারণ প্রসঙ্গক্রমে তিনি স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, লোকে ৭২টি জাতির কথা বলিয়া থাকিলেও আমি তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নিকট শুনিয়াছি যে তাহারা প্রধানতঃ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত। এই মূল চারি শাখা হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন চতুর্ব্বর্ণ সম্বন্ধে তিনি আর কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার কল্পিত জাতি সাতটির মধ্যে একবর্ণ একাধিকবার গণিত হইয়াছে। এই সপ্তজাতির

* Strabo-এর গ্রন্থে মেগাস্থিনিসের এই উক্তি এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে;—'No one is allowed to marry out of his own class, or to exchange one profession for another, or to follow more than one business. An exception is made in favour of the philosopher, who for his virtue is allowed this privilege.' XV. 49.

নিমিত্ত বাসস্থান প্রদান এবং সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত ভৃত্যাদি নিয়োগ করিত। তাহারা দেশে ফিরিবার সময় তাহাদের সঙ্গে প্রহরী বা পথপ্রদর্শক দেওয়া হইত। কোনও আগন্তুকের মৃত্যু হইলে, তাহার বিষয় সম্পত্তি তাহার আত্মীয়ের নিকট প্রেরিত হইত। তাহাদের পীড়ার সময় রীতিমত সেবাশুশ্রূষা করা এবং মৃত্যু হইলে সমাধিস্থ করাও এই দলের কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় দল অধিবাসিগণের জন্ম মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করিত। করধার্য্যের নিমিত্ত যে এই তালিকা সংগৃহীত হইত তাহা নহে। মহৎ, নীচ যে ব্যক্তিই মরুক না কেন তাহার মৃত্যুসংবাদ রাজ-গোচরে আনা হইত।

চতুর্থদল ব্যবসায় বাণিজ্যের তথ্য তল্লাস লইতেন। ইহারা ওজন (মান) ও পরিমাপ সংক্রান্ত কার্য্যাদি ও সাময়িক শস্য সাধারণের জ্ঞাতসারে যাহাতে বিক্রীত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন *। দ্বিগুণ কর না দিয়া কেহই দুইপ্রকার জিনিসের ব্যবসায় করিতে পারিত না।

পঞ্চমদল কলকারখানার নির্ম্মিত সমস্ত দ্রব্য সাধারণের জ্ঞাতসারে বিক্রয় করিত। নূতন ও পুরাতন জিনিস পৃথক্‌ভাবে বিক্রীত হইত, কেহ উভয় জিনিস একত্রে বিক্রয় করিলে দণ্ডার্হ হইত।

ষষ্ঠদল বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দশমাংশ রাজকরস্বরূপ আদায় করিত। প্রতারণাপূর্ব্বক কেহ এই দশমাংশ না দিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

মেগাস্থিনিস তৎপর পাটলীপুত্রের সৈন্য বিভাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও সন্দেহজনক। তিনি বলেন,—"পাটলিপুত্র-রাজের অধীনে সদা সর্ব্বদার জন্য ৬০,০০০ হাজার পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং আট হাজার রণকুঞ্জর থাকিত। এতদ্দ্বারাই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য-বৈভবের বিষয় অনুমান করা যায়।"

Pliny-ও এই বিবরণ অনুসারে লিখিয়াছেন,—ষষ্টি সহস্র পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং নয় সহস্র হস্তী পাটলিপুত্র-রাজের ছিল। শেষ সংখ্যাটি নয় হাজার কথা বোধ হয় লিপিকর-ভ্রমপ্রমাদ। Pliny তৎকালীন অপরাপর

---

* This is very obscure. The words sum to imply either that sale was usually not by private barter, but by auction, or that sales took place through advertisement. Neither of thise Statements would be correct.—Buddisht India P. 265.

ভারতীয় নরপতির সৈন্যসংখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও মেগাস্থিনিসের অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

রাজ্য	পদাতিক	অশ্বারোহী	হস্তী
কলিঙ্গ	৬০,০০০	১০,০০০	৭০০
তালুক্তা (Talukta)	৫০,০০০	৪,০০০	৭০০
আন্ধ্র	১০০,০০০	২০০০,	১০০০,

মগধরাজের পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক না থাকিলেও তাঁহার অশ্বারোহী ও রণকুঞ্জরের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং পূর্ব্বপ্রদেশে ঐরূপ হস্তী পাওয়া যাইত। তৎকালে ঐসকল প্রদেশ মগধরাজের শাসনাধীন ছিল, কাজেই তাঁহার সৈন্যবিভাগে যে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তী থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যুদ্ধকালে এইরূপ প্রভূত হস্তীর প্রচলন—মগধরাজের ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তকেই এই মহান্ মগধরাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা বোধ হয় নিরাপদ হইবে না। আলেকজেণ্ডার যখন ভারতের পশ্চমোত্তর প্রদেশ আক্রমণ করেন, তিনি তখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মগধরাজের (চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ ধাননন্দ) অধীন ২,০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ যুদ্ধরথ এবং চারিহাজার যুদ্ধ-হস্তী সজ্জিত আছে *। এই সময় নিশ্চয়ই কোশলরাজ্য এবং সম্ভবতঃ কোশলের দক্ষিণ ও পশ্চিমস্থিত রাজ্যনিচয় মগধ-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব এবং ইণ্ডাসের মোহনা পর্য্যন্ত স্বরাজ্যভুক্ত করেন। এই পঞ্জাবে থাকিয়াই তিনি আলেকজেণ্ডারের আক্রমণ হেতু, দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা দর্শন করতঃ নূতনভাবে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ধাননন্দকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। ইণ্ডাসের দক্ষিণ প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। Pliny এই সময়ের বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মগধসাম্রাজ্য নদীর (Indus) ঠিক দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত প্রদেশ পরে তাঁহার শাসনাধীন হইতে পারে। রুদ্রদামনের প্রশস্তি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের এক প্রতিনিধি দ্বারা ঐস্থান শাসিত হইত। প্রাচীন অবন্তীরাজ্য ও তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনী সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই মগধরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

* Curtius, IX. 2.

এবম্প্রকারে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকৃগণের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সেলিকিউস্ নিকেটর উন্নতির সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ভারতবর্ষে আক্রমণ করিয়া আলেকজেণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আর একটী বিভিন্ন শত্রুর সাক্ষাৎ পান। আলেকজেণ্ডার ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রাজ্যাধিপতিগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, পরস্পর পরস্পরের উন্নতিতে ঈর্ষা প্রকাশ করিত। কাজেই আলেকজেণ্ডারের বিরুদ্ধে অন্য রাজ্যাধিপতিগণ কিছুই উচ্চবাচ্য করিতেন না। সেলিকিউস্ একবারে সুপ্রতিষ্ঠিত মগধরাজ্য আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবার কল্পনা করেন কিন্তু তৎসাধন কল্পে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়। কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ইণ্ডাসের পশ্চিমের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ—এমন কি Gedrosia এবং Arachosia ও (বর্ত্তমান আফগানিস্থানের সমতুল্য) বিজেতার করে সমর্পণ করিয়া পলায়নপর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করেন। তিনি ভারতীয় বিজয়ী নরপতির করে স্বীয় দুহিতাকে সম্প্রদান করেন এবং বিনিময়ে জামাতার নিকট হইতে পাঁচশত মত্তমাতঙ্গ প্রাপ্ত হন।

ইহার পরই মেগাস্থিনিস দূতরূপে পাটলিপুত্রে গমন করেন। এই সময়ে গ্রীক্ হইতে বহু দূরবর্ত্তী—ভারতের গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরস্থ হিন্দুরাজ্যে, ব্রাহ্মণমণ্ডলীদ্বারা যে রাজ্যের ভিত্ত স্থাপন হইয়াছিল, তথায় প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে গ্রীক্ শাসনপদ্ধতি আরব্ধ হয়। তৎকালে মগধরাজ্যে নানা শ্রেণীর গ্রীক্-শিল্পী এবং গ্রীক্-রাজদুহিতার ও রাজদূতের সঙ্গে অসংখ্য গ্রীক্ অনুচর মগধরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই ভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাজ্যের মধ্যে পরিচয় লাভের সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণ লাভের মাসাধিক পূর্ব্বে তিনি পাটলিপুত্রে আগমন করেন। কিন্তু গ্রীক্ অনুচরগণ এই মহাত্মার প্রতি একবারও কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই। মেগাস্থিনিসও তাঁহার বিবরণীতে বুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত যে অত্যুজ্জ্বল কর্ম্মসাফল্যে দস্যু-সরদারের পদ হইতে ভারতের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতাশালী ও বৃহত্তর সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই ক্রম বিকাশ গ্রীক্, বৌদ্ধ ও হিন্দুসাহিত্যে জনশ্রুতির মত প্রথিত আছে।

অপরাপর ক্ষমতাশালী নরপতিগণের ন্যায় তাঁহাকেও অদৃষ্টের তীব্র বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। তাহাতেই তিনি আলেকজেণ্ডার ও Charlemagne-এর মত প্রচলিত উপন্যাসের নায়ক হইয়া আছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, সম্রাট আলফ্রেড দি গ্রেটের পলাতক ও পরাজিত অবস্থা লইয়া উপন্যাসে কি মনোরম গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে,—কৃষক রমণী ও তাহার পিষ্টকের সুধারসের সঙ্গে কি রকম ওতপ্রোতভাবে তাঁহার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও ঐরূপ একটী গল্প *Chronicle of Ceylon* এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"এক গ্রামের একটী রমণী (ইহারই উনুনের পার্শ্বে চন্দ্রগুপ্ত লুক্কাইত ছিলেন) 'চাপাখি' (পিষ্টক বিশেষ) ভাজিয়া নিজপুত্রকে আহার করিতে দেয়। পুত্র প্রথম একখানি চাপাথির মধ্যভাগটুকু খাইয়া চারিপার্শ্বের অংশগুলি ফেলিয়া দেয় এবং মাতার নিকট আর একখানি প্রার্থনা করে। এতদ্দর্শনে ও শ্রবণে জননী বলে,—"এই বালকের কার্য্যও ঠিক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণের অনুরূপ।" বালক উত্তর করে,—'কেন মা? আমি কি করিয়াছি এবং চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছেন?' মাতা উত্তর করিল,—'তুমি পিষ্টকের মধ্যভাগ খাইয়া চারিধারের অংশ ফেলিয়া দিতেছ। চন্দ্রগুপ্তও মহামহিমান্বিত নরপতি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সীমান্ত হইতে আরম্ভ না করিয়া, নগরের মধ্যদিয়া যাইবার কালে, নগরের মধ্যভাগ আক্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যদল বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা! *"

চন্দ্রগুপ্ত লুক্কাইত স্থান হইতে রমণীর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করায় উন্নতিলাভে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, সন্ধি-হত্যা, রাজদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতার মধ্যেও কূটনীতি-বিশারদ সুপণ্ডিত চাণক্যের উপদেশানুযায়ী চালিত হইয়া উত্তরোত্তর যশঃ সৌভাগ্য লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তের অদ্ভুত প্রকৃতি জীবজন্তুর প্রতিও কিরূপ কার্য্যকরী ছিল, তদ্বিষয়ে গ্রীক্ লেখক জষ্টিন্ কতিপয় গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ কর্ত্তৃক পলায়নপর হন। বনমধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করেন। কিন্তু ক্লান্তিবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হন। ইত্যবসরে একটী প্রকাণ্ডকায় সিংহ

* Mahavamsa Tika, P. 123. (Colombo edition, 1895.)

আসিয়া তাঁহার দেহ লেহন করিয়া তদীয় বিগত যশঃ সৌরভ তাঁহার দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। অতঃপর পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলে একটী বন্যহস্তী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সম্মুখে মস্তক নত করে।

চন্দ্রগুপ্তের সময় হিন্দুর সম্প্রতিষ্ঠানের বহু গ্রন্থ রচিত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একখানিতেও তাঁহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। চাণক্য নামক যে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি রাজ্যশাসন করিতেন এবং যাঁহার সহিত তিনি বিশেষ সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণও সাংসর্গ্য বশতঃ ঘৃণ্য 'মৌর্য্য'রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা চিরকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত মুদ্রারাক্ষস নামক সর্ব্বসমাদৃত একখানি সংস্কৃত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত নায়করূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। উক্ত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নানা রহস্য নিহিত আছে, ল্যাসন মহোদয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাহা হইতে নানা রহস্য নিষ্কাষণ করিতে প্রয়াস পান। বলা বাহুল্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রাণেশচন্দ্র।

(১০)

মুক্তির একরত্তি মন আজ নিক্তির উপর তুলিয়া দেও; তার যে মনটী এতদিন পাখীর পালকের মত পাতল ছিল তা আজ পাথরের মত ভারি হইয়া গিয়াছে। তার ছোট হৃদয়ের ছোট বাগানের ফুরফুরে বাতাস কে বন্ধ করিয়া দিল? কে তার ছোট ছোট সুন্দর সুবাসিত ফুলগুলি ছিঁড়িয়া লইল? কে তার কচি গাছের কচি ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিল? এমন প্রসন্নমূর্ত্তি কে বিষণ্ণ করিল?

ভালবাসার অঙ্কশাস্ত্রে ভগ্নাংশের স্থান নাই। যেখানে ভগ্নাংশ সেই স্থানেই বিপত্তি। ভালবাসা চাহে—সমষ্টি, সমস্ত, সর্ব্বস্ব। মুক্তি জানিত প্রাণেশচন্দ্র তাহাকে স্নেহ করে—সে প্রাণেশচন্দ্রকে ভালবাসে। ভাগ্যকুলে প্রাণেশচন্দ্র—তাহার সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী কন্যা—এই কন্যার কথায় মুক্তির

মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্রের মনের এক অংশ তবে এই বালিকা হরিয়া লইয়াছে—মুক্তি তাহা সহিতে পারিতেছে না।

প্রতিযোগিতার সামান্য হিল্লোলে প্রেমের নদীতে দেখিতে দেখিতে তরঙ্গ উঠে, ভাবনায় ভাবনায় তরঙ্গগুলি বড় হয়, স্থায়ী হয়, কুল-কিণারা ভাঙ্গিতে থাকে। মুক্তির এতদিন কোন ভাবনা ছিল না। প্রতিযোগিতায় তাহার সরল চিত্তে এক চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। সে এতদিন সারাদিন প্রাণেশচন্দ্রের কথা ভাবে নাই—প্রাণেশচন্দ্র যথা সময়ে আসিত, বসিত, পড়াইত, চলিয়া যাইত; মুক্তি তাহাকে আদর করিত, তাহার সঙ্গে আবদার করিত, তাহার নিকট পড়িত—প্রাণেশ চলিয়া গেলে মুক্তি নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজে মন দিত। এখন তাহার মনের মধ্যে প্রাণেশচন্দ্র প্রতি পলকে উঁকি দিতেছে—সঙ্গে সেই মেয়ে। চোক বুজিলে ঐ দুই মুখ লুকায় না; পড়িতে আরম্ভ করিলে পুস্তকের পাতার উপর ঐ দুই মুখ ভাসিয়া উঠে। সর্ব্বদা চিন্তায় মুক্তির ভালবাসার প্রকৃতিরও একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহা শীতল ছিল, তাহাতে উত্তাপ আসিয়াছে। এই উত্তাপে তাহার বালিকা-ভাবের এক রূপান্তর ঘটাইয়াছে। মনের কথা বলিবার তার কেহ নাই। স্কুলের সময়ে অন্য বালিকাগণ জিজ্ঞাসা করে—"তোকে ভাই ওমন দেখায় কেন?" মুক্তি মুখ লুকায়, পড়ার সময় হইলে থুথু ফেলিবার ছলে উঠিয়া যায়।

ঐ কন্যা কে, এটী তার জানা আবশ্যক। কিন্তু কে বলিবে? তাহার বিশ্বাস—দাদা মহাশয় জানেন। দাদা মহাশয় তাহার পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছেন। মুক্তি দাদা মহাশয়কে সিঁড়ির পথে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন না দাদা ম'শায় ঐ মেয়েটী কে?"

দাদা ম'শায়। তোর বাবাও আমাকে দাদা ম'শায় বলে, তুইও দাদা ম'শায় বলিস্?

মুক্তি। আপনি যে দাদা ম'শায় হয়ে জন্মেছেন।

দাদা ম'শায়। তবে তুইও আমার মা হয়ে জন্মেছিস্।

মুক্তি। দাদা ম'শায় তবে হলেন ছেলে; না গো না, তা হবে না; যে জ্যেঠা ম'শায়—না তাও হবে না। দাদা ম'শায়ও না, জ্যেঠা ম'শায়ও না, আপনি আমাদের আপনি।

মুক্তি কি এক শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টিতে দাদা ম'শায়ের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল।

দাদাম'শায়। যদি "আপনি আমাদের আপনি", তা হ'লে তুইও আমার তুই।

মুক্তি। "বলুন্ না ঐ মেয়েটী কে; প্রাণেশ দাদা কেন ওদের সঙ্গে গেলেন।"

দাদা ম'শায়। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মুক্তি। আপনি কেন জেনে আসুন না?

দাদা ম'শায়। কোথায় জান্‌বো? সে কি এখানে—পদ্মার ওপার, সেখানে আছে, কি কোথায় গেছে, কে জানে।

মুক্তি। যেখানে মেয়ে থাকুন, আপনি জেনে আন্‌তে পার্‌বেন।

দাদা ম'শায়। তোমার বাবার সঙ্গে কথা আছে, তারপর কি করা যাবে বল্‌বো।

দাদা ম'শায় ব্রজেন্দ্রবাবুর কামরায় চলিয়া গেলেন। মুক্তি দাদা ম'শায়ের ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত সিঁড়ির রেলিংএ পীঠ দিয়া পড়িতে যত্ন করিল। বৃথা যত্ন; পুস্তক থাকিল হাতে, চোখ থাকিল পাতে, মন থাকিল পদ্মার ওপারে।

পূর্ণ এক ঘণ্টার পর দাদাম'শায় ঐ পথে ফিরিয়া আসিলেন।

মুক্তি। বাবা কি বল্‌লেন?

দাদাম'শায়। ব—লি—লে—ন—আ—র—ও—দু—দিন্—দেখা—যাক্।

মুক্তি দু'দিনকে দীর্ঘ দু'মাস মনে করিয়া বিষণ্ণ মনে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

---

(১১)

ভোরের ঊষায় পদ্মার কোয়াসা—জল স্থল আকাশ পাতাল এক হইয়া গিয়াছে। বাতাসে কোয়াসার আবর্ত্ত উঠিয়াছে; শরবনে সর্ সর্ শব্দ, নদীতটে তরঙ্গ আঘাতের তর্ তর্ ধ্বনি;—এক ঐকতান উচ্চ বাদ্য বাজিয়া যাইতেছে।

নদী তীরে উপরের পথ সঙ্কীর্ণ—কোন স্থান মুক্ত, কোন স্থানে উভয় পার্শ্বে উচ্চ শরবন। এই সঙ্কীর্ণ পথে দোকানী অগ্রে, প্রাণেশচন্দ্র পশ্চাতে—ভাগ্যকুলের বন্দর হইতে দক্ষিণমুখে চলিয়াছে। দশ হাত অন্তরেও লোক চেনা যায় না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দোকানী পথ হইতে পদ্মার চড়ায় নামিয়া নদীর দিকে চলিল। প্রাণেশচন্দ্র একটু দূরে কোয়াসার আঁধারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল; দোকানী তাহাকে ডাকিয়া লইল।

সম্মুখে লোকের কোলাহল শুনা যাইতেছে; কুকুর, শৃগাল তাড়াইতেছে; উভয় শ্বাপদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ধ্বনি জন-কোলাহল ভেদ করিয়া উচ্চে উঠিয়াছে। হাজার হাজার কাক, চিল, গাঙ্গ চিল, মাছরাঙ্গা আসিয়া সমবেত হইয়াছে—কলরব করিতেছে। প্রাণেশচন্দ্রের মনে ভয় উপস্থিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় লইয়া চলিয়াছ?" দোকানী হাত তুলিয়া দিক্ দেখাইয়া দিল। কিন্তু দিকের কিছুই দেখিবার উপায় নাই; তখন কোয়াসায় সব অদৃশ্য। মধ্যে মধ্যে কোয়াসার আবর্ত্ত কাটিয়া যাইতেছে, পলকে সুদূরে কতকগুলি স্তূপের ন্যায় কি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

উভয়ে সেই স্তূপশ্রেণীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্তূপশ্রেণী আর কিছুই নহে—নৌকার ছই—এক পংক্তিতে অনেকগুলি। কতকগুলি ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন, কতকগুলি ভূমি হইতে উচ্চ, উহার তলে বাস করিবার জন্য নৌকার মাচালের পাটাতন; প্রায় প্রতিগৃহের সম্মুখেই এক একটী হাঁড়িতে ঘসি কি নৌকার পুরাতন কাছি জ্বলিতেছে, কোন হাঁড়ির নিকটে হুকা ও কল্কী আছে। চারি দিকে প্রোথিত দাঁড়ের ফলকাংশ ধ্বজার ন্যায় দেখা যাইতেছে।

মুদী দেখিল, অদূরে একটী কল্কী হইতে তামাকের সদ্যঃ ধূম উঠিতেছে। গন্ধ পাইয়া সে সেদিকে ছুটিয়া কল্কীটি লইল, দু'হাতে কসিয়া তামাকে দম দিয়া নাকে মুখে তামাকের ধূম ছাড়িয়া কোয়াসার সঙ্গে মিশাইয়া বলিল— "ঠাকুর ঐ মাইয়াগার জন্যে তুমি খুব বেস্ত হইচ, মাইয়াগা বড় রূপসী—সেও তোমাকে ডাক্‌তাছে—দেখাসু।"

প্রাণেশ। তবে পাওয়া গেছে; আছে; কোথায়? কেমন? বাড়ুয্যে মশায়? তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

দোকানী দ্রুত চলিয়াছে; কথা বলিতে বলিতে প্রাণেশচন্দ্রও বাতাসের মত ছুটিয়াছে।

দোকানী। শেয়াল, কুকুর, কাক, চিল দেইখা বুঝতাছুন না, ঠাকুর, এইটা জগৎবেড় জালের বন্ধ—রুই, কাতলা, বোয়াল, কত বড় বড় মাছ। ছোট জালে চাঁদা, ইচা, চাপলা, এলং কত—

প্রাণেশ। মাছের কথা রাখ, তাঁরা—তুমি কেন এসেছিলে, দেখেছ— ভাল তো?

দোকানী। আমরা দোকানী—যাত্রী রাখি—এখানে মাছ সস্তা—মাছ লইতে আসুছিলাম—তারপর দেখলাম কি—কি ভয়ানক কাণ্ড!

প্রাণেশ। শীঘ্র চল, শীঘ্র বল।

পনর কুড়ি হাত দূরে দেখা গেল, অতি দীর্ঘ একটা কি দাঁড়াইয়া,—কোয়াসার মধ্যে আকৃতি বড় দেখায়—প্রাণেশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া দেখিল দাঁড়ান পুরুষ—বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পশ্চাতে একখানি ডিঙ্গি নৌকা ডাঙ্গায় তোলা,—তাহার মধ্যে হাঁড়িতে আগুন জ্বলিতেছে। অনেক লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে।

দোকানী। ঐ দেখেন ডিঙ্গির মাইধ্যে—

বন্দ্যোপাধ্যায়। কি ভয়ানক, বাবাজি তোমার সঙ্গে যে দেখা হবে তা মনে ভাবি নাই। বড় বিপদ।

প্রাণেশ। কি বিপদ্ বলুন, আপনার মেয়েটী কেমন ?

বন্দ্যোপাধ্যায়। তা পরে বল্‌বো ; মাকে আগে দেখ ; তোমার তোরঙ্গটা আছে, ঐ প'ড়ে আছে—কোন ঔষধ থাকে যদি—

প্রাণেশচন্দ্র আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে ডিঙ্গি নৌকায় উঠিয়া পড়িল ; দেখিল—মেয়েটী সময়ে সময়ে সচেতন হইতেছে, বলিতেছে—"তিনি" "তিনি"—আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। মেয়েটীর মাথার নিকটে তাহার মাসি বাতাস দিতেছেন। দুইদিকে দুইজন লোক, উভয়েরই কাপড়ে রক্ত।

প্রাণেশচন্দ্র এই দৃশ্য দেখিয়া ঘটনা কি, জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইল, বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল চিকিৎসার কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রাণেশচন্দ্র প্রথমতঃ চারিদিকে যে লোক দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদিগকে সরাইয়া দিলেন, বালিকাটীকে বাতাসের দিকে মাথা দিয়া শোয়াইতে বলিলেন। প্রাণেশের তোরঙ্গে কিছু ঔষধ ছিল। কি ঔষধ, এই অবস্থায় খাটিবে কি না—প্রাণেশ তোরঙ্গ খুলিল ; একটী ঔষধ খুঁজিয়া বাহির করিয়া খাওইয়া দিল।

দোকানী তখন দু'হাতে কয়েক হালি বড় চিংড়ীর গোফে ধরিয়া ঝুলাইয়া ডিঙ্গির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "ঠাকুর মশয় বল্লা না, কি হইচিল, শুনুম, আসি গা, মাছ থুইয়া, আবার আসুম, তারেও লইয়া আসুম, তারে দিয়া আপনাগোর কাম হইবো, বড় সেবাত।"

তখন সূর্য্যের আলোক কোয়াসার আবর্ত্ত ভেদ করিয়া এক এক বার দেখা দিতেছে। মাছের বন্ধে অনেক লোক আসিয়াছে ; চিল কাক অনেক ; শৃগাল কিছু দূরে, কুকুর নিকটে। জালের আধ্ ডোবা আধ্ ভাসা বাঁশের চোঙ্গার টোনে কাক সকল বসিতেছে, টোন ডুবিতেছে—কাক সকল উড়িয়া যাইতেছে। চিল, শঙ্খচিল—জালের বেড়ের ভিতরের চুণো মাছ ছোবল দিয়া ধরিয়া লইয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে। চিল, কাক, গাঙ্গচিল—একের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইবার জন্য একে অন্যের পশ্চাতে ছুটিতেছে; পরস্পর দ্বন্দ্বে মুখের গ্রাস জলে পড়িয়া যাইতেছে। পদ্মার তীরে মাছের গন্ধ; যেন প্রকাণ্ড হাট—কি কোলাহল। মাছ ধরা, মাছ দেখা, মাছ বেচা, মাছ কেনা—এক অপূর্ব্ব আনন্দ। এমন আনন্দ কৌতূহল অল্প বিষয়েই দেখা যায়। মাছের চুবড়ি দেখিলেও ঘোমটা দেখিলে উঁকি দিবার ইচ্ছা দমাইয়া রাখা দায়।

এই আনন্দ কোলাহলের এক কোণে, শুকনা চড়ায় একখানি ছোট ডিঙ্গিতে যে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা স্থান লইয়াছিল, ডিঙ্গির দূরে দাঁড়াইয়া দুই এক জন তাহার ঘটনা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কেহ কাহাকেও কিছু ঠিক বলিতে পারিতেছে না। ছইর ছিদ্র দিয়া কেহ কেহ উঁকি দিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ কটা শ্মশ্রু এক জন বৃদ্ধ ধীবর তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে।

বালিকার ঘোর মূর্চ্ছা।

একটী তারার প্রতি।

ওগো সুদূরের রাণী,
কোন অলকার দ্রাক্ষা নিঙারি
ভরেছ কুম্ভখানি;
নয়নে নয়নে এত মধু কথা
সোহাগিনী তুমি শিখিয়াছ কোথা,
আকুল আঁচল পলকে পলকে
মুখে বুকে লহ টানি;
ওগো সুদূরের রাণী!

(২)

নীল আকাশের তারা,
গভীর নিশীথে পশে মোর কাণে
তব নূপুরের সাড়া;
তুমি স্বরগেতে আমি ধরা গায়
তবু চেনা চেনা লাগে যে তোমায়,
সুধা মাখা কার মুখ খানি যেন

তোমাতে হয়েছে হারা ;
নীল আকাশের তারা।

(৩)

ওগো গুরুজন ভীতা,
তুমি যে আমার মানসমোহিনী
নহ ত অপরিচিতা ;
কত নিরজনে কত সন্ধ্যায়
শতবার দেখা তোমায় আমায়,
তুমি যে আমার হৃদি মালঞ্চে
কণক অপরাজিতা ;
ওগো গুরুজন ভীতা !

(৪)

দাঁড়াও দাঁড়াও আলি,
তৃষিত পথিকে ও দ্রাক্ষা রস
দাও দাও সখি ঢালি,
পিয়াও পীযূষ ওগো বর নারী
হউক অমর তোমার পূজারী,
কণক বরণী ! কণক কুম্ভ
হবে না তোমার খালি ;
দাঁড়াও দাঁড়াও আলি।

(৫)

ওগো সুদূরের রাণী,
কোন অলকার দ্রাক্ষা নিঙাড়ি
ভরেছ কুম্ভ খানি ;
নয়নে নয়নে এত মধু কথা
সোহাগিনী তুমি শিখিয়াছ কোথা
আকুল আঁচল পলকে পলকে
মুখে বুকে লহ টানি
ওগো সুদূরের রাণী !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কান্যকুব্জ।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

মনুসংহিতা—দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৭। ১৯

মৎস্যাদিশব্দা বহুবচনান্তা এব দেশবিশেষ বাচকাঃ পঞ্চালাঃ কান্যকুব্জদেশাঃ শূরসেনকাঃ মথুরাদেশাঃ ইত্যাদি কুল্লূকভট্ট।

কুরুক্ষেত্রং সমন্তপঞ্চকং প্রসিদ্ধং কুরবস্তত্র ক্ষয়ংগতাঃ। মৎস্যাদয়ঃ শব্দা বহুবচনান্তা এব দেশবচনাঃ। ইতি মেধাতিথি।

মৎস্যা বিরাটদেশাঃ। পাঞ্চালাঃ কান্যকুব্জাহিচ্ছত্রাঃ শূরসেনকা মাথুরাঃ। ইতি গোবিন্দরাজ।

শূরসেনকাঃ শূরসেনাখ্য নৃপতিনা নিবাসত্বেন নির্ম্মিতানাম শূরোপলক্ষিতা দেশাঃ। ইতি নারায়ণ।

কান্যকুব্জের নাম বঙ্গবাসিগণের নিকট সুপরিচিত। কথিত আছে যে আদিশূরের সময়ে এদেশে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ আগমন করেন, বঙ্গীয় রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। দক্ষিণ রাঢ়ী এবং বঙ্গজ-কায়স্থগণ মধ্যে অনেকে উক্ত পাঁচজন কায়স্থের বংশধর বলিয়া কথিত।

কান্যকুব্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক জন-প্রবাদ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। রাজর্ষি কুশনাভের শতকন্যা বায়ুর শক্তিতে এই প্রদেশে কুব্জা হন, এজন্য এই প্রদেশ কান্যকুব্জ বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক এই প্রদেশের প্রাচীন নাম পঞ্চাল। এই প্রদেশে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। এখানে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কিয়দংশ এবং তৃতীয় মণ্ডল রচিত হয়; এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই স্থান হইতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, পিবনন পুত্র সুদাস নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য পঞ্চনদ প্রদেশে গমন করেন।

এক সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশ ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। আদিম আর্য্যগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ সরস্বতী নদীর অপর পারস্থ প্রদেশে আবাস স্থাপন করেন। পরিশেষে সরস্বতীর পূর্ব্বপারস্থ প্রদেশ ভারত-

বর্ণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হয়। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ এবং শল্যের বাদানুবাদ মধ্যে পঞ্চনদ প্রদেশের নানাপ্রকার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রদেশে পঞ্চালগণ আবাস স্থাপন করাতে এই স্থান পঞ্চাল প্রদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পঞ্চালবংশে সুপ্রসিদ্ধ দ্রুপদ জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডবমহিষী যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ-তনয়া।

প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে কুরুগণ পঞ্চালপ্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন। কাম্পিল্যনগর পঞ্চালের রাজধানী ছিল; কুরুগণ যে স্থান অধিকার করেন, তাহার রাজধানী অহিচ্ছত্র নগরে স্থাপিত হয়। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে কৌরব-গুরু দ্রোণ দ্রুপদ হইতে পঞ্চালপ্রদেশের অর্দ্ধাংশ অধিকার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে এই স্থান পুনরাধিকার করার জন্য পঞ্চাল ও কুরুগণ মধ্যে এক সমর হইয়াছিল। মহর্ষি ব্যাস সেই সমর বর্ণনা করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। এই মতাবলম্বী প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, কুরুক্ষেত্র মহাসমর পঞ্চাল এবং কুরুগণ মধ্যে হইয়াছিল। বাস্তবিক এই গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করা, এক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

শকাব্দার সময়ে গুপ্তবংশীয় জনৈক নরপতি এই প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। কান্যকুব্জনগরে গুপ্ত নরপতিগণের রাজধানী ছিল। গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ভুবন বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত নহে।

গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের সাময়িক বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন মুদ্রায় পার্ব্বতী, মহাদেব, মহাদেবের ত্রিশূল, হৈমবতীবাহন সিংহ প্রভৃতির প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়। ইহারা শৈব ছিলেন।

শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে এই প্রদেশে বসুদেব নামক একব্যক্তি রাজত্ব স্থাপন করেন।

শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের অধীশ্বর ছিলেন। মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া হর্ষচরিত রচনা করেন। এই হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সময়ে চীন-পরিব্রাজক হিয়ান্‌সাঙ ভারতবর্ষে আগমন করেন।

হিয়ান্ বলেন এই সময়ে শিলাদিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন। তিনি কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্ম্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

সান্ধ্য-তারা।

যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করে, ধীরে ধীরে আকাশ-পট হইতে কোমল লোহিত কিরণমালা অদৃশ্য হইতে থাকে, তখন পশ্চিমগগনে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দেয়। এই তারকাটী দেখিলে মনে হয় যেন সুনীল চারু চন্দ্রাতপে একখণ্ড হীরকের টুক্‌রা শোভা পাইতেছে। তখন আকাশে সহস্র সহস্র তারা ফুটিয়া উঠে নাই, তাই সুবিশাল নভোমণ্ডলের একপ্রান্তে বিরাজিত এই সঙ্গীহীন সমুজ্জ্বল নক্ষত্রটী বড়ই রমণীয় বোধ হয় এবং উহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কবিরা সুন্দরী রমণীর উজ্জ্বল-ললাট-শোভিত চারু-সিন্দুর-বিন্দুকে গোধূলি আকাশের এই পরিস্ফুট সুবৃহৎ তারকার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক এই সান্ধ্য-তারাটী বড়ই মনোহর। যখন দিবসের প্রখর আলোক নিবিয়া যায়, সুশীতল সমীরণ বহিতে থাকে, সদ্য পরিস্ফুটিত কুসুমগন্ধে বনভূমি আমোদিত হইয়া উঠে, বিহঙ্গগণ নীড়াভিমুখে দলে দলে ছুটিতে ছুটিতে আকাশ পথে সুমধুর স্বরসুধা বর্ষণ করে, সেই শুভমুহূর্ত্তে সান্ধ্য-তারকা দেখা দেয়। তখন উহাকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন ত্রিদিব-বালা সুদূর আকাশ প্রাঙ্গণ হইতে নীরবে কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে শান্ত, কর্ম্ম কোলাহলশূন্য ধরণীর শ্যামল শোভা আপন মনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই তারকাটী অতীব রমণীয়; সময়ের গুণে তদধিক চিত্তাকর্ষক।

ইংরেজীতে এই সান্ধ্যতারাকে ভিনাস্ (Venus) বলে। Venus অর্থ সৌন্দর্য্য এবং প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাস্তবিক সান্ধ্যতারকার Venus নামটী সার্থক। যখন দিবাবসানে সংসারের কর্ম্ম-চক্র নিশ্চল হয়, পরিশ্রান্ত জীবকুল ব্যাকুলহৃদয়ে শান্তিপূর্ণ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে, যখন গৃহে গৃহে প্রণয়ের শুভ সম্মিলন, তখনই সান্ধ্যতারকা পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী গরবিনী ভামিনীর ন্যায় সৌন্দর্য্য-ছটায় আকাশ আলোকিত করিয়া দেখা দেয়। সান্ধ্যতারকা যথার্থই সৌন্দর্য্যের রাণী। আবার চঞ্চলা প্রণয়দেবতার ন্যায় এই তারকাটীও অতি অস্থির স্বভাব। অস্থিরতার জন্য ইহার সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আজ দেখিলে সান্ধ্যতারা পশ্চিমগগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুইদিন পর দেখিবে মধ্য আকাশে দ্যুতিবিকিরণ করিতেছে, আবার কয়দিন পর উহাকে পূর্ব্ব নভোমণ্ডলে বিকাশ পাইতে প্রত্যক্ষ করিবে। তাই সান্ধ্যতারাকে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রাণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সান্ধ্যতারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই কবি ও

ভাবুকদিগের চিত্ত বিমোহিত করিয়া আসিতেছে। কত কাব্যে তাহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আজ কবির কথা না বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এই নক্ষত্রটী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি। বৈজ্ঞানিকেরা কঠোর সত্য আবিষ্কারে নিযুক্ত; তাঁহারা প্রেম কিম্বা সৌন্দর্য্যানুশীলনপরায়ণ নহেন। তাই সান্ধ্যতারকার মাধুরী দেখিয়াই তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হন নাই। বিজ্ঞানে এই তারকাটী শুক্রগ্রহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে শুক্রগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জ্যোতিষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হওয়া দূরে থাকুক প্রায় সকল গ্রহই ইহা অপেক্ষা আকারে বড়। শুক্র চন্দ্র হইতে বৃহত্তর এবং প্রায় পৃথিবীর সমান। বৃহস্পতি, শুক্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতায় হীন বটে কিন্তু আকারে শুক্র হইতে তেরশত গুণ বড়। আবার 'সিরিয়াস্' (Sirius) শুক্র হইতে একশত কোটি গুণ বড়। আমরা আমাদের ধরিত্রীর বিশালতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। উহাপেক্ষা একশত কোটি গুণ বড় গ্রহটী কিরূপ তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। শুক্র অপরাপর নক্ষত্র হইতে উজ্জ্বলতর, সেই জন্য উহা দিনের বেলায়ও দূরবীক্ষণ সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্রের স্বীয় আলোক নাই। উহা চন্দ্র এবং পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। শুক্রের একদিক মাত্র সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন শুক্রও পৃথিবীর ন্যায় আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং ২৩ ঘণ্টায় শুক্র একবার আপনার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু সে ভ্রম এখন দূর হইয়াছে। 'মিলানের' এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শুক্রের গায় একটী কাল ছায়া এবং দুইটী উজ্জ্বল চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন। এই অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত ক্রমান্বয়ে [illegible] মাসকাল শুক্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন কিন্তু সেই ছায়া ও চিহ্নের কোন ব্যতিক্রম হইল না। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে ২৩ ঘণ্টা অথবা তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে শুক্র আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে না। 'মিলানের' পণ্ডিত আরও দেখিলেন ২২৫ দিনে শুক্র সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল বটে কিন্তু তাহার সেই কাল ছায়া এবং প্রদীপ্ত চিহ্ন দুইটী একবারের জন্যও তিরোহিত হইল না। তখন তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, শুক্র সর্ব্বদা একদিক সূর্য্যাভিমুখে রাখিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই সিদ্ধান্তই এখন সত্য বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছেন।

শুক্রের ব্যাস প্রায় [illegible]৬৬০ মাইল। উহা পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার এবং দুই

মেরুপ্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। শুক্রের সামগ্রী (Mass) প্রায় পৃথিবীর সমান কিন্তু সামগ্রীর তুলনায় ওজন খুব কম। উহার ওজন পৃথিবীর ওজনের তিন চতুর্থভাগ। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণও সেই অনুপাতে কম। ভূ পৃষ্ঠে একটা জিনিস সেকেণ্ডে ১৬ ফিট গতিতে পতিত হয়। শুক্রগ্রহে পতনশীলের গতি উহা অপেক্ষা সেকেণ্ডে তিন ফিট কম। শুক্র, সূর্য্য হইতে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। শুক্র গ্রহের বৎসর আমাদের পৃথিবীর বৎসর অপেক্ষা হ্রস্ব। পৃথিবী ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু শুক্র ২২৫ দিনের মধ্যে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে।

শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী। সেইজন্য নৈকট্যের অনুপাতে আলো ও তাপের পরিমাণ বেশী। শুক্র, পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য মনে হয় তথায় কোন প্রাণীর বাস নাই। পৃথিবীর উপর সূর্য্য যে তাপ বিকীর্ণ করে আজ যদি তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে এই শস্য শ্যামলা ধরণী উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হইবে। গুল্ম, তরু, লতা শুষ্ক হইয়া যাইবে, জীবকুল অসহ্য উত্তাপে প্রাণত্যাগ করিবে। সেই জন্যই মনে হয় শুক্র গ্রহে কোন প্রাণী নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। আমরা যে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করি উহাই কেবল জীবন ধারণের উপযোগী বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। কিরূপ নৈসর্গিক অবস্থার ভিতর জীবজন্তু বাস করিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা মানুষের অসাধ্য। যে স্থানের অবস্থা যেরূপ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঠিক সেই অবস্থার উপযোগী জীব সৃষ্টি করিতে পারেন; অথবা প্রকৃতি জীবকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। একটী ঘটনা হইতে তাঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সমুদ্রের তলদেশে জলের চাপ অতিশয় ভয়ানক সুতরাং তাহা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিয়াছিলেন সমুদ্রতল প্রাণী শূন্য; কেননা এত চাপের নীচে কোন প্রাণীরই বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। সমুদ্রের নীচে তাপ এত অধিক যে কুম্ভীরের কঠিন চর্ম্ম অথবা গণ্ডারের ত্বক, যাহা বন্দুকের গুলিতেও বিদ্ধ হয় না তাহাও উহার দশ ভাগের এক ভাগ চাপে ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে সমুদ্রের তলদেশেও প্রাণী বাস করে। উহাদের দেহ সমুদ্রের অসাধারণ চাপের উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে। সমুদ্রতলস্থিত প্রাণীদিগকে উপরে তুলিলে চাপের অল্পতা হেতু অর্দ্ধ পথেই তাহাদের দেহ ফাটিয়া যায়।

গ্রহ উপগ্রহের সহিত পৃথিবীর নৈসর্গিক পার্থক্য আছে বলিয়াই একথা স্থির

করিয়া বলা যায় না যে তথায় কোন প্রাণী নাই। অবস্থা ভেদে জীব জন্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্য হইয়া থাকে। 'ল্যাপলাণ্ডে' লোক বাস করিতেছে এসংবাদ শুনিবার পূর্ব্বে যদি শুনিতাম যে পৃথিবীতে এমন একটা দেশ আছে যেখানে ছয়মাসে একবার সূর্য্য দেখা দেয় এবং সমস্তটা দেশ বরফে আবৃত থাকে তাহা হইলে আমরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক নিশ্চয়ই মনে করিতাম ল্যাপলাণ্ডে কোন প্রাণী বাস করিতে পারে না। সেইরূপ ল্যাপলাণ্ডে'র অধিবাসীরাও ভারতবর্ষের ভীষণ উত্তাপের কথা শুনিয়া মনে করিত ভারতবর্ষ জন শূন্য। যে সকল গ্রহের নৈসর্গিক অবস্থা পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থার অনুরূপ নহে তথায় কোন প্রাণী নাই বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু ভগবান প্রত্যেক গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী জীব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব কিরূপে জানিতে পারিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দেওয়ান মনোয়ার খাঁ।

দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলির প্রপৌত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁ একজন দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, ভীষণ প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং অতীব সম্মানিত ভূপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী স্থানে স্বীয় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দেওয়ানবাগ নামাকরণ করেন। দেওয়ানবাগে সুবিস্তীর্ণ পরিখা বেষ্টিত বৃহৎ দীর্ঘিকায় পরিশোভিত, দেওয়ানবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরদিকে মিঠাপুকুর নামে এস্‌লাম ধর্ম্মানুমোদিত পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘ খনিত একটী পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় উহা অন্দরমহলের জলাশয় ছিল। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তটে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেস্থানে বসিয়া দেওয়ান সাহেব নামাজ পড়িতেন তাহা বহু মূল্যবান্ সুনীল প্রস্তরে খচিত। দুঃখের বিষয় এই যে অল্পদিন হইল এই মস্‌জিদের একটী গোম্বজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উহার উপরে অনেক বড় বড় বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। দেওয়ান মনোয়ার খাঁর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ এই প্রাচীন মস্‌জিদটী আর বেশী দিন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হায়! একদিন যাহা ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলির প্রপৌত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁর পবিত্র ভজনালয় ছিল, কালক্রমে তাহা আজ ব্যাঘ্র ও শৃগাল প্রভৃতি বন্যজন্তুর আবাসভূমি হইয়াছে। দেওয়ানবাগের মধ্যে খনন

করা যায়, তথায়ই প্রচুর পরিমাণে ইষ্টকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, অনেক অট্টালিকাদি পতিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মনোয়ার খাঁর রাজধানী বর্ত্তমানে বারদীর নাগ পরিবারের প্রভুত্বাধীন।

মনোয়ার খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক লোক ছিলেন।

দেওয়ানবাগের কিছুদূরে—পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্বদিকে কতকগুলি মধ্যবিত্ত লোকের ভদ্রাসনের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। উহার মধ্যে গর্জ্জন ও ভবিত রায়ের বাড়ীই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা উভয়েই বৈদ্যজাতীয় এবং মনোয়ার খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁ যখন আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রাম লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করেন, তখন দেওয়ান মনোয়ার খাঁ সায়েস্তা খাঁর অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দিল্লীশ্বরকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনোয়ার খাঁর অসীম বীরত্বকাহিনী দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে "ভৌমিক" বংশধর মনোয়ার খাঁকে "মনসবদার" উপাধি প্রদান করেন। ঈশা খাঁর পরে এই বংশের মধ্যে ইনিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হিজরীর ১০৭৮ সালে সম্রাট সাজাহানের অনুমতি ক্রমে সা সুজার স্বাক্ষরিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অতীব সম্মানসূচক একখানি পত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে মনোয়ার খাঁ দিল্লীর "শাহি দরবারে" অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্বাক্ষরিত আরও একখানি পত্র বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, মনোয়ার খাঁ কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও পরাক্রমশালী ভূপতি ছিলেন। পত্রের সারমর্ম্ম এইরূপ—

"জোনাব! শা সুজা বিদ্রোহী হইয়া আপনারদিকে অগ্রসর হইতেছে, আশা করি আপনি তাহাকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া ধৃত করিবেন। আমি আপনার নিকট অনেক আশা করি। আপনার সাহায্যার্থে কুমার জৈনুদ্দিনকে পাঠাইতেছি তাহার নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন।"

আওরঙ্গজেবের পত্র পাইয়া দেওয়ান মনোয়ার খাঁ শা সুজাকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হন। শা সুজা ভীষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া মনোয়ার খাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। ইতঃমধ্যে কুমার জৈনুদ্দিন পৌঁছিলে মনোয়ার খাঁর বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় এবং তিনি ভীমবেগে শা সুজাকে আক্রমণ করেন। শা সুজা পরাজিত হইয়া আরাকাণে পলায়ন করেন। মনোয়ার খাঁ, দিল্লীশ্বরের সাহায্যে আরাকাণরাজ্য আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফেলেন।

"তওয়ারিখে নাসেরী" নামক উর্দ্দু ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, মনোয়ার খাঁ হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া হস্তীকেও পরাস্ত করিতেন, তজ্জন্য কেহ কেহ তাহাকে "পিলতন" (হাতীর সমান) বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ মনোয়ার খাঁর সহায়তাই সায়েস্তা খাঁ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে বঙ্গদেশ শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঢাকা নগরীতে মনোয়ার খাঁর কাছারীবাড়ী, বাজার বৃহৎ মস্‌জিদ, ও গোরস্থান এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া মনোয়ার খাঁর নাম সকলের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। মনোয়ার খাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান শরিফ খাঁ অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। সংসারে অতুল ঐশ্বর্য্য পদদংলগ্ন বালুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী দরবেশ হইয়াছিলেন। অধুনা তাহার দরগা ও ভজনালয় পারুলিয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছে।

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

তুমি মা ডেকেছ।

তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
সারাটি দিনের যতেক খেলা,
সুরভি উথল বকুল মালা,
ল'য়েছি গুটায়ে যতন করি।
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
অলস সাঁঝেতে বিধুর করে,
পশিল আহ্বান কুটীর দ্বারে
হৃদয় পরাণ আকুল করি ;
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
ফেলিয়ে এসেছি খেলার বাঁশী,
বিকচ অশোক সেফালি রাশি,
পাথেয় ল'য়েছি নয়ন-বারি,
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
ভুবন ভরিয়া বিজয় গানে,
ছুটিয়া চ'লেছি নদীর পানে,
তীরেতে ভাসিছে সোণার তরী।
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
পিছনে আঁধার আসিছে ছুটি,
সাঁঝের আঁচল পড়িছে লুটি,
দিনের আলোক যেতেছে সরি।
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?
লও মা তুলিয়া আপন কোলে,
দাওনা আঁকিয়া দগধভালে,
বিজয়-তিলক যতন করি।
তুমি মা ডেকেছ
আর কি থাকিতে পারি ?

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

Kuntaline Press, Calcutta.

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩১৩। সপ্তম সংখ্যা।

মাতৃ-মূর্ত্তি।

ওগো জন্মদে বঙ্গ!
স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ তোমার—
দেববাঞ্ছিত অঙ্গ;
স্বর্ণ তোমার অরুণ কিরণে,
স্বর্ণ তোমার মাটি,—
স্বর্ণ তোমার শস্য শীর্ষে,
উজ্জ্বল—পরিপাটি।

নন্দন হ'তে সুন্দর তব—
শ্যাম সজ্জিত বন।
মন্দার হ'তে গন্ধ বহুল—
তোমারি কুসুমগণ।

তব তটময়ী গঙ্গা যমুনা—
গাহি মঙ্গল গীতি;
আনিছে বহিয়া, স্তন্য-অমিয়া
মোদেরি জন্য নিতি।

জগদ্দুর্ল্লভ সম্পদ তব—
শ্যাম সুন্দর মাঠ;
লক্ষ্মী মায়ের অঞ্চলে যেন—
খুলিয়া গিয়াছে গাঁঠ।

বিবিধ-বরণ-বিহগ-কাকলী—
—কলিত কানন তব।
প্রভাতে, প্রদোষে, হেমময় মেঘে—
খচিত তোমারি নভঃ।

নিদাঘে মা তুমি ধূসর বরণা—
কর্ষিত ভূমি তলে।
বর্ষায় তব নীল মাধুরী
রাজে নির্ম্মল জলে।

শরদে মা, তুমি কমলে কুমুদে—
পর' গরবের থান।
হেমন্তে তব হেমময় তনু—
পাকিয়া উঠিলে ধান।

শিশিরে তোমার পাণ্ডু বদনে—
নীহারের শ্রম-বারি।
বসন্তে পর' বিবিধ বরণে—
খচিত রচিত শাড়ী।

ষড় ঋতু সদা সাজায় তোমারে—
ক্রীত কিঙ্করের প্রায়।
অম্বুধি তব চরণের তলে—
সতত আছাড় খায়।

অন্নের তরে, পণ্যের তরে,
জগৎ তোমার দ্বারে।
তোমারি মত মা মুক্ত হস্ত—
আর কে হইতে পারে?

তুমি মা ধন্যা, তুমি মা গণ্যা,
ওগো মঙ্গল ময়ি!
তোমারি ধূলিতে মিশিয়া যেন গো,
আমরা ধন্য হই।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

পুরাতন স্থান।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত পুরুষদিগের দৃষ্টি ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর, বিশেষতঃ আসিয়া মহাদেশের, প্রাচীন ও লুপ্তবিদ্যা সমূহের আলোচনা করিবার জন্য, প্রায় একশতাধিক বর্ষকাল পূর্ব্বে বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর এবং উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ কর্তৃক কলিকাতা মহানগরীতে "আসিয়াটিক সোসাইটি" নাম্নী প্রখ্যাত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় তৎকালে বিদ্বজ্জনগণের সময়ে সময়ে সমাগম হইত এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হইত। সুবিখ্যাত আচার্য্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল, এল, ডি, এবং সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এল, ডি, মহাশয়দ্বয় এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্বালোচনা বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন। এই দুই মহাত্মা নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগদ্বাসিগণকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বাস্তবিক এরূপ বহুভাষাভিজ্ঞ, বহুবিদ্য ও বহুশাস্ত্র পারদর্শী মহাবিদ্বান সমতুল্য ব্যক্তি এদেশে আর কেহ ছিলেন না। ইঁহারা যেমন পণ্ডিত তেমনি পরিশ্রমী পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা কেবল যে সুলেখক ছিলেন তাহা নহে পরন্তু ইঁহাদের প্রতিভা, অনুসন্ধানশক্তি এবং প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের গুণাপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলালের সমতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার জীবিতকালে, ভট্ট মোক্ষমুলর ব্যতীত, পৃথিবীতে অপর কেহ ছিল না, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ধ্রুব সত্য। রাজেন্দ্রলালের পদানুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কতিপয় শিক্ষিত বঙ্গবাসী ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া-

ছিলেন, তন্মধ্যে বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, আচার্য্য রামদাস সেন প্রভৃতি প্রধান ও প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে আরও কতকগুলি বঙ্গবাসী ভ্রাতা প্রাচীন তত্ত্বেরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশা ও সন্তোষ সহকারে ইঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমের সুফল দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এ বিষয়ে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সুলেখকের পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থরাজি আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিতে পারে। অধিকতর সুখের কথা এই, মহামান্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে, অনুজ্ঞায় ও প্রভূত অর্থসাহায্যে অনেক স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে, অনেক কীর্ত্তির ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পুরাতন ও প্রয়োজনীয় কীর্ত্তি সমূহের রক্ষা ও পুনঃ সংস্কার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে—এই সুখের সময়ে—আমরা প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সার কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব এরূপ আশা করিতে পারি। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীনবংশ এবং প্রাচীন স্থানের অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রাচীন স্থানসমূহ বহুসংখ্যক প্রাচীন নিদর্শনে পরিপূর্ণ থাকে। যাহা হউক, এরূপ প্রাচীন বংশ ও প্রাচীন স্থান সমূহ এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কতকগুলি পুরাতন স্থানের এবং ঐ স্থানসমূহস্থিত প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই প্রয়োজনীয় স্থানগুলির বিস্তৃত বিবরণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই; যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঠকদিগের কৌতুহল বৃত্তির কিয়দংশ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিলাম। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক লেখকগণের যদি ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ হয় তাহা হইলে আমার সপরিশ্রম অনুসন্ধানকে সুফল প্রদায়ক বিবেচনা করিব।

গোয়ালতোড়। মেদিনীপুর নগর হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনের যে নূতন শাখা ঝিড়িয়া জঙ্গল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে গবর্ণমেণ্টের পুরাতন রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, এই রাস্তার পঞ্চক্রোশ পশ্চিমদিকে গোয়ালতোড় অবস্থিত। সুবিখ্যাত চন্দ্রকোণা গ্রাম হইতে গোয়ালতোড় বহু দূরবর্ত্তী নহে। পথিক ও পরিব্রাজকবর্গ, "চন্দ্রকোণা রোড" নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া গোয়ালতোড় গ্রামে যাইতে পারেন। পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, চন্দ্রকোণা নামক পুরাতন ও বৃহৎগ্রাম,

উৎকৃষ্ট ধুতি ও চাদরের জন্য পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে বহুসংখ্যক ধনবান ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ঐশ্বর্য্যশালী তন্তুবায় বাস করে। গোয়ালতোড়ের পুরাতন দুর্গ, "ময়নাগড়" নামে প্রখ্যাত। একটী নদীর ধারে একটী বৃহৎ দ্বীপ এবং এই দ্বীপের মধ্যে একটী উপদ্বীপ; তদুপরে এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত। নদীর পশ্চিমকূলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তৎসাময়িক রাজাদিগকে হ্রদের ন্যায় দুইটী প্রকাণ্ড সরোবর খনন করাইতে হইয়াছিল। প্রথম সরোবর বা দীর্ঘিকা খনন করিবার সময়ে তাহার মৃত্তিকারাশি অন্যস্থানে নিপাতিত না করিয়া ঐ সরোবরের মধ্যে অতি কৌশলে ও সাবধানতার সহিত একত্রিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই দ্বিতীয় দ্বীপের উৎপত্তি হয়। এই উপদ্বীপের চারিধারে ঘন ঘন বংশবৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভেদ করিয়া সহসা প্রবেশ করা সহজ নহে। প্রথম দ্বীপের চতুর্দ্দিকে বড় বড় অভ্রভেদী মহীরুহ দণ্ডায়মান এবং সরোবরের চারিপার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ প্রাচীরের ভগ্নরাশি অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ঐ শতাব্দীতে অথবা তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষে এবম্প্রকার দ্বীপদ্বয় ও গহনারণ্য পরিবেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ কোন হিন্দু বা মুসলমান নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং এই গড় একভাবে অতুলনীয়। সুবিখ্যাত কবি ঘনরাম প্রণীত "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" নামক কাব্যে লাউ সেন নামে যে রাজার বীরত্ব ও কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত আছে, এই প্রাচীন দুর্গ তাঁহারই "কেল্লা" বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, প্রাচীন গৌড়দেশে যে হিন্দুরাজা ছিলেন লাউ সেন তাঁহার অধীনে অন্যতম করদরাজা বলিয়া গণ্য হইতেন। মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ "বর্গী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখনও লাউ সেনের বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন; মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের প্রবল আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইয়া, রাজা লাউ সেনের তদানীন্তন বংশধর উহাদিগকে যথারীতি কর দিতে সম্মত হয়েন, কিন্তু পরিণামে নিয়ম মত কর আদায়ে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা গোয়ালতোড় রাজ্য এবং ঐ দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া বাহুবলেন্দ্র নামক এক প্রতাপী পুরুষকে তাহা অর্পণ পূর্ব্বক তাহাকেই অধিকারী স্থির করিয়া চলিয়া যান। এই বাহুবলেন্দ্র নামক ব্যক্তি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিল; ময়নারাজ্যের ইনিই আদি প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা যদুচরণ সিংহ, গোয়ালতোড় রাজধানীতে বহু

অর্থব্যয়ে, বহু যত্ন ও পরিশ্রমে এবং নানা স্থানের সুদক্ষ ভাস্করের সহায়তায় এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই মন্দিরে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ঐ মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এই মনোহর দেব-মন্দির "পঞ্চরত্ন" নামে প্রসিদ্ধ। পাঁচটী প্রকাণ্ড চূড়া এই মন্দিরের উপরিভাগে অবস্থিত থাকায় বহুদূর হইতে পথিক ও পরিব্রাজকেরা মন্দিরের পরিচয় পাইয়া থাকেন। এই মন্দিরের গাত্রে, চূড়ায় এবং সকল অংশে বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এত সুন্দর ও সুশোভন যে সহজে তাহার বর্ণনা হয় না; স্বচক্ষে না দেখিলে পাঠকেরা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন না। মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইবার অত্যল্পকাল পরে যখন শালগ্রাম আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল তখন অকস্মাৎ ব্রাহ্মণেরা চমকিত হইয়া দেখিলেন, একটা গোবৎস মৃত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে।

অধ্যাপকদিগের বিচারে মন্দিরাভ্যন্তরে শালগ্রাম আনয়ন করা অবৈধ বিবেচিত হওয়ায় মন্দির পরিত্যক্ত হইল। বর্ত্তমানকালে ঐ মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য প্রকার আগাছা ও কণ্টকাকুল লতাসমূহ উৎপাদিত হইয়া শৃগাল, শশক, সর্প ও ছুছুন্দরের ক্রীড়াস্থল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই মন্দির হইতে, কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কিছুদূরে গেলে, চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটী দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রশেখর ইহা নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ সময়ে তিনি ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইহার চারিদিকে প্রকাণ্ড পরিখা আছে; ইহার পরিমাণ প্রায় এক বর্গ মাইল। একটী মাত্র দ্বার, তাহা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

কাঁথি। মেদিনীপুর জিলার অধীন ইহা একটি প্রধান মহকুমা এবং সাধারণতঃ "হিজলি কাঁথি" নামে বিখ্যাত। এক সময়ে ইহা বঙ্গদেশের অতি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং গঙ্গাসাগর যাইবার যাত্রীগণও এই বন্দর দিয়া সঙ্গমতীর্থে গমনাগমন করিত। এই প্রাচীন, প্রখ্যাত ও প্রশস্ত নগর পুরাকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; "ফাহিয়াণ" প্রভৃতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকগণ প্রাচীনা কাঁথি নগরী দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রশংসার সহিত ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে শাখা মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহারই উপরে "কাঁথি রোড্" নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া প্রায় ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে কংসাবতী (কাঁসাই) নদী তটে কাঁথি নগরীকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁথির ইংরাজি নাম কণ্টাই (Contai)। এই নগরী

মধ্যে যে প্রসিদ্ধ হিন্দুদুর্গ আছে তাহার নাম কুরুম্বর দুর্গ। ইহার বহির্ভাগের প্রাচীর সমূহ এক আশ্চর্য্য প্রকারের প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, তাহার প্রকৃত নাম অদ্যাপি কেহ জানে না। কিন্তু দুর্গটি আজিও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাহিরের প্রাচীর দশ ফিট হইতে কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চ এবং অভ্যন্তর প্রায় ৮ ফিট প্রশস্ত, ইহার চারিধারে বিবিধ প্রকার রমণীয় ফল ও ফুলের গাছ। পূর্ব্বদিক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে একটী শিব-মন্দিরের ভগ্নরাশি দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দিরের মধ্যস্থানে গুহাভ্যন্তরে মহাদেব অবস্থিত আছেন; বহু সংখ্যক লোকে অদ্যাপি তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিক দিয়া প্রবেশ করিলে একটা মসিদের ভগ্নরাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা কণ্টকাকুল আগাছা ও বহুবিধ অস্পৃশ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বহুকাল হইতে ইহাতে লোক প্রবেশ করে নাই; বোধ হয় কখন ইহার ভিতরে মুসলমান প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অত্যাচারী মুসলমানগণ যেখানে সনাতন হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দির দেখিয়াছে, বিনা দোষে, বিনা কারণে, হিন্দুর মন্দির লুণ্ঠন অথবা ধ্বংস কিম্বা মসিদ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু হিজ্‌লি কাঁথির মসিদের যে দিনে নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই রাত্রেই অসংখ্য হিন্দু আসিয়া ঐ মসিদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানেরা আর সেখানে অঙ্গুলি রাখিতেও সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই অপকীর্ত্তি প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হইয়া এক কোণে অস্পৃশ্যভাবে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মসিদ, মহম্মদ তাহের নামক এক মুসলমান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; প্রাচীরের গাত্রে এ কথা খোদিত আছে; তাহা পরিষ্কাররূপে পড়িতে পারা যায়। উত্তরদিকে প্রকাণ্ড সরোবর, তাহার নাম যজ্ঞেশ্বরকুণ্ড, ইহা ভীষণ কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। নিকটস্থ মোগলমারী নামক স্থান বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রখ্যাত; এখানে মোগল ও পাঠানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, মহারাজা কপিলেশ্বরের শাসন সময়ে কুরুম্বর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে বাঘশ্রী নামক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন; সে সময়ে এস্থান অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। কাঁথি নগরী, কুরুম্বর দুর্গ এবং অন্যান্য ভগ্নরাশি দর্শন করিয়া কিয়দ্দূরে গমনপূর্ব্বক পথিকেরা "কিয়রচাঁদ" নামক প্রান্তরের কীর্ত্তিসমূহ দর্শন করিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। এই মাঠে অদ্যাপি এক সহস্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; এই কিয়রচাঁদ নামক মাঠ বহু কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। রাজা জহরি সিংহের সময়ে এই স্তম্ভসমূহ নির্ম্মিত

হইয়াছিল। ইহাদের উপরে উঠিয়া হিন্দু সেনা ও সেনাপতিগণ প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদিগের কার্য্যকলাপ সাবধানে নিরীক্ষণ করিতেন। এই স্তম্ভ সমূহের সাহায্যে বৈরীদলের আক্রমণ ও প্রতিরোধ করা যাইত। "উড়াসতী" নামক স্থানে একটি মন্দির আছে তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত। মার্ব্বেল পাথরের একটা পিঁড়ির উপরে খোদিত অক্ষরদ্বারা জানা যায় এই মনোহর মন্দির রাজা চোয়াণ সিংহের শাসন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দাঁতন। এই স্থান মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। দাঁতন গ্রামের সমলেশ্বর মন্দিরটি মনোহর ও প্রসিদ্ধ। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড বৃষমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহার সম্মুখের দুই পদ অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত। পাঠকেরা অবগত আছেন, কালাপাহাড় নামে এক দুর্বৃত্ত ও মতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, কামিনী ও কাঞ্চনের লোভে, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা দাঁতন গ্রামের পার্শ্বস্থ প্রান্তরে একটা বৃষকে নিহত ও আর একটা বৃষের সম্মুখস্থ পদ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দিয়াছিল। প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ সেই দুরাত্মার কলঙ্কের চিহ্ন। পথিক ও পরিব্রাজকেরা ঐ স্থানে গমন করিলে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাত্ত্বিক হিন্দু-সন্তানেরা কহিয়া থাকেন, দেখুন, দেখুন, হিন্দু-সন্তান বিধর্ম্মী হইলে কতদূর হিন্দুবিদ্বেষী, সমাজবৈরী এবং জাতিবৈরী হইতে পারে!!" শুনা যায়, ভোজ রাজার সময়ে সমলেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবেরা কহেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব একদা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যূষে দন্তধাবন (দাঁতন) করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। কিন্তু যদুনন্দন প্রণীত দাঁতনের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে দাতনকে আরও পুরাতন নগর বলিয়া বোধ হয়। দাঁতনের "বিদ্যাধর" ও "শশাঙ্ক" নামক দুই দিঘী বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রথমটী দ্বাদশ শত ফিট দীর্ঘ এবং ১০৯০ ফিট প্রশস্ত। রাজা মুকুন্দ দেবের মন্ত্রী বিদ্যাধর দেবের ব্যয়ে ইহা খাদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টী ছয় সহস্র ফিট দীর্ঘ ও তিন সহস্র ফিট প্রশস্ত। রাজা শশাঙ্ক দেব ইহার জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই উভয় সরোবরের মধ্যদেশে অতি আশ্চর্য্য সুড়ঙ্গ আছে, তাহা মাটির নীচে বিদ্যমান; তন্মধ্য দিয়া একটী সরোবর হইতে অন্য সরোবরে অদৃশ্য ভাবে গমনাগমন করিতে পারা যায়। এই সুড়ঙ্গ প্রস্তর নির্ম্মিত ইহার উচ্চতা ৮ ফিট এবং প্রশস্ততা পঞ্চ ফিট।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

অনন্তর চামুণ্ডা কালীর সহিত মহাযুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড সসৈন্যে নিহত হইলে, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ সমস্ত অসুর-সৈন্যসহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন অগণিত অসুরসৈন্যে যুদ্ধস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই আগত প্রায় মহাসৈন্য দর্শন করিয়া দেবী জয়শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। অনন্তর অসুরগণ সিংহবাহিনী দেবীকে ও চামুণ্ডা-কালীকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল।

তখন অমরগণের কল্যাণ কামনায় দেবীর সাহায্যার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক ও ইন্দ্র প্রভৃতির শরীর হইতে তত্তৎস্বরূপাশক্তি-বিনির্গতা হইয়া দেবীর নিকট উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহাদেব এই সমস্ত দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন; "আমার প্রীতির নিমিত্ত এই দুর্দ্দান্ত অসুরগণকে শীঘ্র বিনাশ করুন" তখন চণ্ডিকার শরীর হইতে অতি ভীষণা শত শত শিবা পরিবেষ্টিতা অত্যুগ্রা অপরাজিতা শক্তি বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া, ধূম্রজটিল শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

হে ভগবন্! আপনি দূত স্বরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়া সেই অতি গর্ব্বিত দানবদ্বয়কে এবং যুদ্ধার্থী অন্যান্য অসুরগণকে বলুন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ করুন; এবং দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হউন, আর তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তবে পাতালে গমন কর। অথবা যদি বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিতান্তই যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কর; তবে শীঘ্র আসিয়া তোমাদিগের মাংসদ্বারা আমার শিবাগণের তৃপ্তিসাধন কর।

দেবাদিদেব মহাদেবকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করায় এই অপরাজিতা শক্তি শিবদূতী নামে অভিহিতা হইলেন।

"সংমোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ"—(গীতা)

সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম (সদুপদেশের প্রতি অবহেলা) জন্মে। শুম্ভ নিশুম্ভেরও স্মৃতিবিভ্রম ঘটিল, তাহারা শিবদূতীর সদুপদেশ গ্রহণ করিল না। তাহারা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল।

সেই সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে ক্রমে শুম্ভ নিশুম্ভের বহু সৈন্য ও প্রধান প্রধান সেনাপতি নিধনপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি রক্তবীজ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। রক্তবীজের শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎপ্রমাণ ও তদ্রূপ বলবীর্য্যশালী অসুর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং মাতৃগণ যতই রক্তবীজ নামক অসুরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন, ততই তদ্রূপ পরাক্রমশালী অসুর জন্মিতে লাগিল। এবং অল্পসময়মধ্যে জগৎ রক্তবীজে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেমন কোন প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটের চিহ্নিত সেনাপতির শোণিতে শত্রুরাজ্য সিক্ত হইলে তদ্দেশ অসংখ্য সৈন্য-সেনাপতিতে পূর্ণ হয়, তদ্রূপ রক্তবীজের রক্তপাতেও অগণিত রক্তবীজসৈন্যে চতুর্দ্দিগ প্রপূরিত হইল।

তখন দেবী লোকক্ষয়কারিণী কালীকে বলিলেন,—আপনি করাল বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজের শোণিত পান করিতে থাকুন, তবেই রক্তবীজ নিরক্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে।

প্রথমে পাপের (অধর্ম্মের) অতি বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন পাপের মাত্রা বৃদ্ধির সীমা অতিক্রম করে তখন জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায় কালের করাল বক্তে্র প্রবিষ্ট হইয়া সমূলে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর দেবীর আদেশে লোকসংহারিণী কালী, করাল বদন ব্যাদান করিয়া ; গীতার সেই লোকক্ষয়কৃৎ কালের ন্যায়,—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তান্"।

যেন সমস্ত লোক গ্রাস করিবার জন্য লেলিহান্ হইলেন। অমনি সেই অগণিত রক্তবীজসৈন্য কালের করালবক্তে্র প্রবিষ্ট হইয়া প্রজ্জ্বলিত অনলে পতঙ্গ-বৃত্তি প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে—মহাবীর নিশুম্ভও নিহত হইলেন।

"স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ।" (গীতা)

স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। তখন শুম্ভাসুরের স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ হইল, শুম্ভ স্বচক্ষে দেবীর স্বশরীর হইতে শিবদূতী প্রভৃতি মাতৃগণ (ঐশীশক্তি) উৎপন্ন হইতে দেখিয়াও বুদ্ধিনাশ হেতু, ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে, চণ্ডিকাকে বলিল,—

"বলাবলেপ দুর্গে ত্বং মা দুর্গে! গর্ব্ব মাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুদ্ধসে যাতিমানিনী॥"

হে বৃথা বল গর্ব্বিতে দুর্গে! তুমি গর্ব্ব পরিহার কর, যেহেতু তুমি অন্যান্য দেবশক্তির সহায়তায় বলদর্পিতা হইয়া যুদ্ধ করিতেছ। শুম্ভের এই বাক্য শুনিয়া দেবী কহিলেন,—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতাং দুষ্ট! ময্যেব বিশন্তি মদ্বিভূতয়ঃ॥"

রে মূঢ়! এ জগতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ আর কি আছে? একমাত্র আমিই অনন্ত বিশ্বে বিরাজ করিতেছি, তুমি অন্য যে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিতেছ, সে আমারই; বিভূতি এই দেখ, সমস্ত আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

"ততঃ সমস্তাস্তাদেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখালয়ং
তস্যা দেব্যাস্তনৌ যযু, একৈবাসীত্তদাম্বিকা॥"

তদনন্তর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তি সেই দেবীর শরীরে বিলীন হইলেন। তখন কেবল সেই এক জগদম্বাই বিরাজমানা রহিলেন।

তখন দেবী বলিলেন,—

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ লোকৈ র্যদাস্থিতা
তৎ সংহৃত্য ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব॥"

আমি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা যে বহুরূপে বিরাজমানা ছিলাম, এক্ষণ সে সমস্ত সংহরণ করিয়া আমিই একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতা রহিলাম, এখন স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অদ্বৈতবাদ; চণ্ডীতে জগদম্বা এক কথাতেই প্রকাশ করিলেন। এবং কার্য্যদ্বারাও প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ বা অভিপ্রায় চণ্ডীতে কার্য্যতঃ অভিনীত হইয়াছে।

কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াও শুম্ভের জ্ঞানোদয় হইল না। কারণ তাহার বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছিল।

"বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" (গীতা)

বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শুম্ভও বুদ্ধিনাশ হেতু সেই মহাযুদ্ধে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

প্রাচীন ভারতের বায়ু বিজ্ঞান।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যউপেন্দ্র মল্লিক প্রাচীন ভারতের বায়ু বিজ্ঞান বা নভো বিজ্ঞান (Meteorology of Ancient India) সম্বন্ধে Central Hindu College Magazine নামক সাময়িক পত্রে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা 'আরতি'র পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাদিগকে ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ উপহার দিলাম।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পৌষ মাস সমগ্র বৎসরের দর্পণ স্বরূপ,—এই মাসের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সমগ্র বৎসরে জল বায়ুর অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অবধারণ করা যাইতে পারে। পৌষ মাসকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে; তাহা হইলে প্রত্যেক বিভাগে আড়াই দিন পরিবে। এই এক এক আড়াইদিনের প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ এক এক মাসের অবস্থা হইবে। এই সকল বিভাগে বায়ুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রাচীন ঋষিগণ জল বায়ু সম্বন্ধে বৎসরের ফলাফল অবধারণ করিতেন। বায়ু প্রবাহিত না হইলে বৃষ্টি হইবে না, প্রবল বাতাস প্রবাহিত থাকিলে খুব বৃষ্টি হইবে।

পূর্ব্ব কথিত এক এক বিভাগ পাঁচ দণ্ড দ্বারা বিভাগ করিলে এক এক দিনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা প্রতিফলিত হয়। প্রথম ২॥ দণ্ড দিবা ভাগের অবস্থা জ্ঞাপক; শেষ ২॥ দণ্ড রজনীর অবস্থা জ্ঞাপক।

এই সকল দণ্ড বিভাগকে পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া এবং সেই ক্ষুদ্র বিভাগে বায়ুর গতি কোন দিকে প্রবাহিত থাকে, তাহা দেখিয়া দিবা রাত্রির কোন সময়ে বৃষ্টি হইবে না হইবে তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে।

যদি শুক্ল পক্ষের দিবাভাগে আকাশমার্গ ধূলিতে ধূসর হইয়া উঠে, বিদ্যুৎ রেখা দীর্ঘাকারে দেখা দেয় এবং দিঙ্মণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর পৌষ মাসের ঠিক সেই তিথিতে যথেষ্ট বৃষ্টি পাত হইবে।

যদি পৌষ মাসের কোন দিন বৃষ্টি বা কুয়াসা হয়, তবে আষাঢ় মাসের সেই তিথিতে প্রবলবেগে বারিপাত হইবে। রাঢ় দেশেও এইরূপ প্রবাদ মূলক কবিতা প্রচলিত আছে।

বিবিধ বাঙ্গলাগ্রন্থে বায়ু বা নভো-বিদ্যাবিষয়ক গাথা দেখা যায়। তৎসমুদয়ের মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বায়ু বা নভো-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভরসা করি, 'আরতি'র কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের দেশ প্রচলিত বায়ু বা নভো-বিদ্যাবিষয়ক গাথা গুলি সত্য মূলক কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীস্বদেশী।

সূর্য্য।

অতি প্রাচীনকালের অধিবাসিগণ সূর্য্যকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিত। কেবল ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই আদিম লোকেরা এক কালে সূর্য্যের উপাসক ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ সূর্য্যকে দেবতা দিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। সবিতার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা যে সকল সরল সুললিত স্তুতিগান রচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। সরল-হৃদয় আর্য্যগণ স্রষ্টাকে চিনিবার পূর্ব্বে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা সৃষ্ট পদার্থের ভিতরই তাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

বাস্তবিক ক্ষমতা এবং উপকারিতা দেখিয়া যদি কোন পদার্থকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে সূর্য্যকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত। মনুষ্য, পশু, পক্ষী এমনকি বিটপিও সামান্য তৃণ বল্লরী পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন সূর্য্যোত্তাপের উপর নির্ভর করে। আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি দীর্ঘ কালের জন্য সূর্য্যদেব নভোমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইয়া যান তাহা হইলে প্রাণিগণের ধ্বংস অনিবার্য্য। আর যদি হঠাৎ সূর্য্যের উত্তাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও জীবগণের পরিণাম ধ্বংস। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্য হইতে তরু লতা পর্য্যন্ত সকলই স্বীয় স্বীয় জীবনের জন্য সূর্য্যের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতেছে।

সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া আকাশে মেঘ হয়। মেঘ হইতে বারিপাত হয়। বারিপাত না হইলে আমাদের এই "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ধরণী উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইত। ফল, ফুল, শস্য কিছুই উত্তাপ ব্যতীত জন্মিতে পারে না। ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন ও সূর্য্যের উপর নির্ভর করে। সূর্য্য কেবল তাপ ও আলোক দেয় না। সূর্য্য আপন আকর্ষণ বলে পৃথিবী এবং অপর বহুসংখ্যক গ্রহ উপ গ্রহকে উহাদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধরিয়া রাখিতেছে।

সূর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহা সর্বজন বিদিত। সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন এবং তদীয় অবস্থা বিবরণ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ; ঐ সকল ব্যাপার বর্ণন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে আয়তনে অনেক বড়। এত বড় যে বলিলে তাহার বৃহত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সকলের অসাধ্য। আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ১২ লক্ষ পৃথিবী একত্র সংযুক্ত করিলে সূর্য্যের সমান হইতে পারে। পৃথিবীর আয়তনের বিশালত্বই আমরা চিন্তা করিতে পারি না ; ১২ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে যে কিরূপ ব্যাপার দাঁড়াইবে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

যদি একখানি ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে অনবরত চলিতে থাকে তাহা হইলে সূর্য্যের পরিধিটা একবার ঘুরিয়া আসিতে উহার পাঁচ বৎসর কম লাগিবে না। যদি সূর্য্যকে সমান দশ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলেও উহার এক এক ভাগ আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী হইতে আয়তনে অনেক বড় হইবে। সূর্য্যের আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন সমষ্টির অপেক্ষাও প্রায় ৬০০ শত গুণ অধিক। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগ খনন করিয়া শূন্য করা যাইত এবং আমাদের পৃথিবীটাকে তাহার কেন্দ্র স্থানে স্থাপিত করা যাইত তাহা হইলেও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকিত যে চন্দ্র এখন পৃথিবী হইতে যত দূরে অবস্থিত আছে (২৪০০০০ মাইল) তাহার অপেক্ষা ৮১০০০ ক্রোশ দূরে স্থাপিত হইলেও অনায়াসে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিত।

কিন্তু সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন হইতে যে পরিমাণ বড় উহার ওজন তত অধিক নহে। একটা বিরাট দাঁড়ি পাল্লায় একদিকে সূর্য্যকে রাখিয়া যদি অপর দিকে তিন লক্ষ পৃথিবীকে চড়ান যায় তাহা হইতে দুই দিক প্রায় সমান হইবে। অবশ্য এরূপ দাঁড়ি পাল্লা কেবল কল্পনার রাজ্যে প্রস্তুত করিয়াই স্থাপন করা যাইতে পারে।

সৌর জগতের সমস্ত জ্যোতিষ্করাজি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকেরই আবর্ত্তনের একটী নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। যে গ্রহ যত নিকট সেই গ্রহকে সূর্য্য তত প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু গ্রহগুলি সেই গুরুতর আকর্ষণে সূর্য্যের উপর না পড়িয়া অধিকতর দ্রুত গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দূরবর্ত্তী গ্রহগণের উপর ব্যবধানের অনুপাতে সূর্য্যের আকর্ষণ কম তাই উহারা মৃদু গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। শনৈশ্চর প্রতি ঘণ্টায় ৯৬৮০ ক্রোশ, বৃহস্পতি ১২৭৬০ ক্রোশ, পৃথিবী ২৯৯৩৭

ক্রোশ, শুক্র ৩৪২৩০ ক্রোশ এবং বুধ ৪৮১১৮ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রহগণের মধ্যে বুধ নিকটতম তাই উহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সৌর জগতের সকল গ্রহ উপগ্রহই সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। কাহারও স্বকীয় আলোক নাই। এবং সূর্য্যই সৌর জগতের একমাত্র আলাধার। সূর্য্যের উত্তাপ অতীব ভয়ানক। কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েই এরূপ ভীষণ তাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা তাড়িত সাহায্যে অসাধারণ তাপ উৎপাদন করা যায় বটে কিন্তু সেই তাপও সূর্য্যোত্তাপের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদি সমস্ত পৃথিবী কেবল ২৬০ গজ গভীর একটী সমুদ্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় যে উত্তাপ প্রাপ্ত হয় সেই উত্তাপেই বরফে পরিণত সমুদ্রবারি ফুটন্ত জলে পরিবর্ত্তিত হইত। যে উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা সূর্য্য বিকীর্ণ তাপের দুই শত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। অনবরত সূর্য্য হইতে প্রবল উত্তাপ তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এক সেকেণ্ডে সূর্য্য হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাহাতে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ঘন মাইল বিস্তৃত বরফরাশি ফুটন্ত জলে পরিণত হইতে পারে।

সূর্য্যকে একটা ভীষণ অনন্ত চুল্লি বলা যাইতে পারে। আগুন কেবলই জ্বলিতেছে এবং উহার উত্তাপেরও ন্যূনাধিক্য হয় না। আবার সূর্য্যমণ্ডলে ভয়ানক ঝড় হইয়া থাকে। সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সহিত প্রবল ঝটিকা সম্মিলিত হইলে কিরূপ ব্যাপার হয় তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ বার লক্ষ কয়লার স্তূপ একবারে একত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে কিরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইবে! সূর্য্যের অনলশিখার গর্জ্জন বড়ই অসাধারণ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকালে দশ পনর মাইল স্থান পর্য্যন্ত ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। আর উহার শব্দে ২০।২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের লোক অস্থির হইয়া উঠে। সূর্য্যে কি কাণ্ড হয় তাহা অনুমান করিলেও বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইয়া যায়। সূর্য্যমণ্ডলে ঝটিকা ও বাত্যাবর্ত্ত অবিশ্রান্ত বহিতেছে। আর উহাদের গতি কত ভীষণ! পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ঝড় হয় তাহার গতি ঘণ্টায় একশত মাইলের অধিক নয়; কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের বাত্যাবর্ত্তের গতি এক সেকেণ্ডে একশত মাইলেরও অধিক। সূর্য্যস্থিত অনলশিখার তুলনায় হিমালয় পর্ব্বতও অতিক্ষুদ্র বোধ হইবে। অধিকাংশ অগ্নিশিখার উচ্চতা আমাদের পৃথিবীর যোজনের দশগুণ। সূর্য্যগর্ভ হইতে আগ্নেয়গিরির ন্যায় অনল নিঃসৃত হয়।

সেই অনলস্রোত এমনি বেগে ছুটিয়া বাহির হয় যে তাহার সহিত অন্য কিছুর গতিরই তুলনা হয় না। আমরা গতির বিষয় বলিতেই ডাক গাড়ী অথবা কামানের গোলার কথা বলিয়া থাকি। ডাকগাড়ী সেকেণ্ডে এক মাইল এবং কামানের গোলা দশ এগার মাইলের অধিক যাইতে পারে না। প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী ১৮½ মাইল ভ্রমণ করে; বুধের গতি ইহার দেড়গুণ। এমন কয়েকটী ধূমকেতু দেখা গিয়াছে তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে তিন শত মাইল অতিক্রম করিয়াছে; কিন্তু সূর্য্যের অন্তর্নিহিত জলন্ত পদার্থ সমূহ তদোধিক দ্রুত বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে পাঁচশত মাইল গতিতে ছুটিয়া বাহির হয়।

সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৬০০০ আট লক্ষ ছয়ষট্টি মাইল। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সংখ্যাটা খুব জাকাল হইল বটে কিন্তু উহা দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ সাহায্য করিবে মনে হয় না।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি রেলের লাইন থাকিত এবং আমরা যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলিতে পারে এইরূপ দ্রুতগামী একখানি গাড়ীতে চড়িয়া সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতাম তাহা হইলে সূর্য্যে পৌছিতে আমাদের ১৭২ বৎসর লাগিত। একশত বাহত্তর বৎসর মানুষ বাঁচে না; সূর্য্যে পৌছিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে তিনবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত। সূর্য্য এত দূরে অবস্থিত আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র রৌপ্য থালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্য অতি বৃহৎ এত বৃহৎ যে তাহার বিশালত্বের সম্যক উপলব্ধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না অনন্ত আকাশে বিরাজমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রজনীতে মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অসংখ্য নক্ষত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভিতর কতকগুলি অতিশয় হীনপ্রভ, আমাদের সূর্য্যের তুলনায় সেইগুলি দীপ শিখার ন্যায় বোধ হয়। বাস্তবিক ঐ সকল নক্ষত্র এক একটী বিরাট সূর্য্য। উহাদের সহিত তুলনা করিলে সৌরজগতের সূর্য্যকে অতি সামান্য নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। ঐ সকল নক্ষত্র এত ক্ষুদ্র দেখাইবার কারণ উহারা অতিশয় দূরে রহিয়াছে। যদি সূর্য্যকে উহাদের স্থানে নিয়া রাখা যাইত তাহা হইলে সূর্য্য একবারে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিষয় আমরা বারান্তে প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

সূর্য্যের উপাদান পৃথিবীর উপাদানের ন্যায় কঠিন নহে। সূর্য্যের ভিতরের

অংশ কঠিন কি না তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু বহির্ভাগ বাষ্পস্তরে আবৃত। সূর্য্যের যে সকল প্রতিকৃতি তোলা হইয়াছে ঐ সকল প্রতিকৃতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে সূর্য্যবিম্বের সকলভাগ সমান উজ্জ্বল নহে। ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বাষ্পরাশি মেঘের ন্যায় সূর্য্যের উপরিভাগে স্থানে স্থানে ভাসিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর আকাশস্থিত মেঘরাশি জলকণার সমষ্টি মাত্র কিন্তু সূর্য্যের চারিদিকে বিরাজমান মেঘরাশি বাষ্পময় নানাপ্রকার ধাতুদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূর্য্যবিম্বে মাসে মাসে কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে 'সৌরকেতু' (Sun spot) বলে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতুকে রাহুর পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় রাহু-অন্ধকারময়, কেতু-চিহ্ন, হইতেইও সূর্য্যবিম্বে প্রকটিত কৃষ্ণচিহ্নের নাম 'কেতু' হইয়াছে। এমন বৎসর যায় না যে বৎসর একটী না একটী চিহ্নের উদয় না হয়। সৌরকেতু মধ্যে মধ্যে এমন বৃহৎ হয় যে তাহা খালি চক্ষেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সৌরকেতু দেখিতে হইলে কোন উপায়ে সূর্য্যতেজঃ হ্রাস করিয়া লইতে হয়। একখণ্ড কাচকে প্রদীপের ভুষা মাখাইয়া লইয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিলে সূর্য্যোত্তাপে চক্ষুর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। এই প্রণালীতে আমাদের দেশের লোক বহুকাল হইতে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া আসিতেছে; কোন অন্ধকারময় গৃহের ছিদ্রপথে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইলে এবং সেই কিরণে একখণ্ড সাদা কাগজ ধরিলে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায়। বিম্বে বৃহৎ কেতু থাকিলে তাহাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৩১১ সনের মাঘ মাসে সূর্য্যবিম্বে একটী অতি প্রকাণ্ড কৃষ্ণচিহ্ন দেখা গিয়াছিল। ঐ কেতু আমরা খালি চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই বৎসর ঠিক সেই সময়েই অতিশয় শীতাতিশয্য হইয়াছিল। এজন্য সাধারণ লোকে উভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কেতুর আবির্ভাবে সূর্য্যের-উত্তাপের গুরুতর হ্রাস হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। প্রভাগণ্ডলের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কেতুস্থান শীতল হয় বটে কিন্তু এত বৃহৎ হয় না যে তদ্দ্বারা সূর্য্য বিকীর্ণ তাপের সহস্রাংশের একাংশ হ্রাস হইতে পারে।

সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণকালে একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে চন্দ্র অবস্থিতি করে। চন্দ্র দ্বারাই সূর্য্য ঢাকা পড়ে। পূর্ণ গ্রহণকালে চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। সেই সময়ে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে কতকগুলি বিশাল

প্রজ্জ্বলিত অনলশিখা পূর্ব্বাংশে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল শিখা চন্দ্রের কৃষ্ণাবয়ব হইতে বিনির্গত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক শিখাগুলি চন্দ্রের পশ্চাৎস্থিত সূর্য্যদেহ হইতে নির্গত হইতেছে ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। প্রথমতঃ শিখাগুলি পূর্ব্বাংশে দেখা যায় কিন্তু পশ্চিমাংশে কোন শিখা দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্র যতই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ততই পূর্ব্বাংশের শিখাগুলি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকে। তখন পশ্চিমভাগ চন্দ্রের আবরণোন্মুক্ত হওয়াতে সেই ভাগে আর কতকগুলি শিখা দেখা দেয়। চন্দ্র যখন সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তখন আবার সূর্য্য ভীষণ তেজঃপুঞ্জদীপ্ত হইয়া সৌরজগত উদ্ভাসিত করে। তখন সৌরশিখাগুলি আর দেখিতে পারা যায় না।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা ঐ সকল সৌরশিখা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক প্রকার প্রজ্জ্বলিত বাষ্প হইতে ঐ সকল শিখা নির্গত হইয়া থাকে। অগ্নিময় দ্যুতিমান বাষ্পরাশি হাল্কা বায়ুস্তরের ন্যায় সূর্য্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। বাষ্পস্তরের গভীরতা ৫। ৬ হাজার মাইলের ন্যূন হইবে না। সূর্য্যদেহের চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্পরাশিই আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। উহাকে "প্রভামণ্ডল" বলে। সূর্য্যের বহিরাবরণস্বরূপ প্রভামণ্ডলই তাপ ও আলোকের আধার। প্রভামণ্ডলের নীচে "বর্ণমণ্ডল" অবস্থিত। খালি চক্ষে এমন কি দূরবীক্ষণ সাহায্যেও বর্ণমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখা যায় তাহাই প্রভামণ্ডল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটী সৌরশিখা এত বৃহৎ আকৃতি ধারণ করে যে তাহার তুলনায় পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ হিমালয় পর্ব্বতও নিতান্ত ক্ষুদ্র। প্রফেসার ইয়ং লিখিয়াছেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সূর্য্যের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে একটী সৌরশিখা দেখা দিয়াছিল। উহা প্রথমাবস্থায় ৪০ হাজার মাইল উচ্চ হইয়াছিল। তারপর দেখা গেল ঐ শিখা দ্বিগুণ উচ্চ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ঐ শিখা উচ্চ হইতে হইতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল উচ্চ হইল; তৎপর বেলা সাড়ে বারটার সময় বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া একবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

সৌর শিখাকে পণ্ডিতেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক প্রকারের সৌরশিখা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘমালার ন্যায় কিন্তু জ্বলন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌরশিখাগুলি অনল-উদ্গারী (Eruptive)। উহাদিগের

মধ্য হইতে ভীষণ অনল-জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া উর্দ্ধে আস্ফালন করিতেছে। উহাদের গতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৌরশিখার কেবল আকৃতিগত বৈষম্য নহে, উহা যে বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয় ঐ বাষ্পের উপাদান ও স্বতন্ত্র। মেঘ-সদৃশ সৌরশিখার প্রধান উপাদান হাইড্রোজান; দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌরশিখা নানা ধাতব বাষ্পসম্ভূত। প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল মেঘমালাকে (luminous cloud) আমরা খালি চক্ষে দেখিতে পাই উহাকে বৈজ্ঞানিকেরা photosphere বলিয়া থাকেন আমরা ইহাকে প্রভামণ্ডল বলিয়াছি কারণ এই বহিরাবরণই প্রভার আধার। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিখাগুলি দূরবীক্ষণ সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ গুলি প্রভামণ্ডলের নিম্নে অবস্থিত এবং cromosphere বা বর্ণমণ্ডল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সৌরকেতুকে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ প্রভামণ্ডলের গহ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই গহ্বর গভীর নহে এবং শূন্যগর্ভও নহে। সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বদা ঝটিকা বহিতেছে; বাতাবর্ত্তে যেমন একস্থানের বায়ু অধোগামী হইয়া থাকে সূর্য্যের বাতাবর্ত্তেও তেমনি হয়। অপর উর্দ্ধোত্থিত বাষ্পরাশি যখন শীতল হয় তখন বেগে প্রভা-মণ্ডলে প্রবেশ করিতে থাকে এবং তৎপর বৃষ্টির ন্যায় সূর্য্যদেহে পতিত হয়। শীতল বাষ্প অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ সেই জন্য আমরা কতকটা স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাই। প্রভামণ্ডিত সূর্য্যের দেহে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ প্রত্যক্ষ করিলেই আমরা উহাকে সৌর কেতু বলিয়া থাকি। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্য মণ্ডলের ঐ সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে অনন্ত আকাশে বহু দূরে বিরাজমান নক্ষত্র সমূহের সম্বন্ধে অনেক অভিনব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যেও যে সকল বিষয় জানিতে পারা যায় না, বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। এই অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র জ্যোতির্ব্বিদদিগের গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যালোচনায় প্রধান সহায় হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহ সকলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের এক চতুর্থ মাত্র। সূর্য্যের সমান বৃহৎ একটী জলপিণ্ড হইতে সূর্য্য ১½ গুণ ভারী। সুতরাং আয়তনের তুলনায় উহার ওজন খুব কম। ইহা হইতেই অনুমান হয় সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড জ্বলন্ত বাষ্প পিণ্ড মাত্র।

সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ২৭ গুণ। পৃথিবী পৃষ্ঠে যে

জিনিস এক মণ ভারী হইবে সেই জিনিষ যদি সূর্য্যে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার ওজন সাতাশ মণ হইবে।

সূর্য্য হইতে আমরা আলোক প্রাপ্ত হই। সূর্য্যালোক দেখিতে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সূর্য্যরশ্মি সাতটি মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র। যাবতীয় পদার্থ সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত হইয়া নানাবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। বাগানে নানাপ্রকার চিত্রিত বর্ণানুরঞ্জিত কুসুমরাশি দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল মনোহর বর্ণসমূহ, কুসুমরাজি সূর্য্যকিরণ হইতে প্রাপ্ত হয়। গোলাপের বর্ণ গোলাপের নিজস্ব নহে উহা সূর্য্য রশ্মি হইতে সংগৃহীত। গোলাপ কেবল সূর্য্য রশ্মি হইতে লাল বর্ণটি বাছিয়া লইয়া স্বীয় কোমল দেহে রঞ্জিত করিয়া দেয় এবং সেই বর্ণ দর্শকের চক্ষে প্রতিফলিত করে। সূর্য্য রশ্মিতে যদি অন্য বর্ণের সহিত লালবর্ণ মিশ্রিত না থাকিত তাহা হইলে সূর্য্যালোকে লাল গোলাপ ফুল দেখিতাম না।

"All the rose does is to grasp the Sun beams which fall upon it, extract from these beams the red which they contain and radiate that red light to our eyes".

Sir Robert Ball.

দিবালোকে যে রংটী উজ্জ্বল দেখা যায় রাত্রে দীপালোকে তাহা তদ্রূপ দেখা যায় না। রাত্রে অতি উজ্জ্বল আলোকেও কোন কোন জিনিসের রং স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয় না। তাহার কারণ জিনিসের যে রং তাহা সূর্য্যালোকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে কিন্তু অন্য আলোকে সেই পরিমাণে না থাকায় ঐ রং আর উজ্জ্বল হয় না।

সুনীল নভোমণ্ডলে যখন বর্ণরঞ্জিত অপূর্ব্ব সুন্দর রামধনুর বিকাশ পায় তখন সূর্য্য রশ্মির সপ্তবর্ণ দৃষ্টি গোচর হয়। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে ঐ কিরণ বিশ্লেষিত হইয়া যায়। তিন পল বিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলেও তাহা বিশ্লেষিত হয় এবং তখন রামধনুর ন্যায় সপ্তবর্ণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই; তাঁহারা ঐ সকল বর্ণ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নানাপ্রকার ধাতু হইতেই সূর্য্য রশ্মির বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হয়। মেগ্নেসিয়াম (magnesium) ধাতু দগ্ধ করিলে অতি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নি সংযোগে সোডিয়াম (Sodium) হইতে পীত

বর্ণ এবং ষ্ট্রন্‌টিয়াম্‌ (Stroutium) হইতে লাল বর্ণ বাহির হয়। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন নানাপ্রকার ধাতু হইতে সূর্য্যরশ্মির সপ্তবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। আলোক পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সূর্য্যে জলযান, অঙ্গারক, দস্তা, তাম্র, সীস, টিন, রৌপ্য কেল্‌সিয়াম; সোডিয়াম্‌, নিকেল মেগ্‌নেসিয়াম, কোবল্ট, এলিউমিনাম্‌, ক্রমিয়াম্‌, ষ্ট্রন্‌টিয়াম্‌, মেঙ্গানিস্‌, কেড্‌মিয়াম্‌ এবং পটাসিয়াম্‌ বিদ্যমান আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডলে স্বর্ণ, নাইট্রোজান, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌ ও পারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই।

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে ততই অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। বিজ্ঞানই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনির্ব্বচনীয় মহিয়সী শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যাহারা বলে, বিজ্ঞান নিরীশ্বরবাদিতার প্রতিপোষক তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। বিজ্ঞান সর্ব্বজন সম্মুখে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান মঙ্গল ময়ের মঙ্গল নিদান সমূহের তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাণেশচন্দ্র।

(১২)

যমুনা। বইনদিদি, আমার পাঙ্গা মাছ দুগা তুই বেইচা দিবি।

পদ্মা। কেন্‌লো মণি, তুই গঞ্জে যাইবি না? আমি যদি বেইচা তোরে কম পয়সা দেই।

যমুনা। তা দেস্‌, দিবি।

পদ্মা। কম না দেই, তুই বেচিলে যে দাম হইত তাতো বইন হইবো না। ঝি বউরা তোর মাছের দাম তো দেয় না, তোর চাঁদ মুখ খানির দাম দেয়।

পদ্মা যমুনার দুই গালে দুই চুমো দিয়া বলিল—"যাইবি না কেন্‌?"

যমুনা। দেখ্‌চস্‌ না, ঐ ডিঙ্গিতে এউগগা মাইয়া, বাবা বল্‌ছে ওর লাইগা দুধ আইনা দিতে। মাইগা না, যেন্‌ গঙ্গা ঠাকুরাণ জল থাইকা উইঠা আইছে—বেরাম।

যমুনা তার চুবড়ী হইতে ডালার উপর এলং, পুঁটি, খরসুলার ছা, পিলাচাকি, চাঁদা, চিঙড়ী তুলিল। চিঙড়ী গুলি জ্যান্ত—ছিটকিয়া পড়িতেছিল। যমুনা

পদ্মাকে বলিল—"চৌধুরী বউগারে কইস্ এই মাছ যমুনার।"

পদ্মা। কইমু, ঠাকুর তো আমি, তোর সোণা হাত, তোর মিঠা কথা—চৌধুরী বৌ তো তা পাইত না।

যমুনা। দাম লইস্ না, মাছ দিয়া আসিস্। কাইল আমি দাম আনুম্।

যমুনা সব মাছ পদ্মার চুবড়ীতে তুলিয়া দিয়া ডিঙ্গির কাছে যাইয়া তার পিতাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। অন্যান্য জেলেনীরা আপন আপন চুবড়ী লইয়া গন্তে চলিল।

তখন বেস্ বেলা হইয়াছে, বাড়ী পৌঁছিতে যমুনার আরও বেলা হইল। বাড়ী হইতে যখন ফিরিল তখন সে জেলেনী যমুনা নয়। যমুনার পরিধানে পরিষ্কার লাল পাইড় শাড়ী; যমুনা স্নান করিয়াছে; তার সুদীর্ঘ কৃষ্ণ, কুঞ্চিত মুক্ত চুল, শাড়ীর উপর দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দাইন হাতে রূপার মত চক্‌চকে ঘটি; ঘটির মধ্যে সদ্য দোহা খাটি দুধ—গরম, ফেণা উপচিয়া পড়িতেছে।

উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে বেগবতী অকুল পদ্মা, তীরে শুভ্রবসনা, স্নাতস্নিগ্ধা, মুক্তকেশী যমুনা—রজতোজ্জ্বল দুগ্ধপাত্র হস্তে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া।

মহানন্দ। মা আইচ, দুদ আন্‌চ, মা ঠাক্‌রাণকে দেও।

মাসীমা তখন ডিঙ্গি হইতে বাহির হইয়াছেন, যমুনা ঘটি রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাসীমা যমুনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দুধের ঘটি ধরিতে তার বিলম্ব হইল। তিনি বলিলেন "মা তুমি বুড়ার মাইয়া?" যমুনার দিকে চাহিয়া "মাছ টাচ লাগে নাই তো, দুধ খাটি তো," বিধবার আর এসব জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। চুলা জ্বলিতে ছিল; তিনি দুধ ছাঁকিয়া কড়াতে তুলিয়া দিলেন। অল্প গরম করিয়া জুড়াইয়া মেয়েটীকে খাওয়াইলেন। মেয়েটীর ফিট তখন বন্ধ হইয়াছে, চৈতন্য হইয়াছে কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল।

এতক্ষণ ইহাদের কেহ ডিঙ্গির মধ্যে কেহ বা বাহিরে ডিঙ্গির ছায়ায় বসিয়াছিলেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর—ডিঙ্গির আর ছায়া নাই।

মুদি তাহার স্ত্রী সোণামণিকে লইয়া আসিয়াছে। মহানন্দ তখনও বাড়ী যায় নাই। যমুনা বাহিরে রৌদ্রে ডিঙ্গির গলুই ধরিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটীকে দেখিতেছে, মাসীমাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, মাসীমার অনেক কথার উত্তর দিতেছে, অনেক কথার উত্তর দিতেছে না। "এত বড় মেয়ে" "কই বিয়া হইচে" "স্বোয়ামী কই" যমুনা এই সব প্রশ্নে মাথা নীচু করিয়া নীরব।

মাসীমা রান্না করিতেছেন—চুলা ছাপরের ছায়ায়। রান্না করিতেছেন আর ডিঙ্গির ভিতরের সংবাদ লইতেছেন।

প্রাণেশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উপরে জেলেদের ঐ ছাউনীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন। প্রশ্ন—ঘটনা কি?

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থলে, চারিদিকে যুবক, বৃদ্ধ, বালক ধীবর সকল; প্রাণেশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে; তাহার দাইনে মুদি। সোণামণি ডিঙ্গির নিকট ছিল; এই স্থানে জটলা দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না; যমুনা তার পরিচিতা, যমুনাকে লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"লোকগুলি শান্তিপুরের—

প্রাণেশ। শান্তিপুরের লোক! এখানে! আপনাকে—এরূপ কেন? কিরূপে জানলেন শান্তিপুরের?

বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা এই মুদির ঘরে লোকের যাতায়াত ও ভাব স্বভাব দেখিয়া বুঝিলাম ব্যাপার ভাল নয়। তখন আমাদের ডিঙ্গি আসিয়াছে; মাঝি আসিয়া আমাদের খবর লইয়াছে; নৌকায় উঠিব। এদিকে আপনাকে ডাকিয়া পাইতেছি না। আপনার একটা গতি হইবে; পরে তত্ত্ব লইবেন ও লইব। এই ভাবিয়া আমরা ডিঙ্গিতে উঠিলাম।

প্রাণেশ। জলে আসিয়া ভাল করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঙ্গায় বাঘ কিন্তু জলে কুমীর তা তখন ভাবি নাই। ডিঙ্গি কতকদূর চলিতেই দেখি পেছনে একখানা ডিঙ্গি আসিতেছে। খুব ভয় হইল। এক মাঝি হালের বইঠা আর এক মাঝি দাঁড়ের বইঠা কসিয়া বাইতে লাগিল। তীরের মত ডিঙ্গি ছুটিয়াছে। পেছনের ডিঙ্গিও ছুটিয়াছে কিন্তু তারা যেন খুব বাইতে পারিতেছে না। আমাদের ডিঙ্গি আসিয়া এই জগত-বেড় জালের বাঁশের চোঙ্গার টোঙের উপর গড়্ গড়্ করিয়া উঠিল।

সত্যানন্দ। আমরা কে কে করিয়া উঠিলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায়। পেছনের ডিঙ্গি আসিয়া তখন আমাদের উপর পড়িয়াছে। দুই জন লোক আমাদের নৌকায় উঠিয়াছে। হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ। আমাদের এক মাঝি মাথায় আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেল। আর একজন অল্প আঘাত পাইল। জেলের ছাউনী—ভিমরুলের চাক; ধর্ ধর্ শব্দে লোক আসিয়া ঘিরিল—কোন্ ডিঙ্গি ডাকাতের, কোন্ ডিঙ্গি আমাদের তাদের বুঝা

কঠিন। এত লোক দেখিয়া ডাকাতেরা ডিঙ্গি বাহিরে ধরিয়া দিল—গালাগালি করিতে লাগিল; গলা—শান্তিপুরের।

মহানন্দ ও অন্য সকল জেলেরা—"কর্ত্তা, আমরা না থাক্‌লে কি হইত গঙ্গা মা জানেন, মা গঙ্গা রক্ষা করচেন। আপনাদের সঙ্গে তো কিছু দেখি না, তবে ডাকাত—"

প্রাণেশ। শান্তিপুরের লোক কেন?

বন্দোপাধ্যায় বলিতে যাইয়া থামিয়া গেলেন, বলিলেন সে সকল কথা পরে হইবে।

বেলা প্রায় একটা, রান্না প্রস্তুত হইয়াছে। বন্দোপাধ্যায় স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক করিলেন, তৎপর আহার করিলেন। সকলের আহার হইল। ধীবরদের অনুগ্রহে মাছ প্রচুর, তাহারা প্রচুর দুধ আনিয়া দিয়াছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিল—অনেকে প্রসাদ লইয়া কৃতার্থ হইল।

বন্দোপাধ্যায় যখন ডিঙ্গি জলে নামাইতে বলিলেন তখন মহানন্দ অপর কয়েকজন লইয়া সঙ্গে যাইবে বলিয়া প্রস্তাব করিল। যমুনা বাড়া যায় নাই, মাসীমা তাহাকে বাড়ী যাইতে দেন নাই। যমুনা তাহার বাবাকে বলিল আড়িনা অনেক দূর নয়, তাদের কুটুম সেখানে আছে, সে এই সঙ্গে যাইবে। মহানন্দ অসম্মত হইতে পারিল না।

এক ডিঙ্গিতে বন্দোপাধ্যায়, প্রাণেশচন্দ্র, দুই মাঝি, মাসীমা ও যমুনা। অপর ডিঙ্গিতে পাঁচজন জেলে—যুবক ও বলবান; মহানন্দ বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ।

মুদি বিদায় লইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে তাহার ভাড়া দিতে উদ্যত হইলেন, মুদি ভাড়া লইল না; বলিল,—"পায়ের ধুলা দেও ঠাকুর, পয়সা তো অনেক রোজগার করি—এমন ধুলা কয় বামনে দিবার পারে?" সোণামণি "সেবা দিয়া" সরিয়া দাঁড়াইল।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সেই ছাউনীর জেলেদের মাতব্বরের হাতে দুইটী টাকা দিলেন, বলিলেন—"সন্ধ্যা বেলা হরিরলুঠ দিও, হরি ঠাকুরের নিকট মঙ্গল মাগিও।"

দুই ডিঙ্গি পাশাপাশি হইয়া ছুটিল। জোরে বইঠা পড়িতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভাগাকুলের তীর হইতে ডিঙ্গি অদৃশ্য হইল।

পদ্মার তীরে মুক্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যা বেলা যখন জেলে যুবক, বৃদ্ধ বালকেরদল লুঠ গাইতেছিল, গাইতেছিল আর বন্দোপাধ্যায় পরিবারের জন্য মঙ্গল কামনা করিতেছিল, এদিকে সেই সন্ধ্যা বেলায় দুই ডিঙ্গি আড়িনার ঘাটে লাগিল।

ঘাটে ডিঙ্গি দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়পত্নী বাহির হইয়া আসিলেন; দেখিলেন এক দিকে তাঁহার ভগ্নী আর এক দিকে স্বামী, মেয়েকে মধ্যে রাখিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া আসিতেছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায়পত্নী কাঁদিয়া উঠিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "কাঁদিও না ঈশ্বর ইচ্ছায় বাঁচিয়া আসিয়াছি এই ভাগ্য; কি কুক্ষণে পা বাড়াইয়া ছিলাম। তিনি মেয়েকে গৃহে রাখিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে লইয়া গেলেন। যমুনা মেয়েটীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহার আগ্রহে মহানন্দ তাহার দল লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে বাতাসা আসিল—ধীবরেরা উচ্চৈস্বরে লুঠের গান ধরিল। ইহারা গাইতে জানে, বাজাইতে জানে, ইহারা ভক্ত। তালে মানে কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। প্রাণেশচন্দ্রের কাণে কীর্ত্তনের সুর ভাল পোঁছিল না; সে বাহির বাড়ীর একখানি ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—শান্তিপুরের লোক ভাগ্যকুলে আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিঙ্গি চড়াও করিল কেন?

---

(১৩)

দাদা মহাশয়। দেখেছ, সংবাদ পত্রে কি লিখেছে। কি অত্যাচার!

অনন্ত। কি লিখেছে?

দাদা মহাশয় সংবাদ পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। অনন্ত ধরিবার পূর্ব্বে অমৃত উহা লুফিয়া লইল। জঙ্গলের মধ্যে একটা খরগোশের বাচ্চা খুঁজিয়া বাহির করা বরং সহজ কিন্তু মস্ত ধাউসী ছন্দের সংবাদ পত্রের স্তম্ভ হইতে—কি লেখা, কোন্ বিষয়ে লেখা—না জানিয়া একটা বাহির করা অসম্ভব। অমৃতের হাত হইতে অনাদি "দেখি" "দেখি" বলিয়া কাগজ কাড়িয়া লইল। এ স্তম্ভ, সে স্তম্ভ—এ পীঠ ও পীঠ—

ইস্মাইল। দাদা ম'শায়, ভায়ারা যে আঁধারে হাৎড়াচ্ছেন, ব'লে দেও না—বিষয়টা কি?

দাদা মহাশয়। প্রেরিত-স্তম্ভে দেখ—ভাগ্যকুল, রমণীর প্রতি ভীষণ অত্যাচার।

করুণা। বলেন্ কি, রমণীর প্রতি—দেখি, দেখি।

প্রেরিত-স্তম্ভ বর্জ্জেস টাইপে—অনাদি, অনন্ত, অমৃত, ইস্মাইল, ভরেন্দ্র দশ চোকে দু ছতর দেখিতে না দেখিতে করুণা চিলের মত ছোঁ মারিয়া কাগজ লইয়া উচ্চৈস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে—যাহা এতদিন ময়মনসিংহে আবদ্ধ ছিল তাহা ঢাকা জেলায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। স্থল অপেক্ষা জলপথ অধিকতর আপদসঙ্কুল। সে দিন ভাগ্যকুলে পদ্মাবক্ষে একটী বালিকার প্রতি যে অত্যাচার—"

ইস্মাইল। ভাগ্যকুল—তবে বা সেই বালিকা।

"একটী বালিকার প্রতি যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সঙ্গে কলিকাতার কোন কলেজের একটী ছাত্র না থাকিলে—

অনন্ত। তবে সেই মেয়ে, তবে এ আমাদের প্রাণেশচন্দ্র।

"একটী ছাত্র না থাকিলে ব্রাহ্মণ পরিবারের যে কি লাঞ্ছনা হইত বলা যায় না।"

ইস্মাইল। দাদা ম'শায় ঐ কার্ডখানা আপনার সঙ্গে আছে কি?

দাদা মহাশয় কার্ডখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কার্ড পড়া হইল—

"প্রাণেশবাবু ভাগ্যকুল নামিয়াছেন, সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ, একটী স্ত্রীলোক—বিধবা, ও একটী কন্যা—পরমাসুন্দরী।"

অনাদি। প্রাণেশচন্দ্র, তাতে কোন সন্দেহ নাই; যাক্ তবু সে একটা কাজ কর্‌লো।

দাদা মহাশয়। বিপন্না মহিলাদিগকে রক্ষা করা তোমাদের জীবনের এক উদ্দেশ্য এবং তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছ তার একটী প্রধান প্রতিজ্ঞা। প্রাণেশচন্দ্র—প্রাণেশ যদি হয়—প্রাণেশচন্দ্র যদি এই কাজ ক'রে থাকে তবে সে একটা মহৎ কাজ করেছে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। এ যে প্রাণেশ আমারও সেই বিশ্বাস।

সমস্ত প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করা হইল। উহাতে দুর্ব্বৃত্ত দমনের উপায় সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। নারীজাতিকে একবারে অসহায় অবলা করিয়া রাখিয়া তাদের আত্মরক্ষার পথে বাধা দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি কথার আলোচনা আছে।

তাঁহাদের ঐ মিলন-মন্দিরে তখন আরও অনেকে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন—নরেশ, নরেন্দ্র, সুবোধ, নবকুমার, শিবেন্দ্র ইত্যাদি। দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার ও দুর্ব্বৃত্ত দমন বিষয়ে আলোচনা হইতেছে।

নবকুমার। এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

শিবেন্দ্র। আমরা ছাত্র, আমরা কি করিতে পারি?

নরেশ। আমরা অনেক করিতে পারি। বন্ধের সময়ে দেশে যাইয়া কোন্ গ্রামে দুর্ব্বৃত্ত আছে তাহার সংবাদ লইতে পারি, দুর্ব্বৃত্ত ধরাইয়া দিতে পারি, মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে অর্থদ্বারা অত্যাচারিতের সহায়তা করিতে পারি।

সুবোধ। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে বিপদ বহু। তারপর সেদিন আমার একটী উকীল বন্ধু বলিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে দুর্ব্বৃত্ত দমন সম্বন্ধে যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভাল হয় নাই।

অনন্ত। কেন? দুর্ব্বৃত্ত দমিত হইলে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস পাইবে, উকীলের খোরাক কমিয়া যাইবে, তাই!

অমৃত। রোগের উপর ডাক্তারের জীবিকা, লোকের দুষ্প্রবৃত্তির উপর উকীলের উপজীবিকা;—এরূপ একটা উদ্দেশ্য আরোপ করা অস্বাভাবিক নয়।

সুবোধ। কিন্তু তাঁর ওরূপ বলিবার অন্য হেতুও থাকিতে পারে। যা হো'ক, এ সব কাজে বিপদ বহু।

দাদা মহাশয়। কাজ যখন ভাল, তাতে বিপদ যখন বহু, তখন বিপদের বহুত্বই ঐ কাজের গুরুত্বের একটী অকাট্য প্রমাণ।

ইস্মাইল। হজরত মহম্মদের জীবন উহার দৃষ্টান্তস্থল।

দাদা মহাশয়। কেবল মহম্মদ কেন, মহাপুরুষ মাত্রেরই জীবন উহার দৃষ্টান্ত স্থল। যিনি কোন সাধুকার্য্যে হাত দিবেন তাঁর জীবনেই অগ্নি পরীক্ষা পদে পদে। রমণীর প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে তা' দমন জন্য যথেষ্ট যত্ন করা আবশ্যক। নরেশ যা বলেছেন ঐ প্রস্তাব উত্তম। নারীজাতির রক্ষা, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্যতীত এই মৃত জাতির মধ্যে যথার্থ শক্তি সঞ্চারের কোন পন্থা নাই। ইউরোপের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তুলিয়া দেও, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও উন্নতি তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিবে না। মহিলাগণের শিক্ষা আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের মূল। স্ত্রীলোক শিক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার না করিলে, জাপান জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারিত না। রমণী শক্তি—রমণী প্রকৃতি—"পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনীং প্রকৃতিং" কুমারে তা পড়িয়াছ; "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" চণ্ডীতে তা শুনিয়াছ। মহিষাসুরের দেব-নির্য্যাতন বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে যে জ্যোতি নির্গত হইয়াছিল তাহা "একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা"। বৃত্রাসুর বধের পর দেবগণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া শিক্ষা দিবার জন্য যে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল, উমা হৈমবতী ব্যতীত

কেহ সেই জ্যোতিকে চিনাইয়া দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে বন্দে মাতরং অপূর্ব্ব সঙ্গীতে জন্মভূমির মাতৃভূমির যে স্তুতি করিয়াছেন, মহিলাগণই ঐ বন্দে মাতরং এর "মা"। পত্র-প্রেরক যথার্থই লিখিয়াছেন—"নারীজাতিকে অসহায় করিয়া রাখা হইয়াছে।" তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা পালন করিয়া কৃতার্থ হও। প্রাণেশ যে এই সময়ে এই সুযোগ পাইয়াছে ইহাতে তোমরা অবশ্যই সুখী হইয়াছ।

অনন্ত। আমি যদি ঐ জল-দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইতাম।

অমৃত। আমি—

সকলেই "আমি" "আমি" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দাদা মহাশয়। তা হবে। এক্ষণ প্রাণেশের তল্লাস চাই।

অনাদি। সংবাদপত্র হইতে সংবাদদাতার নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইলে তাহাদ্বারা অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

দাদা মহাশয়। অমৃত তো এই সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন; অমৃতের উপর সংবাদ দাতার নাম ও ঠিকানা জানিবার ভার থাকিল। প্রাণেশকে তোমাদের মধ্যে না দেখিয়া কত ব্যথা পাইতেছি, বুঝিতে পার।

সকলে দাদা মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইল। ক্ষণেক পরে তাহারা সমস্বরে তাহাদের নিত্যব্রত "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সুভাষিতাবলী।

৩৬। দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং ঊষর ক্ষেত্রের ন্যায়—বিদ্যা-বিহীন মনুষ্য, মনুষ্য-দেহধারী মাত্র।

৩৭। শর-শয্যাশায়ী কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"বৎস! ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তনকরা অতীব দুষ্কর। জীবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রচলন করিয়াছেন, অতএব যাহা জীবগণের অভ্যুদয়-সমন্বিত, তাহাই ধর্ম্ম।"

৩৮। যাহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্লেশ-স্বীকারে পরাঙ্মুখ,—যাহারা দীন-দরিদ্রদিগকে কিছু দান না করে,—তাহারা পাপের আয়তন। এতাদৃশ মনুষ্য মনুষ্যাকৃতি প্রেত-সদৃশ।

৩৯। যাহাদের ধর্ম্মে কপটতা নাই—বাক্য সকল সত্য ও প্রিয়তর,—অর্থ সকল সৎকার্য্যে নিয়োজিত,—তাহারা মানবগণের নিদর্শন-স্বরূপ।

৪০। যাহা হইতে কেহ ত্রস্ত হয় না, যিনি আপন মানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপরের সম্মান করেন, মনে হয় ধরিত্রী তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, স্বকীয় বসুমতী নাম সার্থক করিয়া থাকেন।

৪১। যে নির্লজ্জ লোক অশ্লাঘনীয় কর্ম্মের দ্বারা শ্লাঘা করে, তাদৃশ পুরুষাধম যত্নতঃ উপেক্ষিতব্য। অল্পমতি লোকের বাক্যে বুদ্ধিমান্ বিচলিত হন না।

৪২। ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অসূয়ার আবির্ভাব হয়;—সর্ব্বভূতে দয়াদ্বারা তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

৪৩। লোভ হইতে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ পর দোষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ক্ষমা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হয়।

৪৪। কুল মর্য্যাদা, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য হইতে মদ জন্মে; ঐ সকলের যথার্থ অবগত হইতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ মদ বিনষ্ট হয়।

৪৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, দাস দাসী স্বীয় ছায়া-স্বরূপ; অতএব ঐ সকল ব্যক্তিদ্বারা উত্যক্ত হইলেও অসম্বর হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পালন করা উচিত।

৪৬। যে শঠ, সে অন্যকেও শঠ জ্ঞান করে। বিশুদ্ধ-হৃদয় সাধুব্যক্তি সতত মুদিত ও নির্ভয়-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন; তিনি আত্মেতর ব্যক্তিতে সহসা দুশ্চরিত দেখিতে পান না।

৪৭। যিনি সমস্ত জীবকে অভয়-দান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—মালদহ।

দেব-বালা।

অঞ্চলে কুড়া'য়ে লয়ে ছড়ান-রতন
কে তুমি লাবণ্যময়ি! করিছ গমন
অরুণ-পুষ্পিত-পথে—ত্রিদিব-অঙ্গনে?
সারা রজনীর খেলা স্নিগ্ধ-শান্ত-ক্ষণে

সকল-সমাপ্তি মাঝে হইল কি শেষ
বিশ্ব-মনোরমা অয়ি! জাগায়ে ত্রিদেশ
নূপুর-নিক্কণ তব উঠিছে ধ্বনিয়া
সুষুপ্ত জগত-চিত্তে রহিয়া রহিয়া!
নিরমল গন্ধবহ হে দেব-সুন্দরি,
শ্রীঅঙ্গে চর্চ্চিত তব মঙ্গল-কস্তুরী
দূর-বসুন্ধরা-বক্ষে আনিছে উড়ায়ে
অসীম আনন্দ ভরে! তুলিছে ফুটায়ে
করুণ-চাহনি তব অয়ি বরাঙ্গনে।
বিকচ কুসুম-কলি কাননে কাননে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

একটী আলো।

কত যে বরষা কত যে ঝঞ্চা
কত বান বহে গেল,
'কুসুরের কুলে' তবু রাতে জ্বলে
এখনো একটী আলো!
কেহ বলে উহা নয়নের ভুল,
কেহ বা আলেয়া বলে,
জানে শুধু ভাল কারণ ইহার
গ্রামে বাগ্দীর দলে।
শুনি বলে তা'রা ওই খানে ছিল
এক দুখিনীর বাড়ী,
ভগ্ন ভিটার ও বকুলগাছ
নিজ হাতে রোপা তারি।
সে ছিল ওখানে অনেক যাতনা
অনেক কষ্ট সয়ে—
আঁধার কুটীরে আশার প্রদীপ
একটী তনয়ে লয়ে।

থাকিতে নারিত ছেলেরে বারেক
কাছ ছাড়া করি কভু,
কষ্টে মরিত, আঁচলের নিধি
আঁচলে থাকিত তবু।
একে একে ছেলে বড় হ'ল তার
খাইবে কেমন করে
প্রভাতে উঠিয়া "পেতে খাটিবারে"
যেতে হ'ত নিতি দূরে।
প্রভাত হইতে সারা দিনমান
মনিবের কাজ সারি,
'আ'ল' পথ দিয়ে গান গে'য়ে গে'য়ে
ফিরে সে আসিত বাড়ী।
যদি কোন দিন বেশী রাত হ'ত
ফিরিতে তাহার ঘরে,
আশা পথ চেয়ে রহিত জননী
ধরি দীপখানি করে।

এক রজনীতে এলো না তনয়,
মাতা সারা নিশি জাগি,
ক্ষণে শতবার দ্বারে ছুটে আসে
ব্যাকুল সুতের লাগি
বাতাসে কবাট যদি নড়ে আহা
আশাতে ভরে যে বুক,
দ্বার খুলে দেখে আঁধার আঁধার,—
নিরাশে শুকায় মুখ।
পোহাইল রাতি এলো না তনয়
শেষ আশা গেল টুটি,
নয়নে আসিল অশ্রুজোয়ার
ভূমে সে পড়িল লুটি।
আত্মীয় জন বুঝাইল তারে
মরেনি তনয় তার,
চাকুরী পাইয়া গেছে দূরদেশ
গঙ্গার আন পার।
কোথায় তনয় কোথা অভাগিনী
দেখা হইবার নয়,
তবু সে বুঝিল, মরে যাওয়া চেয়ে
দূরে যাওয়া প্রাণে সয়।
আশায় বাঁধিল ভাঙা বুকখানি
মুছিল নয়নবারি,
জল দিয়ে নিজে রাখিল জিয়ায়ে
তনয়ের তরু সারি।
ছেলের হাতের মাছধরা ডিঙী
রাখিল যতন করে,
তনয় যে তার চাকুরী করিয়া
ফিরিয়া আসিবে ঘরে।

সন্ধ্যায় একা বিবশা দুখিনী
গৃহ-তুলসীর তলে
পড়িয়া রহিত ভিজাইত মুখ
দুটী নয়নের জলে।
প্রতিদিন রাতে দীপখানি জ্বালি
দূর পথিকের আশে
তৃষিত নয়নে বসিয়া রহিত
আপন বিজন বাসে।
সারা নিশি ধরি শুনিত অভাগী
মাঝিদের সারি গীতি
নিশিথ তরীর সব দাঁড়ি মাঝি
ও আলো দেখিত নিতি।
কতদিন হ'ল অভাগিনী হায়
গেছে চলি ধরা ছাড়ি,
বিশটী বরষা তপ্ত ভবনে
ঢেলেছে শান্তিবারি।
মত্ত ঝটিকা বরষ বরষ,
গেছে সেই দিকে চলি,
সন্ধ্যায় সেই আলোটী কিন্তু
তেমনি উঠে গো জ্বলি।
কোথা ছেলে তার আসিল না ফিরে
আছে কোন দূরদেশে,
'কুমুরের' বানে ভবনের শেষ
চিহ্নও গেছে ভেসে।
তবুও জ্বলিছে জ্বলিবে এখনো
কত নিশা নাহি জানি,
ভাবনা জড়িত জননী হিয়ার
স্নেহের প্রদীপখানি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আরতি।

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।
বিলাসের বশে হারায়ে চেতন,
বহুদিন মোহে ছিনু নিমগন,
বহুদুখ শিরে করিয়া বহন
নিরাশার ঘোর আঁধারে;
বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।

সহসা ভেঙেছে এ মোহের খেলা,
আঁখি মেলে দেখি হ'য়ে গেছে বেলা;
উঠ এই বেলা, উঠ এই বেলা
কে যেন ডাকিল আমারে;
বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।

কি দিয়ে পূজিব নাহি কোন ধন,
দীন আমি, অতি দীন নিবেদন,
সুজলা সুফলা জননী চরণ
অতুল ভুবন মাঝারে।
বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।

প্রাণে নব আশা হৃদে নব বল,
যদিও মা, কিছু নাহিক সম্বল,
তনয়ার তব আছে আঁখি জল
ভকতি হৃদয় মাঝারে;
বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।

সঁপিতে জীবন তোমারি চরণে,
বরদে! বর দে দীনহীন জনে,
ও চরণ ধরি, ভয় নাহি করি
জীবনে মরণে কাহারে।
বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে।

শ্রীউষাপ্রমোদিনী বসু।

৺আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩১৩। অষ্টম সংখ্যা।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসু।

যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ পরবর্ত্তী জনসমাজের জন্য যে আদর্শ রাখিয়া যান দুই প্রকারে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কখনও তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গ্রহণ করিয়া নূতন কর্ম্মিপুরুষের আবির্ভাব হয়, কখনও বা একই জীবনে তাঁহাদের সমগ্র গুণাবলির সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যুগপ্রবর্ত্তকের ভিন্ন ভিন্ন গুণের আদর্শে গঠিত মহাপুরুষগণ, বৎকালে আপন আপন স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত চরিত্রচ্ছটায় চারিদিক্ আলোকিত করেন, তৎপরবর্ত্তী সময়ে একাধারে সকল গুণের সমাবেশ অতি স্বাভাবিক। মহাত্মা আনন্দমোহন বসু প্রকৃতির এই শিল্প নৈপুণ্যের ফল।

রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহাত্মা বিদ্যাসাগর, মনস্বী কৃষ্ণদাস পালের জীবন যুগস্রষ্টার চরিত্রের বিভিন্ন আদর্শের চরম পুষ্টি। রাজা রামমোহন নূতন যুগের যে রেখা চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহার ধর্ম্মের দিক্ পূরণ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর সমাজের দিক্, কৃষ্ণদাস পাল রাজনীতির দিক্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের বিশেষত্ব স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। দেবেন্দ্রনাথে যোগীর তন্ময়ত্ব, কেশবচন্দ্রে ভক্তি এবং বিশ্বাসের প্লাবন ও উদ্দীপনা, বিদ্যাসাগরে অপরাজিত দয়া ও জনহিতৈষিতা এবং কৃষ্ণদাসে রাজনীতিক বিচক্ষণতা আদর্শের উপযুক্ত উপকরণ প্রদান করিয়াছিল। বিধাতা একাধারে দেবেন্দ্রনাথের তপস্যা, বিদ্যাসাগরের হৃদয় কেশবচন্দ্রের ভক্তি ও কৃষ্ণদাসের মনস্বিতা দেখিবার জন্যই যেন আনন্দমোহনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আনন্দমোহনের জীবনে এরূপ বিশেষত্ব ছিল যাহা দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। আজ তাঁহার কার্য্যাবলীর

সূক্ষ্ম চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার চরিত্রের আলেখ্য প্রদান করিব, এমত সম্ভাবনা আমাদের নাই। সমুজ্জ্বল রত্নচ্ছটা যেমন আবরণ ভেদ করিয়া আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির হয়, তাঁহার অনাবিল আড়ম্বরহীন কর্ম্মজীবনের মধ্যেও তেমনি কতকগুলি বিশেষত্ব সাধারণ ভাবেই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইত। আজ তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

মনু বলিয়াছেন—

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥

বাল্য জীবন হইতে আনন্দমোহন এই মন্ত্রের প্রধান সাধক। তপস্যার অর্থ যদি ঈপ্সিত লাভের জন্য একাগ্রতা হয় তাহা হইলে আনন্দমোহনকে আমরা প্রকৃত তপস্বী বলিব। তাঁহার একাগ্রতা সাধারণ শ্রেণী হইতে বহু উচ্চে। যেখানে বাহ্য জগত অন্তর্জগতে বিলীন হয়, সমস্ত চিত্তবৃত্তি এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির নিকট মস্তকাবনত করিয়া তাহার দাসত্বে নিয়োজিত হয়, তাঁহার একাগ্রতা এই প্রকারের ছিল। ঐ একাগ্রতা আয়াসে অর্জ্জিত হইবার নহে, —উহাই প্রকৃত প্রতিভা। সাধনা উহার ধর্ম্ম। ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপ কর্ষণ চাই। শক্তির উপযুক্ত সাধনা চাই। এই দুইটীর একত্র সমাবেশ না হইলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে না। প্রকৃতি আপন শিল্প নৈপুণ্যে আনন্দমোহনের মধ্যে যে উচ্চ প্রতিভার সংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তদনুরূপ সাধন শক্তিতে ভূষিত করিতেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যেখানে অসাধারণ কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত সেখানেই এই দুই শক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ। বিদ্যাসাগর ছাত্র জীবনে কিরূপ পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার জীবনে সাধনার কিরূপ বিকাশ ছিল, তাহা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা বাল্যজীবনে কৃতকার্য্যতার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নাই অথচ ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে এই সত্য অধিকতর স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইবে। কেশবচন্দ্র সেন বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিচিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহাদের অতুল যশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, তখনকার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহাদের সাধনা কি অপূর্ব্ব। শুনিয়াছি উমেশচন্দ্র বৃদ্ধবয়সেও গভীর রজনী পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন; বহু সময় পাঠ করিতে করিতে তাঁহার রজনী প্রভাত হইয়া যাইত।

ছাত্রজীবন হইতেই আনন্দমোহন তপস্বী, ছাত্রজীবনেই তিনি সাধক এবং সিদ্ধ। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার ইতিহাসে অদ্ভুত সাধনার বিকাশ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

একদিকে প্রকৃতির বিপুল দান, অন্যদিকে সাধনার ও তপস্যার পূর্ণ প্রভাব সুতরাং সারস্বতমন্দিরে তাঁহার বৈজয়ন্তী উচ্চতম চূড়ে স্থান পাইবে বিচিত্র কি? তিনি কলিকাতায় বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারতীর শ্রেষ্ঠতম জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচ্যতম প্রান্তের এক অজ্ঞাত কুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়া আনন্দমোহনের গৌরবচ্ছটা প্রতীচ্য প্রদেশেরও শেষ সীমা স্পর্শ করিয়াছিল। ভারতীয় যুবক যে দিন ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম গণিত পরীক্ষায় র‍্যাংলার হইলেন সে দিন ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় প্রতিভার নূতন পরিচয় পাইয়া নিশ্চিতই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কেবল ছাত্র জীবনে নহে, পরিণত বয়সেও তিনি সর্ব্বদা সমাধিস্থ মহাপুরুষ। তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, একদিন তিনি আনন্দমোহন বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাটী গমন করেন। যখন তিনি তথায় গিয়াছেন তখন আনন্দমোহন পূর্ব্ববঙ্গের একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র করিতেছিলেন। বন্ধু সম্মুখে কিন্তু আনন্দমোহনের যেন বাহ্যদৃষ্টি সমুদা অভ্যন্তরে লীন হইয়া গিয়াছে। তিনি তথায় "নবদ্বার নিষিদ্ধ বৃত্তি"। সুতরাং বহুক্ষণ প্রিয় সুহৃদের সহিতও সম্ভাষণ করিলেন না; বন্ধু আনন্দমোহনের প্রকৃতি জানিতেন, তিনি বিস্মিতনেত্রে তাঁহার গভীর সমাধি দেখিতেছিলেন; অবশেষে যখন পাঠ শেষ হইল, আনন্দমোহন তখন ধ্যাননেত্র উন্মীলন করিলেন, তিনি প্রিয় বন্ধুকে পাইয়া যেমন সুখী হইলেন, তাঁহার অভ্যর্থনায় নিজের ত্রুটী হইয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অতঃপর ছাত্র জীবনের গৌরব ললাটিকায় বিভূষিত হইয়া আনন্দমোহন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন ধর্ম্মের সুশুভ্র আলোকে সর্ব্বদা হাস্যময়, যেখানে এত প্রেম এত প্রীতি এত মধুরতা যে তাঁহার আনন্দমোহন নামের অক্ষরেঅক্ষরে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পুণ্য জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত। এক্ষেত্রে তাঁহার পারিবারিক জীবন, তাঁহার সংসর্গ, বিধাতা অনুকূল করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। বৃক্ষের সতেজবৃদ্ধি একমাত্র ভূমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে না, উহারজন্য উপযুক্ত আলোক চাই, বায়ু চাই। তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার জীবন গঠনের নিমিত্ত বিধিদত্ত আলোক ও বায়ু; মাতার

স্নেহশীল হৃদয় হইতে তিনি দয়ার মন্দাকিনী লাভ করিয়াছিলেন, ভ্রাতার মধুর স্বভাবে তাঁহার জীবন দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিল,—সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মপ্রবণতায় তাঁহার ধর্ম্মের জ্যোতি আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। ইহার উপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ। যুগধর্ম্মের নূতন শিক্ষায় তাঁহার চিন্তাস্রোত নূতন দিক্‌বর্ত্তী হইতেছিল; সুতরাং উহা যখন কর্ম্মের বিশালক্ষেত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইল তখন দেশ নূতন সম্পদে বিভূষিত হইবে না কেন? তিনি বাল্যজীবনে ময়মনসিংহ নগরে "মনোরঞ্জিকা" সভা স্থাপন করিয়া দেশহিতৈষণার যে অঙ্কুর বপন করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের মুক্ত বায়ুস্পর্শে তাহা নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। এদেশে আসিয়াই তিনি নূতনভাবের নবপ্রেরণা লইয়া অন্যান্য সহযোগীদের সহিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ছাত্রসভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ, বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রভৃতির স্থাপনায় একসঙ্গে রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মনীতির মধ্যে ত্বরিত কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিলেন।

দেশ-হিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া আনন্দমোহন ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বৈদেশিকের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলে ভারতবাসীকে মানসিক শক্তির উচ্চ পরিচয় দিতে হইবে। তিনি নিজ জীবনের সফলতা হইতে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন; তাহার ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব তাহাকে দেশে ও বিদেশে উচ্চ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল, এই কৃতিত্বের ফলে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে তৎকালীন অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সসম্মানে রাজপ্রতিনিধির নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, এই কৃতিত্বের ফলে তিনি ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন সুতরাং দেশের হিতকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই শিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

তিনি বাল্যে যে স্থানে অধ্যয়ন করিতেন আজ সেই ভূমির উপর তাঁহার স্থাপিত ময়মনসিংহ সিটিকলেজ ও স্কুল সহস্র সহস্র লোককে শিক্ষা বিতরণ করিতেছে। কলিকাতায় যে স্থানে ভারতাশ্রম ছিল, তিনি যে স্থানে প্রার্থনা করিতেন আজ সে স্থানে গৌরব দীপ্ত সিটিকলেজ উচ্চ শিক্ষার পতাকা উড়াইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। এ দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মহাত্মা বিদ্যাসাগর যে নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এ পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কয়জন সম্পূর্ণ নিষ্কাম

প্রাণে এই ব্রতের সাধনা করিতে পারিয়াছেন? মহাত্মা আনন্দমোহন বসু স্বার্থকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিটিকলেজ স্থাপন করিয়া তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে উহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরিশেষে স্বত্বাধিকারিত্ব ত্যাগ করিয়া উহাকে একটী সাধারণ সভার অধীন করিয়া দিলেন; কিন্তু নিজে ভক্ত সেবকের ন্যায় চিরদিন উহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন।

আনন্দমোহন এক মাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, শিক্ষা বিস্তারের সহিত তাঁহার আজীবন সম্বন্ধ ছিল। নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তিনি অজস্র পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উদ্যোগে বেথুন কলেজ বর্ত্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকল্পেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে দুইবার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত করেন।

সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চর্চ্চার প্রথম প্রবর্ত্তকরূপে আনন্দমোহনের নাম চিরদিন এ দেশবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবে। ইংলণ্ড হইতে যে কয়টী মহান্ আদর্শ লইয়া আনন্দমোহন জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের ছাত্রগণের অনুকরণে যুবকগণের মধ্যে নৈতিক আদর্শ সংস্থাপন এবং এদেশে রাজনৈতিক আলোচনার বহুল প্রচার, এই দুইটী প্রধান; এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসেবার পংক্তিচ্যুত হইয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আনন্দ তাঁহাকে সহযোগী পাইলেন। এ মণিকাঞ্চনের পবিত্রসংযোগে এদেশ নূতন উদ্দীপনায় জাগিয়া উঠিল। তাঁহাদের রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান ফল, লর্ড লিটনের প্রেস-এক্ট ও রিভার্স টমসনের চৌকীদারী আইনের প্রতিবাদ এবং প্রজাভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইনের সংস্কার। ইঁহারা এই উপলক্ষে এদেশে আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

রাজনীতিক জীবনে আনন্দমোহন বসুর কৃতিত্ব অসাধারণ বিশেষত্বে পরিপূর্ণ; সে বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বুঝা উচিত। তাঁহার নিষ্কামজীবনে আত্মলোপের একটা সযত্নপ্রয়াস প্রতিকার্য্যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু আপনাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "He was born to lead & never to be led." আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে অন্য কথা। তাঁহার উচ্চ

প্রতিভা, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার অসাধারণ অনুধাবনশক্তি এবং সুনির্ম্মল চরিত্র তাঁহাকে নেতৃত্বের সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া বিশ্বহিতে আত্মদান করিতে ভাল বাসিতেন। দেশ হিতৈষণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল কিন্তু তিনি দেশহিতৈষী (patriot) নাম গ্রহণ করিতে কখনও অভিলাষী ছিলেন না। উচ্চ প্রতিভার সহিত অহং জ্ঞানের (Ego) প্রায়শই একটু নিকট সম্পর্ক দেখা যায়। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া বহু সময়ে অপরের ব্যক্তিত্বের উপর অন্যায় আঘাত করেন; কিন্তু আনন্দমোহনের জীবন অহং জ্ঞানের মলিন স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ছিল; তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অসাধারণ তেজস্বিতা এবং অদম্য উৎসাহ, গাম্ভীর্য্য ও উদার-শান্ত গুণের কাচ পাত্রে স্থাপিত হইয়া এক দিব্য শোভা ধারণ করিয়াছিল; এ জন্য তিনি রাজনীতিক বিচক্ষণতায় বর্ত্তমান সময়ের নেতৃবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু রাজনৈতিকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কোলাহলের ভিতর আনন্দমোহনের নাম কখনও শ্রুত হয় নাই। তাঁহার মধুর প্রকৃতি চিরদিন আত্মত্যাগশীল; সুতরাং উহা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিত না। তথাপি কি আনন্দমোহন রাজনৈতিক জীবনে অজ্ঞাত ছিলেন? এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কে তাঁহার নাম জানিত না? প্রতিভার পূজা করিতে জগৎ বাধ্য; উহা যতই আত্মগোপনশীল হউক, জগৎ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। বহ্নি কখনও বস্ত্রে আবৃত হইতে পারে না; প্রতিভা কখনও অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এই জন্যই যে আনন্দমোহন একদিন বোম্বে জাতীয় মহাসমিতিতে বিশিষ্ট দর্শকগণ মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হন নাই, দশবৎসর যাইতে না যাইতেই সেই আনন্দমোহন সমস্ত দেশবাসীর উচ্চতম শ্রদ্ধার মুকুট পরিধান করিয়া মান্দ্রাজ-অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ঘটনার কথা বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হন নাই। প্লেগ নিবারণ কল্পে বোম্বে-গবর্ণমেণ্ট কতগুলি বিধিব্যবস্থার প্রচলন করেন; উহা বোম্বে-বাসীর তত মনঃপূত হইয়াছিল না; তাহারা গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এইজন্য তথায় নানারূপ দুর্ঘটনার অনুষ্ঠান হয়; ইহাতে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ সম্প্রদায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন। র‍্যাণ্ড ও এয়ারেষ্ট সাহেবের হত্যাকাণ্ডকে তাহারা রাজবিদ্রোহের পূর্ব্ব

সূচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। সেই দুঃসময়ে আনন্দমোহনের ন্যায় কৃতীপুরুষ ইংলণ্ডে না থাকিলে এ দেশের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইত। তিনি সভার উপর সভা করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই, সে বক্তৃতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যাঁহারা সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহারা জানেন উহাতে কত শক্তির সমাবেশ। কখন প্রবল জলধির গভীর গর্জ্জন, কখন কবির উন্মুক্ত ঝঙ্কার, কখনও বীরের দৃপ্ত হুঙ্কার, কখনও শান্তরসের মনোমোহকরপ্রবাহ, যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে যুগপৎ ক্রীড়া করিয়া যাইত। তাহার বক্তৃতার মধ্যে একাধারে কাব্যের সৌন্দর্য্য, আলঙ্কারিকের অলঙ্কারচ্ছটা এবং সংগীতের মনোহারিত্ব ছিল। তিনি ছাত্র জীবনের অবসান সময়ে ব্রাইটন নগরে এক বক্তৃতায় ফসেটের ন্যায় ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার অপূর্ব্ব শক্তিতেই তিনি ইংলণ্ডবাসীর ভ্রমাত্মক ধারণা সহজে দূর করিতে সমর্থ হইলেন।

তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য, তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সহিত তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। তিনি যে সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মস্রোতের সমুদায় বাধা দূর হইয়াছিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও সময়ের অভাব এ দুইটীর প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নহে।

বিশ্বাস ও প্রীতি ধর্ম্মের মূল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি যেখানে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটিয়া যায়, তখন তাহাকে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। আনন্দমোহনকে আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে নিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার স্বাধীন চিন্তাস্রোত আপনার জন্য নূতন আদর্শ গঠন করিয়া লইয়াছিল। উহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সার সঙ্কলন ছিল, উহাতে ভাগবত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ ছিল। আনন্দমোহন ভগবানের নামে সর্ব্বদা বিভোর ছিলেন। তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও ধর্ম্মময় প্রাণ তাঁহাকে ঋষির যোগ্য আসনে উন্নীত করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে কোনদিন থাকিবার সুবিধা পাইয়াছেন তিনিই একথা স্বীকার করিবেন। তাঁহার ভগবৎপ্রেমে মন্দাকিনীর মুক্ত ধারা বহিত। ভগবানের নামে, ভক্তিপ্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁহার মুখে এক দিব্যকান্তি ফুটিয়া বাহির হইত।

প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সিটী-কলেজ Re-union উপলক্ষে একটী অল্পবালক আশ্চর্য্যরূপে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছিল। অনেকেই তাঁহাকে অনেক রকম শ্লোক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন কিন্তু আমার মনে পড়ে, আনন্দমোহন এই শিশুর মুখে ভক্তির কথা শুনিতে ব্যগ্র হইয়াই ব্যাকুলভাবে এক একটী ভক্তিমূলক শ্লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং যখন শিশু শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতেছিল তখন তাঁহার হৃদয় যেন আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সে সময়ের সেই প্রশান্তমুখের চিত্রখানি আজিও যেন সম্মুখে ভাসিতেছে।

তাঁহার উদারতা, সহৃদয়তা এবং বন্ধুপ্রীতিও অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি ব্যবহার মাধুর্য্যে সকলকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার করিয়া ফেলিতেন। ময়মনসিংহের স্মৃতি তাঁহার মনে কতই মধু ঢালিয়া দিত। ময়মনসিংহ হইতে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতেন না; অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ময়মনসিংহের সমস্ত সংবাদ জানিয়া লইতেন। তাঁহার বাসাবাস স্থানের জামগাছটীর কথা পর্য্যন্ত তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিতেন না। তাঁহার সহৃদয়তার কাহিনী অসংখ্য। আজ 'আরতির' ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ভ্রাতৃগণের অকাল মৃত্যুতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার জীবনলীলা এত শীঘ্র সাঙ্গ হইয়া গেল। যখন বঙ্গবিচ্ছেদের ভীষণ দুশ্চিন্তায় ময়মনসিংহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল তখন আনন্দমোহন শেষ সময়ের জন্য এখানে পদার্পণ করেন। ময়মনসিংহ সেদিন চিরকালের জন্য তাঁহার সে সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া লইয়াছে, তাঁহার মধুর বাক্য শুনিয়া লইয়াছে; আর কাহারা তাঁহাকে দেখিবে না, তাঁহার মধুময় বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক আর ছুটিয়া আসিবে না।

বড় দুঃসময়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এদেশে এখন নবজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে মতবিরোধের চঞ্চল স্রোত বহিয়াছে। আনন্দমোহনের ন্যায় দক্ষ ও সাধুচরিত্র পুণ্যাত্মা এ সময়ে জীবিত থাকিলে বহু সঙ্কটস্থলের সহজে মীমাংসা হইত, দেশে আত্মকলহের বিষাণ বাজিয়া উঠিত না।

তিনি জীবনের অপরাহ্ণে অখণ্ড বঙ্গ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; উহা নির্ম্মিত হইলে তাঁহার রাজনৈতিক তপঃসিদ্ধির এক উজ্জ্বল স্তম্ভ হইয়া থাকিবে। আর তাঁহার পুণ্যজীবনের আদর্শ বাঙ্গালীর চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে বুঝিতে পারিব, তাঁহার প্রতি আমরা প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীশরৎকুমার সেনগুপ্ত।

নৈষধ। *

সম্প্রতি ঢাকা জেলার অন্তর্গত, বেজারা গ্রাম নিবাসী, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে কয়েকখানা অ-পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিব।

প্রস্তাবিত গ্রন্থ মহাভারতোক্ত নলোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কিন্তু উহার অনুবাদ মাত্র নহে। এই গ্রন্থে কবি কাব্যোপযোগী বিবিধ রস-বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হস্তগত পুঁথিখানা উল্লিখিত জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ-ভ্রাতা স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত। শ্লোকসংখ্যা অনুমান ৩৪০০। বাঙ্গলা ১২২১ সনের ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে এই পুঁথির লিখনকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে, এই অনুলিপি ৯২ বৎসরের প্রাচীন।

হস্তগত পুঁথি হইতে কবির সময় এবং পরিচয়, সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ভনিতার একস্থলে লিখিত আছে ;—

"মনে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, প্রণমি শঙ্কর-প্রিয়া,
যে করিল পূর্ণ মনস্কাম।
মনে করি বড় প্রীত, রসহাস্য নৈষধগীত,
বিরচিল বৈদ্য দুর্গারাম॥"

ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবির নাম দুর্গারাম এবং তিনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন। কবির সময় সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তিনি "কৃষ্ণচন্দ্রী যুগের" পরবর্ত্তী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে, বঙ্গভাষার দীনতা ক্ষালনের সূত্রপাতরূপে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রচারিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও কৃষ্ণরামকর্ত্তৃক এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীগণ হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাংশে সম্পন্ন। অবশ্য বিদ্যাসুন্দর কাব্য আলোচনা করিলে উহাতে অনেক অমার্জ্জনীয় অপরাধ পরিলক্ষিত হইবে, তথাপি উহার কুহকময় শব্দ-মন্ত্রে পাঠকের হৃদয়, বংশীস্রুত বিষধরের ন্যায় স্বতঃই বশীভূত হইয়া পড়ে, তাই এত দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর

* উক্ত নামধেয় দুইখানা পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি ; একখানা দুর্গারাম কৃত, অপরখানা রামনারায়ণ ঘোষ কৃত। (লেখক)

লোকসমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে!

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ লইয়া, তৎপরে বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর আরও, কয়েকখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'চন্দ্রকান্ত', 'কামিনীকুমার', 'জীবনতারা', এই কাব্যত্রয় পদ-লালিত্যে বিদ্যাসুন্দরেরই অনুরূপ কিন্তু নৈতিক অধোগতিতে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষাও একসিঁড়ি নীচে। আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থও সেই শ্রেণীর একখানা।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় 'বিহার', 'নারীগণের পতিনিন্দা' প্রভৃতি অধ্যায় ইহাতেও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কুরুচির পুতিগন্ধ নিবন্ধন নাসিকা বন্ধ করিয়া ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে, ইহার পদলালিত্য ও রচনার পারিপাট্যে হৃদয় মোহিত হয়। ভারতচন্দ্র ও আলোচ্য গ্রন্থকারের রচনায় এমন সৌসাদৃশ্য যে, এককথায় ইহাকে ভারতচন্দ্রে অনুপ্রাণিত বলা যাইতে পারে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে, কয়েকটী স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

"শোনলো হাসিনী গমনে মোহিনী,
রূপেতে সুন্দর বট।
কার দূতী হইয়া, ফির পট লইয়া,
রীতি দেখি অতি নঠ॥

"কুলশীলখানি, কর টানাটানি,
ই কিল দুর্ব্বার দল?
সুজন জানিল, নিকটে আসিল,
বুঝিতে নারিল খল॥

"সে মাইয়া কেমন করিবে এমন,
কি বুঝি হইব রাজী।
পুণ্‌খুলা ভজিব, জীবন সঁপিব,
দেখিয়া ভোজের বাজী?

* উদ্ধৃতাংশের যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন প্রদত্ত হইল এবং লিপিকারের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইল। এতদ্ব্যতীত ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। (লেখক)

"পাবে অপমান, যাইবে পরাণ,
দূর, দূর, দূতী উঠ।
সখীরে আনিবে, রাণীরে কহিবে,
কাটিয়া ফেলিবে ঠোঁট

"হংসী বোলে একি, ইত ভাল দেখি,
কপালের দোষ ঘোরে।
যার তরে মরি, এতদূর করি,
দূর, দূর কয়ে মোরে॥

"করেছিল মন, যশঃ উপার্জ্জন,
যশের কপালে খাঁক।
শুনি লাগে ত্রাশ, ইকি সর্ব্বনাশ,
লাজে কাটা যাবে নাক॥

আনিনু রতন, করিয়া যতন,
মাণিক্য, হীরার কণা।
আ-মূলে পাইয়া, দিল ফেলাইয়া,
না চিনি রাঙ্গ কি সোণা॥"

বিদ্যাসুন্দরের হীরে মালিনী, প্রস্তাবিত গ্রন্থের হংসিনী—উভয়েই দূতী, উভয়েই চতুরা, তথাপি হীরে মালিনী অধিকতর উজ্জ্বল কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা সুন্দরের হস্তনির্ম্মিত সামান্য কলা-কৌশল দর্শনেই এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার আর নায়ক সম্বন্ধে অন্যান্য দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থের নায়িকা তদপেক্ষা ধৈর্য্যশালিনী এবং গম্ভীরা তিনি চিত্রপটে নলের ভুবন বিমোহন রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়াও গর্ব্বিতভাবে দূতীর মুখের উপর বলিয়া দিয়াছেন—

পুতুলা ভজিব, জীবন সঁপিব,—
দেখিয়া ভোজের বাজী?

অর্থাৎ তিনি রূপজমোহে ভুলিবার মেয়ে নহেন। তৎপর তিনি দূতীরমুখে নলের ঐশ্বর্য্য এবং গুণ গরিমার বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় পটের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন এবং এবার পট-লিখিত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রকৃত পক্ষেই মোহিত হইলেন। এই রূপমোহ অস্বাভাবিক নহে। এস্থলে দময়ন্তীকর্ত্তৃক পটলিখিত নলের রূপবর্ণনা পাঠকগণকে উপহার দেওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

"শুনিয়া বচন, মনেতে মগন,
হইল নৃপতি নন্দিনী।
ছাড়িয়া সরম, ভাঙ্গিয়া ভরম,
কহিছে শুনগো হংসিনী;—

"ই কিল, ই কিল, বল কি দেখিল,
মনোহর রূপ পটে।
অসম্ভব যেই, শুধাইছি তেই,
সাচা নি এমনি বটে ?

"সহজে চমকে, ভুরু কি ঠমকে,
বিধাতা করেছে বেঁকা ;
কামের কামান সবে তার মান,
যখন হইবে দেখা।

"কুরঙ্গিনী সনে, তুলা কি নয়নে,
ছিছি কোন তার আঁখি!
ও দুটী নয়ন, নাচিছে যেমন,
কমলে খঞ্জন পাখী।

"ই কিল, ই কিল, কেমনে লিখিল,
মুখানি প্রকৃতির কাছে!
মনে অনুমানি, মুখচন্দ্রখানি,
রাহু খাপে বসিয়াছে।

মনগত ধন, বাঁধিতে কারণ,
দ্বিভুজ গঠিছে খাসা।
ঠেকিবে যখন, বুঝিবে তখন,
পুনঃ কি মোচন আশা ?

কৃষ্ণচন্দ্রী যুগকে বঙ্গসাহিত্যের সংস্কার যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে কবিগণ রূপ বর্ণনার দিকে বড় বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। রূপ বর্ণনায় যে যত কৃতীত্ব দেখাইতে পারিতেন, তাহার কাব্যই লোকসমাজে তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত। নিম্নে কবির আর একটী রূপ বর্ণনার নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

"পদ্মনালে কিবা তুলা কাঁটাগুলা তায়।
ভুজদণ্ডে গজশুণ্ডে কিছু অভিপ্রায়॥
অগ্নিতে পুরিয়া তারে কসিয়া কসনে।
তথাপি কনক নহে অঙ্গের বরণে॥
কমলে মুকুতা গাঁথা বিধির সৃজন।
অসম্ভব অনুভবে বুঝিনু দশন॥
লাজে মরে বিজুলী সে অঙ্গছটা হেরি।
নিগরিয়া মেঘেতে লুকায় বেরি বেরি॥
সিংহ কটি প্রায় কটি যে বলে বলুক।
আমি বলি ভয়ে সিংহ লুকায়েছে মুখ॥
জলজ পঙ্কজ দল জল বিনা রহে।
তবে বুঝি যদি তার নাভি দেখি কহে॥
নিতম্বেতে কি বন্ধিব বিধি মনোগত।
সৃজিয়া গোপন কৈল সোণার পর্ব্বত॥
রম্ভা নব তরু জিনি উরু করে দম্ভ।
কে দিল রতির ঘরে কনকের স্তম্ভ॥
নখ মণি কি বোলে তিমির করে আলা।
অনুতাপ ভাবি চাঁদ হিয়া কৈল কালা॥
গতি অতি মনোহর ঢুলাইয়া অঙ্গ।
প্রশংসে হংসিনী তার তুলিয়া প্রসঙ্গ॥
সৃজিছে সৃজনকর্ত্তা রূপ মনোহর।
দেখিলে চিনিতে নারে দেব কিবা নর॥

যোগগুরু মহাদেব বসি যোগাসনে।
সাধিতে যোগের ধ্যান অরি ছৈল মনে॥
সুররাজ আদি কত সুরাসুর স্মরি।
মোহিনী কাহার মন নাহি করিছে চুরী॥
ভূতলে ভুলেছে কত ভূপতি কোঁয়রে।
কত খানে কত জন বসি তপ করে॥
আছুক মানব দেব পক্ষী কোথা যায়।
শরীর সৌরভে অলি উড়ি পরে গায়॥

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপ সুললিত পদকদম্বে পরিপূর্ণ।

প্রাচীন বঙ্গ কবিগণের কাব্যগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয় যে, ছন্দ বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। কৃত্তিবাস কাশীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ছোট বড় সমস্ত কবির কাব্যগ্রন্থই ছন্দপতন দোষে অত্যধিক দুষ্ট। ভারতচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ কবিতার এই দীনতা মোচন করিয়া, পরবর্ত্তীগণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। অক্ষরের মাত্রা এবং যতি ঠিক রাখিয়া, শেষ অক্ষরের মিল রাখিলেই যে কবিতা শ্রুতি-মধুর হইবে, এমত নহে; এতদ্ব্যতীত কবিতার মাধুর্য্য রক্ষার আর একটী নিয়ম আছে;—কোন শ্লোকের প্রথম চরণের শেষাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর যে স্বরযুক্ত, পরবর্ত্তী চরণের শেষাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সেই স্বরযুক্ত হইলে কবিতা অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়। ভারতচন্দ্র কবিতার এই কল কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহার কবিতার মাধুর্য্যের ইহাও অন্যতম কারণ। প্রস্তাবিত গ্রন্থে এ নিয়মের লঙ্ঘন কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

প্রবাসে।

আজ্‌কে আমার ফুলের বনে,
মেঘের ধারায় বিষাদ আনে,
নিবিয়ে দেছে গন্ধভরা জোনাকজ্বালা রাতি,
গগনভরা অন্ধ আঁধার
শব্দবিহীন বিজন পাথার
জুটেছে এসে মলিনবেশে, বক্ষে আসন পাতি;
উপল-গড়া নির্ঝর তটে,
অশ্রুরাশি ফেনিয়ে উঠে,
হাওয়ার সনে সুখের সুরার উড়িয়ে গেছে নেশা,
বিরস বদন সজল আঁখি,
রক্ত-চেলির আঁচল রাখি
নীরব দুখে, ঢাক্‌ছে বুকে মলিনমুখী আশা।
নদীর তীরে তমাল শাখে,
ধারা-শীতল পাতার ফাঁকে
নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ছে ফুটে গভীর তমস্বিনী,
সুখের ছবি লুপ্ত করি,
দুঃখ যেমন মূর্ত্তি ধরি,
দাঁড়িয়ে আছে, মরণকূলে মুক্ত করি বেণী।
আজ্‌কে কেবল মনে পড়ে,
কোন্ সুদূরের স্নেহ-নীড়ে
দুঃখ কেমন বিঁধ্‌ছে কাদের হিয়ার পাতে পাতে,
সুখের কুঞ্জ নীরব দেখি
কাঁদছে করুণ নিশার পাখী
প্রতিধ্বনি, বনের মাঝে কাঁদছে তার সাথে!
তিলক রচি' কপোল'পরে
কে বসিছে একলা ঘরে,
হৃদের শূন্য সিংহাসনে আশার প্রতিমা।

শ্যামল অঙ্গে আঁচল টানি,
ঢাক্‌ছে বুকের মরুভূমি,
দেখলে কেউ নাই বুঝিবা অমঙ্গলের সীমা।
কোথায় পিতার অভয় বাহু,
বকুল-শাখে পিকের কুহু,
তৃপ্তি-বিহীন তৃষ্ণাভরা, প্রিয়ার হাসিরাশি,
পারুল চাঁপা স্বর্ণলতা,
হাস্য-উজল ভগ্নি-ভ্রাতা,
কোথায় তা'দের সোহাগভরা কোমল স্নেহ ফাঁসি!
আস্‌ছে না আর পিছু পিছু,
আমার প্রাণের স্বপন-শিশু,
কোথায় গো মা, মা জননী স্নেহের মন্দাকিনী,
কোথায় ঘৃণা, কোথায় স্নেহ,
কোন্ সোণালি দেশে গেহ,
ধূলার মাঝে কোথায় ঢাকা, আমার স্বপ্ন-খনি!
দিগন্তেরি ললাট পরে,
বনের শ্যামল আঁচল ধরে
চন্দ্র প্রথম পরায় যথায় জ্যোৎস্না আবরণ,
সেথায় সেই স্বপ্নপুরে,
স্নেহ আমার বন্দী করে
হেথায় শুধু স্বপ্ন দেখায় নিখিল নিরঞ্জন;

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ,
মুগঙ্গ।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩১৩। { নবম সংখ্যা।

এসিয়ার জাগরণ।

উন্নত গগন প'রে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জল ক'রে,
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া,
মানবে দেখায়ে পথ, চলেছে তড়িতবৎ,
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।

হেমচন্দ্র।

রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপান অপূর্ব্ব এবং উজ্জল জয়শ্রী লাভ করাতে পাশ্চাত্য জাতি সকলের অনতিক্রম্য শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, এবং প্রাচ্যদেশ সমূহে নব উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া এসিয়া সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল; এবার জাগ্রত হইয়াছে। চারিদিকে এই জাগরণের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে; সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে দেশপতির যথেচ্ছ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে সুশ্রুত রব উত্থিত হইয়াছে, এবং প্রজাপুঞ্জের স্বভাবজাত অধিকার ও স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সর্ব্বত্র জাতীয় মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রাচ্যজাতি সকলের শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইহার ফলে এসিয়ার দেশ সমূহে আধুনিক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহ জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ এসিয়া মহাদেশ এখন আর রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ নহে।

দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা চীন, পারস্য, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিতে পারি। রুষ-জাপ যুদ্ধের পর হইতে চীনারা নূতনভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রাজশক্তিরূপে পরিগণিত হইবার

* Indian Review নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের একটী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

নিমিত্ত তাহাদের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। চীনজাতি বহু শতাব্দীর জড়তা এবং রক্ষণশীলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাপ্তাহিক সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায়, জাগিয়া উঠিয়াছে। চীনজাতির দৃষ্টির সমক্ষে জাপান পাশ্চাত্য-শিক্ষা, পাশ্চাত্যশিল্প, পাশ্চাত্যশাসনপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য সুলভ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়া অতুল রাজশক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণ সহস্র সহস্র চীন-সন্তান জাপানের শিক্ষামন্দির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জ্জনে নিরত রহিয়াছে।

আট বৎসর পূর্ব্বে চীনরাজ মাত্র দুইজন ছাত্রকে জাপানে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদ্যার্থী চীন-সন্তানের সংখ্যা ৫৯১ ছিল। ১৯০১ সনের শেষভাগে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ২৪০৬ এ দাঁড়ায়। ১৯০৫ সনের নবেম্বর মাসে চীনরাজ গণনা করিয়া দেখেন যে, ৮৬২০ জন চীনসন্তান জাপানে জ্ঞানার্জ্জন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে বিদ্যার্থী চীন-সন্তানের সংখ্যা ন্যূনাধিক দশ হাজার। গত বৎসর চীনরাজ বহুসংখ্যক চীন-সন্তানকে জাপানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া এসিয়ায় এক মহা বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন। শত শত চীনযুবক শিক্ষা সমাপন অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বদেশীয়দিগকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে বিপুল ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন। ফলতঃ চীন-দেশে প্রজার হিতকর উদার শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠার জন্য এক্ষণে যে আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। কতিপয় সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশের শাসনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐ সকল দেশের শাসনপ্রণালী অবলম্বনে চীনের উপযোগী প্রজার হিতকর উদার শাসনপ্রণালীর উদ্ভাবন করিবেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনের বৃদ্ধা মহারাণী, শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে কোন কোন সংস্কার সাধন জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং জাপানের আদর্শে তত্রত্য শাসনপ্রণালী গঠিত হইবে।

একদিকে চীনদেশ উদার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে; অপরদিকে পারস্যদেশের সমগ্র সমাজ,—বিভিন্ন সম্প্রদায় সকল জাপান সুলভ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, এমন কি, চির রক্ষণশীল পুরোহিতগণও নূতনভাবের সংস্পর্শে নূতন জীবনের আকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িতেছেন। জাপানের হস্তে রুষের পরাভবের পর একজন পারসীক ধর্ম্মযাজক বলেন,

"জাপান ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলে রুষকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যদি এই সত্য উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আমরা অন্ধ। বিজ্ঞান বলে,— একমাত্র বিজ্ঞান বলে আমরা স্বদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। এস, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।"

এ কারণ পারস্যও জাপানের ন্যায় কর্ম্মঠ ও শক্তি সম্পন্ন হইবার অভিপ্রায়ে চীনের মত পাশ্চাত্য পন্থার অনুসরণ করিতে সংকল্প করিয়াছে। পারস্যের ধর্ম্মশিক্ষার্থী মুসলমানগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, ইতিহাস এবং বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। পারসী ভাষায় জাপানের একখানি ইতিহাস রচিত হইয়াছে; এই গ্রন্থ পারস্যের সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে সমগ্র পারস্যদেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কারার্থী দেশহিতৈষী দলের শক্তি পারস্যের অধিপতির হৃদয়ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংস্কারার্থী দলের সন্তোষ বিধান জন্য পারস্যের রক্ষণশীল উজীর পদচ্যুত হইয়াছেন। কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত হইল পারস্যের শাহ জাতীয় পরিষদের গঠন জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাজধানী তিহারণে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং করদ রাজগণের প্রতিনিধি, পুরোহিত, ওমরাহ, মহাজন ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইবেন। পরিষদের সদস্যগণ গুরুতর রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত প্রদান করিবেন। তদ্ব্যতীত স্বদেশের হিতকল্পে কোন সংস্কার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, তৎসম্বন্ধে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। প্রধান মন্ত্রীর যোগে পরিষদের অভিমত পারস্যাধিপতির নিকট তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হইবে এবং তিনি স্বাক্ষর করিলেই ঐ অভিমতানুসারে রাজপুরুষগণ কাজ করিবেন। পারস্যে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। পরিষদের জন্য ১৫৬ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে রাজধানী তিহারণ হইতে ৬০ জন এবং অন্যান্য স্থান হইতে অবশিষ্ট ৯৬ জন নিযুক্ত হইবেন। জাতীয় পরিষদের অভিমত অনতিক্রম্য হইবে বলিয়া শাহ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। দুই বৎসর পর পর সদস্যের নির্ব্বাচন হইবে *।

নব যুগের প্রভাবে পারস্যদেশের যথেচ্ছাচারী অধিপতিও কিরূপে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। আফগান

* পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে এবং বিপুল আড়ম্বরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানের অধিপতিও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আমীর প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতি সাধন জন্য বিপুল আয়াস সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আফগানিস্থানে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত যত্ন হইতেছে; হাজার প্রভৃতি নানা নগরে বস্ত্রশিল্পালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই সকল শিল্পালয়ে অতি উৎকৃষ্ট রেশম ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। আমীর সময় সময় পারিতোষিক প্রদান করিয়া শিল্পী ও শ্রমজীবিদের উৎসাহ এবং জনসাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধন করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি স্বরাজ্যে শিক্ষার বিমল আলোক বিস্তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমীর একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া আমি তোমাদিগকে জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতেছি, কারণ এই পৃথিবীতে যিনি জ্ঞানী, কেবল তিনিই শ্রেষ্ঠ।" লাহোর ইসলামীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আবদুল গণি, আফগানিদের রীতিনীতি এবং উন্নতি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আফগান জাতির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। তিনি বলিয়াছেন, কালক্রমে আফগানিস্থান জাপানের ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে। আফগানজাতি শিক্ষার প্রভাব অনুসারে আপনাদের রীতিনীতি গঠন করিতে অভ্যস্ত; তাহারা সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ নহে; অন্যান্য জাতির বিধান সকলের অনুসরণ করিয়া আপনাদের দেশের ও সমাজের উপযোগী বিধান প্রবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। বিশেষতঃ আফগানজাতি অতি উদ্যমশীল, আফগান ব্যবসায়ী ভারতের সর্ব্বত্র এবং অষ্ট্রেলিয়া, চীন, এমন কি, আমেরিকার ন্যায় দূরবর্ত্তী দেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আফগানিস্থানে জাতীয় বোধশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। আমীর প্রকৃতিপুঞ্জের নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাবের পরিপোষক। তিনি নূতন আকাঙ্ক্ষা—নূতনভাবের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য সরদার নশিরুল্লা খাঁর সহকারিতায় মন্ত্রণা সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ডাক্তার আবদুল গণির মতে এই মন্ত্রণা সভার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাচিত হইতেছে। আফগানরাজ্যের নানা বিভাগের পরিচালন জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ভার এই সভার প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে। সভার সভ্য সংখ্যা ৪২। সরদার নশিরুল্লা খাঁ এই সভার সভাপতি। সভ্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে সভার সকল বিষয় মীমাংসিত হইয়া থাকে। সভ্যগণ সবিশেষ সংযম ও যোগ্যতা সহকারে আপন আপন অভিমত

জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রীপতি সরদার নশিরুল্লা খাঁও স্বকর্ত্তব্য অতি প্রশংসনীয় ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। মন্ত্রণাসভা কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী আমীরের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিতে হয়। তিনি সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম অনুমোদন করিয়া থাকেন। যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে তিনি দ্বিমত করেন, তবে, ঐ বিষয় পুনরালোচনার জন্য মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ সমবেত হন। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, এই পুনরালোচনার পর আমীর স্বমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রণা সভার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

নূতন যুগ-মাহাত্ম্যে চির রক্ষণশীল চীন, পারস্য ও আফগানিস্থানের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই সকল দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই এবং জনপুঞ্জ, মিল, বার্ক এবং ব্রাইটের প্রভাবও লাভ করে নাই, তথাপি নূতন যুগের মাহাত্ম্যে জনপুঞ্জের হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতনভাবের উদ্ভব কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে, এবং তৎকাল বিদ্যা-বুদ্ধিতে ইংরেজের সমকক্ষ বহুসংখ্যক ভারতবাসী আবির্ভূত হইয়াছেন। এই সকল ভারতবাসী স্বদেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনে নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছেন।

বস্তুতঃ ভারতবাসীর দাবী একটুও বিস্ময়কর নহে। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক খ্যাতনামা লর্ড মেকলে ঘোষণা করেন, "ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইংরেজ রাজত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য সফল হইবে,—সেই উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে সায়ত্বশাসনের উপযুক্ত করা। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতে নূতন আকাঙ্ক্ষা,—নূতনভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে; ইংরেজ-রাজের শাসননীতি এই নূতন আকাঙ্ক্ষা,—নূতনভাবের বিরোধী হইবে না।"

ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে গভীর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জাপানের জয়লাভ জন্য নহে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথমে নবভারতের অস্ফুট ধ্বনি সুস্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হয়। তারপর জাতীয় মহাসমিতির সূচিত আন্দোলন ক্রমশঃ স্ফীতকলেবর হইয়া উঠিতেছে। এরূপ জাপানের জয়লাভে নবভারতের,

শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; নবভারত অধিকতর আশান্বিত, অধিকতর সাহসী, অধিকতর কর্ম্মশীল, অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।

চীন, পারস্য ও আফগানিস্থানের যথেচ্ছাচারী রাজন্যগণ সময়ের গতি উপলব্ধি করিয়া সবিশেষ বিজ্ঞতা ও সাহস সহকারে নূতন আকাঙ্ক্ষা,—নূতন ভাবের পরিতৃপ্তির জন্য অভিনব ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই তিনজন প্রাচ্য নরপতি প্রজার হিতকল্পে যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের বংশানুগত স্বত্ব ও অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরেজরাজের সমক্ষে অতি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত; ভারতের শাসননীতি এই পরিবর্ত্তনের যুগে কোন্‌পথে চালিত হইবে, তাহা এখনও অদৃষ্টের গর্ভে।

শ্রীস্বদেশী—

নাটক, উপন্যাস ও ইতিহাস।

প্রবন্ধের শীর্ষক দেখিয়া অনেকে হয়-ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। অনেকস্থলে উপন্যাস, ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও উপন্যাস ইতিহাসের একটী প্রধান সহায়। ইহা বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্থূলতঃ উপন্যাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে সকল উপন্যাস জাতীয় জীবনে নবযুগের অবতারণা করে; অর্থাৎ যাহার এমনই প্রভাব যে উহা পাঠ করিয়া জনসাধারণের চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তিত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Epoch-making বা যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ বলে। ফরাসী উপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর "লে মিজেরাবল্" ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। দরিদ্র-জীবনের ঘোরতর অবনতি, অবসাদ ও কলঙ্ককাহিনী জগতে আর এমন নাই। দরিদ্রদিগের সম্বন্ধে বহুকাল উদাসীন ফরাসীজাতি ইহারই প্রভাবে অবশেষে নানারূপ মনুষ্যোচিত বিধি প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সাহিত্য-জগতে এরূপ অনেক যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সমগ্র সমাজের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে না বলিয়া উহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত।

দ্বিতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, তাহাতে সমাজের চিত্র এমন সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যে তাহা হইতে ঐতিহাসিক তাঁহার মনোমত উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন। ইংরাজী সাহিত্যে ডিফো, ফরাসিস্ সাহিত্যে

স্কাবেলা, ইতালীয় সাহিত্যে বোকাচিও, বঙ্গীয় সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

সমাজের শিক্ষা, রীতিনীতি প্রভৃতি নাটক, উপন্যাসে যেমন স্থান পায় এমন আর কুত্রাপি নহে। সংস্কৃতে মৃচ্ছকটিক নাটক বা কাদম্বরী উপন্যাসের কথা ধরুন। উপন্যাস বলিতে আজকাল আমরা যাহা বুঝি, সংস্কৃত-সাহিত্যে কাদম্বরীই তাহার একমাত্র উদাহরণ। উহাতে ঋষির তপোবন, রাজপ্রাসাদের আচার পদ্ধতি, কুমারগণের শিক্ষাপ্রণালী, অবশেষে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী প্রভাব ঔপন্যাসিকের তূলিকায় দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে বলিবার রকমটা একটু অদ্ভুত। তা, প্রাচীন সাহিত্যিক মাত্রেই একটু অলঙ্কারপ্রিয়। পুরাকালে জীবন-সমর এমন কঠোর ছিল না। লোকের সময়ের অভাব হয় নাই। তাই "দীর্ঘ-দীর্ঘ-সমাস-সমন্বিত-বাক্যাবলী-সমলংকৃত"-কাব্যাস্বাদ করিতে লোকের বিরক্তি জন্মিত না। আর তখন সাহিত্য ভিন্ন সাধারণ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার মত বিষয়ও বড় ছিল না। আজকাল যেমন বিজ্ঞান শতবাহু প্রসারিত করিয়া লোকের চিন্তাশীলতার প্রায় সমস্ত দিক্‌টাই আকর্ষণ করিতেছে, তখন তেমন ছিল না। তখন "কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর নাটক উপন্যাস পৃথিবীতে অতি বিরল। বঙ্গসাহিত্যে এখনও সেরূপ হয় নাই। কখনও হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে উহাতে একটা জাতির তাৎকালিক ভাবগুলি চির-নিবদ্ধ হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনে এমন এক এক সময় আসিয়া পড়ে যখন কতকগুলিভাব যেন শূন্য আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিশুর মনের আকাঙ্ক্ষার মত কখনও বা মনেই বিলীন হয়, কখনও বা দুই একটী অস্ফুট কথায় বিন্দুমাত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভগবানের প্রেরিতের ন্যায় সাহিত্যজগতে নাটক-উপন্যাস-কর্ত্তার আবির্ভাব হয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ইংরেজী শিক্ষার প্রথমযুগে এতদ্দেশে সকলের হৃদয়েই জাগরূক হইয়াছিল। কেননা স্বাধীন শিক্ষার প্রভাবে সকলেই দেশের কল্যাণের দিকে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে না পারিয়া কালে উহা "ভারত-উদ্ধার" নামে বঙ্গবাসীর উপহাসভাজন হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের গান ও ভাবগুলি জাতীয় জীবনের এক নূতন অধ্যায়। ফল্গু নদীর মত জাতীয় জীবনের যে মানসিক স্রোত অলক্ষিতে

প্রবাহিত হইতেছিল উহা তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। বহুকাল পর আজ মনোমোহন বসুর নাটকের গান বাঙ্গালী-হৃদয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করিতেছে।

অন্যদিকে "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", তারক গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা", রমেশবাবুর "সংসার", অমরবাবুর "লহরী", রবি বাবুর "চোখের বালি" প্রভৃতি উপন্যাসের কথা মনে করুন্। শতবর্ষের পর বঙ্গ-সমাজের ইতিহাসবেত্তা উহা হইতে আর উৎকৃষ্ট উপাদান কি পাইবেন? স্যার ওয়াল্টার বেসান্ট বলিয়াছেন যে একমাত্র ডিকেন্সের উপন্যাস সকল অবলম্বনে তিনি তাৎকালিক সমাজের একটী পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন।

তাহার পর বঙ্কিমের "সীতারাম" ও "রাজসিংহ", রমেশবাবুর "বঙ্গবিজেতা" হারাণবাবুর "বঙ্গের শেষ বীর", রবিবাবুর "বধূ ঠাকুরাণীর হাট" এইরূপ আরও দুই একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসকে অতি মধুরোজ্জ্বলভাবে আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। ইতিহাসবেত্তারা লিটনের Last days of Pompeii অথবা হেন্‌রিক্ সিন্ কিউইচের Quovadis পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন! বস্তুতঃ ইতিহাসের শুষ্ক সন তারিখ ঔপন্যাসিকের যাদু বিদ্যায় জীবন্তভাব ধারণ করে। ঐতিহাসিক গ্রীণ বলিয়াছেন যে তিনি টেনিসনের Harold নাটক হইতে সেই সময়ের যেরূপ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ আর কিছুতেই নহে। আজকাল ইয়ুরোপে চিন্তার প্রায় সমস্ত বিষয়ই উপন্যাসের আকার ধারণ করিতেছে। দার্শনিক, জ্যোতির্বিষক, রাজনীতিক প্রভৃতি অনেক কথা উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, যেমন মধুকর, সকল কুসুম হইতেই মকরন্দ সংগ্রহ করে কিন্তু স্নিগ্ধ-পরিমল কমলই তাহার সমধিক প্রীতিকর, সেইরূপ ঐতিহাসিক, নানা স্থান হইতে উপদান সংগ্রহ করিলেও তাঁহার সামাজিক ইতিহাস গঠনের প্রধান উপাদান, নাটক ও উপন্যাস।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

চন্দ্র।

মাতৃক্রোড় হইতেই আমাদের চন্দ্রের সহিত পরিচয়। শৈশবে মায়ের কোল হইতে কচি কচি হাত তুলিয়া অর্দ্ধস্ফুট সমধুর ভাষায় চাঁদকে "আয় আয়" বলিয়া কত ডাকিয়াছি। সন্ধ্যা হইলেই ব্যাকুল নয়নযুগল বিশাল

সুনীল গগনে চন্দ্রের অন্বেষণ করিয়াছি। চাঁদকে খুঁজিয়া পাইলে সকল কান্না-কাটি, সকল আব্দার দূর হইয়া গিয়াছে। চাঁদের হাসি দেখিলে বাল্যের কোমল অধরে আর হাসি ধরিত না। তখন চাঁদের স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয় কোমল ও পবিত্র ছিল। আকাশে চাঁদ দেখিয়া যখন শিশুরা সুখে, আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে তখন তাহাদের সরল প্রাণের মধুর উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিগত বাল্যজীবনের সুখময়ী স্মৃতি আবার জাগরিত হয়। হায়! আবার যদি শৈশব ফিরিয়া আসিত!

আহ্লাদ প্রদান করে এই অর্থে 'চন্দ্র' নাম হইয়াছে। বাস্তবিক সুধাংশু দর্শনে কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মে। আকাশে চন্দ্রের মত এমন সুপরিচিত জ্যোতিষ্ক আর একটীও নয়। চাঁদের সম্বন্ধে কত গল্প, কত কাহিনী আজও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই রমণীয় জ্যোতিষ্কের বিষয়ে কত বিচিত্র বিবরণ হিন্দু-কাব্য-পুরাণেতিহাসে স্থান পাইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আর চন্দ্রের নামই বা কত। কাল্পনিক কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে সকল অভ্রান্ত অত্যাশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা আজ তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানা গোল ঝক্ ঝকে রূপার থালার ন্যায় দেখায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে দেখা যাইবে চন্দ্রও পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার এক প্রকাণ্ড জড় পিণ্ড।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন; ঐ সকল তত্ত্ব নিশ্চয় এবং অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া থাকেন "Astrologers know the surface of the moon better than Geographers know the interior of Africa." আফ্রিকার মধ্যভাগ ভৌগোলিকগণের নিকট যতটা পরিচিত নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট চন্দ্রপৃষ্ঠ ততোধিক পরিচিত। বাস্তবিক একথা যথার্থ। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা রজনীতে চন্দ্রোদয় হইলে বিনিদ্র নয়নে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এসিয়া, আফ্রিকার জঙ্গল বা মরুময় প্রদেশের বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহে, তজ্জন্য ঐ সকল মহাদেশের মানচিত্রে অনেক স্থান সাদা পড়িয়া আছে। ফটোগ্রাফের সাহায্যে চন্দ্রের যে সকল চিত্রময় প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে তাহা পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ দেশ, মহাদেশের মানচিত্র অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট

নহে। চন্দ্রের মানচিত্রে আমাদের পাড়ার মত ক্ষুদ্র স্থানগুলিও যথাযথ অঙ্কিত হইয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর একটী উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক (Satellite) যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকে গ্রহ কহে। পৃথিবী সূর্য্যের একটী গ্রহ। কিন্তু যাহারা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সুতরাং চন্দ্র একটী উপগ্রহ। সৌরজগতে বহু-সংখ্যক চন্দ্র বিরাজমান। আমাদের পৃথিবীর একটী মাত্র চন্দ্র; উহার সৌন্দর্য্য ও অপরূপ মাধুরী কাব্য-কলায় প্রতিনিয়ত কীর্ত্তিত হইতেছে। অনেক গ্রহেরই একাধিক চন্দ্র উহাদিগের চারিদিকে ঐ সকল অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। নেপচুনের চন্দ্র একটী, বৃহস্পতির চারিটী, ইউরেনাসের চারিটী এবং শনির আটটী চন্দ্র। যখন ঐ সকল গ্রহের চারিদিকে বহু সংখ্যক চন্দ্র ঘুরিতে থাকে তখন না জানি কি অপূর্ব্ব রমণীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। আমাদের একটী চন্দ্রের স্থানে যদি আটটী চন্দ্র থাকিত তাহা হইলে আকাশে কি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যই দেখিতে পাইতাম। ভবিষ্যতে সৌরজগতে আরও নূতন চন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পৃথিবীর চন্দ্রের কথাই বলিব।

খালি চক্ষে দেখিলে চন্দ্রকে সকল গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্র অপেক্ষা অনেকটা বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টতঃ আয়তন এবং উজ্জ্বলতার তুলনায় সূর্য্যের পরই চন্দ্রের স্থান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা নয়; চন্দ্র একটী অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক মাত্র। চন্দ্রকে এত বড় এবং ঈদৃশ উজ্জ্বল দেখাইবার কারণ চন্দ্র আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। চন্দ্র দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল মাত্র দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নক্ষত্ররাজির দূরত্বের তুলনায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯১৮ মাইল এবং চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল অর্থাৎ চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ¼ মাত্র। পঞ্চাশটী চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর আয়তনের সমান হইবে। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু চন্দ্রের উপাদান অতিশয় লঘু। পৃথিবীর তুলনায় উহার ওজন খুব কম। আশীটা চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর ওজনের সমান হইবে। আবার চন্দ্রের ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। এই জন্য চন্দ্রের কেন্দ্র ও

ভারকেন্দ্র ঠিক এক নহে। প্রত্যুত এই দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৩¼ মাইল। চন্দ্রের ভারকেন্দ্র অপেক্ষা প্রকৃত কেন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে; উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় এই জন্যই তেজোময় দেখায়। পৃথিবী যেমন দিবসে সূর্য্যকরোদ্ভাসিত হয়, চন্দ্রও তদ্রূপ সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া রজনীতে আমাদিগকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে। চন্দ্রে লোক থাকিলে তাহারাও রবি-কর-দীপ্ত পৃথিবীকে উহাদের চন্দ্র মনে করিত। আমাদের চাঁদ যেমন বড় ছোট হয় চাঁদের চাঁদও তেমনি বড় ছোট হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন শুক্লপক্ষে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র হয়; আবার ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া পনর দিন পর একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি আমাদের পৃথিবীকেও চন্দ্রলোক হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইবে। আমাদের চাঁদের উদয় আছে, অস্ত আছে কিন্তু চন্দ্রে লোক থাকিলে তাহারা তা'দের চাঁদকে সর্ব্বদা এক-স্থানে সমভাবে বিরাজিত দেখিতে পাইত। তা'দের চন্দ্রের উদয়াস্ত নাই; উহা কেবল একটু ইতস্ততঃ দোলে এবং ক্রমে ছোট হইয়া অদৃশ্য হয় আবার ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণচন্দ্র হয়। অমাবস্যার দিন পৃথিবী সূর্য্য অপেক্ষা ১৫ গুণ বড় উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইবে কিন্তু পূর্ণিমার দিবস পৃথিবী চন্দ্র হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে না।

পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা যেমন দিন ও রাত্রি হয় তদ্রূপ চন্দ্রের আহ্নিক গতিদ্বারা চন্দ্রের দিন-রাত্রি হইয়া থাকে। চন্দ্রের যে ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সেইভাগে দিন ও অন্যভাগে রাত্রি। একবার সূর্য্য উদয় হইলে সেখানে চৌদ্দ পনর দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আবার চৌদ্দ পনর দিন সূর্য্য অদৃশ্য থাকে। তখন চন্দ্রের রাত্রি। আমাদের চৌদ্দদিনে চন্দ্রের একদিন এবং চৌদ্দ রাত্রিতে এক রাত্রি। সেখানে কাজ করিবার সময় কত! আবার ঘুমাইবারই-বা সময় কত! চন্দ্রের দিন ভয়ানক গরম, রাত্রিতে তেমনি ভয়ানক শীত।

চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। আমরা চন্দ্রের একদিক মাত্র দেখিতে পাই। কারণ যে সময়ে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই চন্দ্র একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ প্রায় বৃত্তাভাস এবং পৃথিবী এই বৃত্তাভাসের অন্যতম কেন্দ্রে (focus) অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবী

হইতে উহার দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না। পৃথিবী যেমন একদিনে একবার নিজ মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে চন্দ্রও সেইরূপ একদিনে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে। কিন্তু চন্দ্রের একদিন আমাদের ২৯½ সাড়ে উনত্রিশ দিন।

চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিঃ হীন, সূর্য্যরশ্মিদ্বারা আলোকিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই তথ্য অবগত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন "চন্দ্রের কোন তেজ নাই; চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে সেই অংশ সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়। অপর অংশ সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত না হওয়ায় শ্যামল বর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রে একটী ঘট রাখিলে তাহার একাংশই প্রকাশিত হয় অপরভাগ তাহার নিজের ছায়ায়ই অপ্রকাশিত থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। যে দিন চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেইভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেইদিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্য একরাশিস্থ অর্থাৎ সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে এরূপ ঘটিয়া থাকে।"

চন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী যখন অত্যুষ্ণ ঘনীভূত বাষ্পাকারে ভীষণবেগে শূন্যপথে ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ কতকটা অংশ কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে (centrefugal force) পৃথিবীর দেহচ্যুত হইয়া ছুটিয়া পড়ে। পৃথিবীর যে অংশ ছুটিয়া পড়িয়াছিল তাহাই শেষে এমন চিত্তবিমোহন চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দেহ হইতে এতটা সামগ্রী চলিয়া যাওয়াতে একটা বিরাট গর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বিরাট উৎক্ষিপ্ত ভাগ আর মৃত্তিকাদ্বারা পরিপূরণ হয় নাই। সেই নিম্নভাগই আমাদের প্রশান্ত মহাসাগর। পণ্ডিতদিগের এই মত অভ্রান্ত কি না তাহা আমাদের বলিবার শক্তি নাই।

শুধু চক্ষে চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উহার গায় কাল কাল দাগ দেখা যায়। রমণীয় জ্যোৎস্না পুলকিত শশাঙ্কদেহে কৃষ্ণচিহ্ন দৃষ্ট করিয়া আদিম অধিবাসিগণ উহা কি জানিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ঔৎসুক্য অনুভব করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং বহুদূরস্থিত চন্দ্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার তাঁহাদের কোনই উপায় ছিল না। সেই সময়ে নানা বিচিত্র গল্পের উদ্ভাবন করিয়া তাঁহারা

লোক-কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ঐ সকল কৃষ্ণচিহ্নের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়ের কল্পিত বিচিত্র ব্যাখ্যাসমূহ পাঠ করিলে এখন হাস্য-সম্বরণ করা যায় না। একটী প্রবাদ, এই দক্ষরাজের শাপে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য তাহার ক্রোড়ে একটী মৃগ আছে। এই জন্যই চন্দ্রে কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়। আবার কোন কোন প্রাচীন মতে চন্দ্র, গুরুপত্নী তারার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পাপে চন্দ্রের দেহে কলঙ্ক হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমরা শৈশবে শুনিয়াছি, চন্দ্রের মধ্যে একটী বিশাল বটগাছ আছে, পতি-পুত্র-বিহীন এক বুড়ী তাহার তলায় বসিয়া সূতা কাটিতেছে। বটগাছ এবং বুড়ীর ছায়াকেই আমরা চন্দ্রের কলঙ্করূপে দেখিতে পাই। শৈশবে কল্পনার সাহায্যে প্রতি রজনীতে বুড়ীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞান সকল কবি-কল্পনা এবং অলৌকিক বিচিত্র কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পরেই চন্দ্র-কলঙ্কের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আমরা চর্ম্মচক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ যেরূপ মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখি বাস্তবিক উহা তদ্রূপ নহে। ভূমণ্ডলের ন্যায় চন্দ্রপৃষ্ঠও অসমান, কোনস্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। এইজন্য চন্দ্রের ফটো-চিত্র এমন দেখায়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে চন্দ্রে অসংখ্য বিশাল উচ্চ পর্ব্বত এবং গভীর গহ্বরাদি দেখা যায়। আমরা চন্দ্রের যে ভাগ দেখিতে পাই সেই ভাগের কথাই বলিতেছি। চন্দ্রের দুই পৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্র সর্ব্বদাই একদিক পৃথিবীর দিকে রাখিয়া স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। অপর ভাগ দেখিবার কোন উপায় নাই। চন্দ্রের যে যে অংশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উহা উচ্চ পর্ব্বত এবং মধুচক্রের ন্যায় রন্ধ্র বিশিষ্ট শৈলসমাচ্ছাদিত উচ্চ স্থান।

পাহাড়ে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইলেই দীপ্তি বিকীর্ণ হয়। পাহাড়গুলি যখন রবিকরে উদ্ভাসিত হয় তখন উহাদের পার্শ্বে কৃষ্ণছায়া পতিত হয়। চন্দ্রের পাহাড়গুলির যে ছায়া পড়ে তাহা অতিশয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে এরূপ নিবিড় কালছায়া পড়িতে পারে না। চন্দ্রে বায়ু নাই, পৃথিবীতে বায়ু আছে। পৃথিবীস্থ বায়ু অনেক পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত করিয়া দেয় কিন্তু চন্দ্রলোকে আলোক এরূপ বিক্ষিপ্ত হয় না; তাই তথায় ছায়া অতিশয় কৃষ্ণ হইয়া থাকে। চন্দ্রের যে দিকে সূর্য্যের আলোক প্রতিত হয়

তাহার বিপরীতদিকে ছায়া পড়ে। পাহাড়ের ছায়াগুলি অষ্টমী নবমী তিথি পর্য্যন্ত বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু তারপর ক্রমে অস্পষ্ট হইতে থাকে। পূর্ণিমার সময় সূর্য্যালোক চন্দ্রের উপর ঠিক সম্মুখ হইতে পড়ায় তখন ছায়াগুলি অদৃশ্য হয়, সেইজন্য পাহাড়গুলিও তত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যখন সূর্য্যকিরণ ঠিক একপাশ হইতে চন্দ্রের উপর পতিত হয় তখন পাহাড়ের ধারে কৃষ্ণছায়া দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতে সূর্য্যকরদীপ্ত পাহাড়গুলি খুব উজ্জ্বল দেখা যায়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ঐ সকল ছায়া বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ছায়ার সাহায্যে চন্দ্রস্থিত পর্ব্বতের উচ্চতা নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রে অনেক গভীর গহ্বর আছে। ঐ সকল গহ্বরে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, তাই চির অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

চন্দ্রের পাহাড়গুলি কেবল সামান্য নয়। এমন পাহাড়ও চন্দ্রে আছে যাহার উচ্চতা ৪। ৫ মাইল অর্থাৎ হিমালয়ের সমান। চন্দ্র আয়তনে পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সুতরাং চন্দ্রের আয়তনের তুলনায় হিমালয় সদৃশ উচ্চ আগ্নেয় পর্ব্বত যে অতীব ভীষণ সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। চন্দ্রের পর্ব্বতগুলিকে পণ্ডিতেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত;—বহু সংখ্যক পর্ব্বত সমতল ক্ষেত্র হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ২য় পর্ব্বত শ্রেণী;—গারো ও হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ পর্ব্বত শ্রেণী চন্দ্রের নিম্ন প্রান্তরের চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত আছে। ৩য়—চন্দ্রের গুহা সকল। ঐ সকল গুহা মধুচক্রের ন্যায় চন্দ্রের বার আনা অংশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রের গহ্বরগুলি অতিশয় বিস্ময়জনক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এই সকল গুহা বড় নগণ্য নয়। উহাদের কোন কোনটার ব্যাস ৬০। ৭০ মাইল। গুহার চতুঃপার্শ্ব উচ্চ এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও শিখরের নিকট কূপাকৃতি গহ্বর।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন চন্দ্রের পাহাড়গুলি হইতে এককালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইত। পর্ব্বতের মুখ বা Crater গুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অগ্ন্যুৎপাতকালে যখন ভিতর হইতে বেগে গলিত ধাতব নিঃস্রব বহির্গত হয় তখন শিখরের অগ্রভাগ উড়িয়া গিয়া মুখ (Crater) হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রে এরূপ অসংখ্য মুখ—গহ্বর রহিয়াছে।

চন্দ্রের মানচিত্রে গুহা সকলকে ঠিক মধুচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। টাইকো (Tycho) নামক সুপ্রসিদ্ধ গুহাটী অতিশয় অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক।

চন্দ্রের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে উপরিভাগের একটী স্থান হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক-রেখা বহির্গত হইতেছে, উহাই টাইকো গুহা। এই গুহা প্রায় ৫০। ৬০ মাইল বিস্তৃত এবং প্রাচীরের ন্যায় সমুন্নত পর্ব্বতমালা উহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গুহাটী ঠিক কটাহাকার; ইহার মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়। 'টাইকো' বিরাট 'রিফ্লেক্টারের' কাজ করিতেছে। 'টাইকোর' চতুঃপার্শ্বস্থ গিরিরাজি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া এক শৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই শৃঙ্গ হইতে টাইকোর অভ্যন্তর প্রায় বিশ সহস্র ফিট গভীর। সেই আকাশস্পর্শী ভীষণ গভীর গিরিশৃঙ্গের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নে টাইকোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। টাইকোর ন্যায় আরও অনেকগুলি গুহা হইতে আলোকরশ্মি বহির্গত হইয়া থাকে। আবার এমন গুহাও অসংখ্য আছে যাহার মধ্যে সূর্য্যকিরণ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন চন্দ্রের গুহা হইতে যে আলোকময়ী রেখা বহির্গত হইতেছে উহা প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি নহে; অগ্ন্যুদ্গমকালে যে ধাতবনিঃস্রব বাহির হইয়াছিল উহার স্রোত এখন কঠিন হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রে বায়ু এবং জল না থাকায় ঐ কঠিনীভূত ধাতুস্রোত এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐ সকল ধাতুস্রোতই আলোকরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আলোকরেখার কোন কোনটা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই সহস্র মাইল।

চন্দ্রে জল বায়ু না থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জল এবং বায়ুই ধ্বংসের মূল কারণ। পৃথিবীর নিত্য কত পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিশাল পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অভ্রভেদী গিরিচূড়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। সুশোভন কারুকার্য্য সম্পন্ন প্রাসাদমালা দিন দিন জীর্ণ হইয়া ইষ্টকরাশিতে পরিণত হইতেছে। জল ও বায়ু নীরবে তিল তিল করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে ক্ষয় করিতেছে। উহাদের নিকট মানুষের সকল চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছে। হায়! উহারা কত সৌধকিরীটিনী নগরী শ্মশানে পরিণত করিয়াছে; কত কীর্ত্তিরাশি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া লইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

চন্দ্রে জল বায়ু না থাকাতে গিরি-গহ্বরাদি অক্ষত রহিয়াছে বটে কিন্তু চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা অতীব ভীষণ হইয়াছে। চন্দ্রলোকের তুলনায় সাহারা মরুভূমিও তত ভয়ানক নহে। আমাদের ধরণী সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা! এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কত অসীম, অক্ষয়ভাণ্ডার! কত বৈচিত্র,

কত মাধুরী! চন্দ্রে বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, তাহার মধ্যে অসংখ্য বন্ধুর, অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী বিশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান। তথায় জন-প্রাণী নাই; তরু-গুল্ম-লতা জন্মে না। সেই দৃশ্যের কথা কল্পনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়! সেখানে বৃষ্টি নাই, কুজ্ঝটিকা নাই, মেঘ নাই। রাত্রিতে ভয়ানক শীত, দিনের বেলায় ভয়ানক রৌদ্র! যে চন্দ্রকে দেখিয়া আমরা বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণীয় সৃষ্টি বলিয়া মনে করি, যাহার মাধুরীর সহিত জগতের সকল সৌন্দর্য্যের তুলনা করিয়া দেখি, সেই চন্দ্রের এই অবস্থা!

তাই বলিতেছি, যাহাকে ভালবাস, যে তোমার চিত্ত বিমোহিত করিয়াছে তাহাকে দূর হইতে পূজা করিও, তাহার কাছে গিয়া দেখিও না। দূর হইতে তাহাকে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সুখী হইও। কাছে গেলে, দূরবীক্ষণের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার শত দোষ, শত ত্রুটী বাহির হইয়া তোমার হৃদয়কে বিচলিত করিবে, তোমার প্রেমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিবে। ভালবাসার জনকে খুটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করিও না।

চন্দ্রে লোক আছে কি না একথা জানিবার জন্য হয়তো কাহারো কৌতূহল জন্মিতে পারে। চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। জলবায়ু ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণী কি উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না। তারপর চন্দ্রে, দিনের বেলায় কাঠফাটা রৌদ্র, আর রাত্রে হাড়ভাঙ্গা শীত। সেই দিনরাত্রও আবার অসাধারণ দীর্ঘ। আমাদের চৌদ্দদিনে চন্দ্রের একদিন আর চৌদ্দ রাত্রিতে একরাত্রি। এরূপ অবস্থার মধ্যে আমাদের স্বভাবসম্পন্ন কোন প্রাণী এবং এই পৃথিবীর উপযুক্ত কোন উদ্ভিদ্ নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ চন্দ্রের নৈসর্গিক অবস্থার অনুরূপ কোন প্রাণী তথায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। চন্দ্রলোকে হাতীর মত বৃহৎ জীব থাকিলেও তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণে দেখা যাইবে না। চন্দ্রে লোক থাকিলে তাহাদিগের বড়ই অসুবিধা হইবে; উহারা সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনিতে পারিবে না, ঢাক, ঢোল বাজাইলেও সে শব্দ তাহাদের কাণে প্রবেশ করিবে না। পরস্পর কথা বলিতে পারিবে না। হাতের সঙ্কেত করিয়া সকল মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কারণ চন্দ্রে বায়ু নাই। বায়ু না থাকিলে কোন শব্দ শোনা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়ের মত কোন বিদ্যালয় থাকিবে না, কেবল মূক-বধির বিদ্যালয় বসিবে। আবার কোন সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ কিছুই তাহারা পাইবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

কবিতা।

কে তুমি গো সুলোচনে জীবন-উষায়
দাঁড়ায়েছ আলোকিয়া হৃদয়-কানন,
সাজাইছ মরু-হৃদি নব সুষমায়,
করিতেছ মৃতপ্রাণে সুধা বরিষণ।
শারদ-কৌমুদী স্নিগ্ধ-সুকোমল হাসি
রয়েছে জাগিয়া তব চারু-বিম্বাধরে,
দিবানিশি দেখিতেছি তব রূপরাশি
তথাপি হলো না তৃপ্ত ব্যাকুল অন্তরে।
চিনিয়াছি তুমি কবি-চিত্ত-বিনোদিনী
সরলা ত্রিদিববালা কবিতা-সুন্দরী;
তুষিতে এ দগ্ধ হিয়া মানস-তোষিণি
এসেছ এ শূন্য প্রাণে বুঝি দয়া করি।
আসিয়াছ যদি তবে থাক এ হিয়ায়
আজীবন ভক্তিভরে পূজিব তোমায়।

স্বর্গীয় কুসুম।

(প্রাণাধিক ছোট ভ্রাতার মৃত্যুতে)

দু'দিনের তরে শুধু এসেছিল সে যে;
ফুটন্ত কুসুম প্রায়, মায়ের স্নেহের ছায়
ফুটেছিল প্রাণাধিক কুসুমেরি সাজে।

না চিনিয়া মোরা তারে বাসিয়াছি ভালো;
জানি নাই অমরার ফুল সে যে সুধাধার,
এসেছে দু'দিন ধরা করিবারে আলো।

কেন-বা তাহার লাগি ঝরে আঁখিজল
জানি সে মোদের নয়, নন্দনের কিশলয়
স্বরগের মন্দারের রেণু নিরমল।

সংসারের তাপে ক্লিষ্ট হয়েছিল সে যে ;
রোগে তাপে পেয়ে ক্লেশ, ভবলীলা করি শেষ
তাড়াতাড়ি স্বর্গপুরে জুড়াইতে গেছে।

এসেছে তাহার চোখে শান্তিময়ী ঘুম
তাই সে ঘুমাতে গেছে, সুখের বারতা এ যে
ধরায় কি ফুটে থাকে স্বর্গীয় কুসুম ?

শ্রীসুরুচিবালা সেন—নোয়াখালী।

ঢাকাই মল্‌মল্‌।

স্বর্ণভূমি বঙ্গদেশ একদিন নানাবিধ শিল্পকার্য্যের জন্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। একদিন বঙ্গের শিল্পকারগণ স্বীয় শিল্পচাতুর্য্যে সমগ্র এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকাবাসিগণকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ আমরা লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য মাঞ্চেষ্টারের কৃপাভিখারী হইয়া আছি। কিন্তু একদিন আমাদেরই পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকাই মল্‌মল্‌ ইউরোপের ধনী এবং গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিতেন। বঙ্গদেশের বস্ত্র না হইলে ইউরোপবাসিগণের চলিত না। কেহ কেহ বলেন এসিরিয়া যখন পৃথিবীতে অত্যন্ত উন্নত ছিল, তখনও ঢাকাই মল্‌মল্‌ অদ্বিতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্যার জর্জ্জ উড মহোদয় বঙ্গদেশের প্রাচীন শিল্প-বিবরণীতেও ঢাকাই মল্‌মল্‌ অতুলনীয় বস্ত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে আরব এবং মিসরে যে সমস্ত জিনিস রপ্তানী হইত তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের মল্‌মল্‌ অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র বলিয়া মিসরের শিল্প-বিবরণীতে লিখিত আছে। আর্‌রিন মিসরী নামক জনৈক গ্রীক গ্রন্থকার স্ব-রচিত "ছিয়াহাত বাহ্‌রে রোম" নামক আরব্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ঢাকাই মল্‌মল্‌ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল বস্ত্র।" খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দুইজন আরবীয় মুসলমান পর্য্যটক ভারতবর্ষ ও চীনের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ একজন ইংরেজ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। তাহাতেও ঢাকাই মল্‌মলের মসৃণতা ও শুভ্রতা বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ঢাকাই মল্‌মল্‌ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও ইউরোপে অনেক রপ্তানী হইত। তখন রোমের ফারসারগণও ঢাকাই মল্‌মল্‌ অতি মনোরঞ্জনীয় বস্ত্র বিবেচনায় ব্যবহার করিতেন। রোমক সম্রাট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মহিলাবৃন্দ ঢাকাই মল্‌মল্‌কে অতি আদরের সামগ্রী জানিতেন। এমন কি সম্রাটমহলে ঢাকাই মল্‌মল্‌ ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্রের ব্যবহারই ছিল না। প্রসিদ্ধ ভারত আবিষ্কারক 'ভাস্কো ডা গামা' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তদীয় প্রভু পর্ত্তুগাল-সম্রাট ডম্‌ ম্যানুয়েলকে ভারতীয় বস্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশের অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মল্‌মল্‌ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতে সম্রাট ডম্‌ ম্যানুয়েল অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাটগণের সময়ে ঢাকাই মল্‌মলের অত্যন্ত সম্মান ছিল। "আইনে আকবরী" গ্রন্থে সম্রাট আকবরের পরিচ্ছদের বিবরণে লিখিত আছে "পূর্ব্ববঙ্গের মল্‌মল্‌দ্বারা সম্রাটের উষ্ণীষ প্রস্তুত হইত।" জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ও আওরঙ্গজেবের সময়েও বস্ত্রের মধ্যে ঢাকাই মল্‌মলেরই সম্মান অধিক ছিল। কারণ ঢাকাই মল্‌মল্‌ ভিন্ন সম্রাটগণের উষ্ণীষ হইত না। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ঢাকাই মল্‌মলের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি ঢাকাই মল্‌মল্‌ ভিন্ন প্রায়ই অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিতেন না। মোগল সম্রাট-গণের দরবারে ঢাকাই মলমলের যে কিরূপ সম্মান ছিল তাহা তৎকালের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। তখন প্রত্যেক মন্ত্রী, ফৌজদার, হাকিম, সুবাদার, সেনাপতি, আমির উমরাও এবং সৌখীন ব্যক্তি মাত্রই ঢাকাই মলমল পরিধান করিতেন। অন্দরমহলে-ত ঢাকাই মল্‌মল্‌ ভিন্ন চলিতই না।

মোগল সম্রাটগণের সময়ে পুনরায় ইউরোপে ঢাকাই মল্‌মলের সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তথাকার প্রত্যেক "সোসাইটিতে" ঢাকাই মল্‌মল্‌ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সযত্নে রক্ষিত হইতে লাগিল। বিলাসী আমির উমরাওগণ অতি উচ্চ মূল্যে ঢাকাই মল্‌মল্‌ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঢাকাই মল্‌মলে ইউরোপের তন্তুবায়গণের মনে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়া দিল। তাহারা অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও ঢাকাই মল্‌মলের মত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিল না। কাজেই তাহারা পরশ্রীকাতর হইয়া, অক্রতাবশে ঢাকাই মল্‌মলের অস্তিত্ব বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইল। অনেকে মনে করেন যে, কেবল ভারতবর্ষে যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তন্মধ্যে ঢাকাই মল্‌মলই সূক্ষ্ম ও

সূক্ষ্মবস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ছিল; অন্যান্য দেশে ঢাকাই মলমল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্ত্র দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের বিষম ভ্রম বলিতে হইবে, কারণ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও ঢাকাই মলমলের মত মসৃণ ও শুভ্র বস্ত্র কোথাও পাওয়া যাইত না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শিল্পবহুল যুগেও ঢাকাই মলমল বা মসলিন শুভ্রতা, মসৃণতা, ও কোমলতায় অদ্বিতীয় বস্ত্র।

স্যার চার্লস্ লক্‌ল্যাস, ইণ্ডিয়া হাউজে নমুনাস্বরূপ একখান ঢাকাই মলমল আমদানী করিয়াছিলেন; তাহার মসৃণতা ও শুভ্রতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঢাকার তন্তুবায়গণের নিকট উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। ১৮ হইতে ৩০বৎসর বয়সের হিন্দু মহিলাগণই এই সমস্ত মলমলের উৎকৃষ্ট সূতা কাটিতে পারিতেন। কারণ এই বয়সেই সাধারণতঃ মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি ভাল এবং হস্তপদাদি স্থির এবং কার্য্যক্ষম থাকে। সুতরাং অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। তাঁহারা দিনের ১ম ও ৪র্থ প্রহরে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে মলমলের সূতা কাটিতেন এবং বয়ন করিতেন। কারণ এই দুই সময়েই মৃদু মৃদু বায়ু বহিতে থাকে, সুতরাং সূতা ছিঁড়িয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে সূর্য্যের কিরণ সাম্যবস্থা ধারণ করে। অন্য সময়ে সূর্য্যের খরতর উত্তাপে সূতা শুষ্ক হইয়া ছিঁড়িয়া যায়।

ঢাকাই মলমলের অসাধারণ মসৃণতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে। সেই সকল গল্পের একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে। যিনি উক্ত মলমলের কয়েকখানি নমুনা দর্শন করিয়াছেন, তিনি জানেন মলমল কত সূক্ষ্ম হইত। ডাক্তার টেইলার সাহেবের নিকট ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একখান মলমল ছিল। তাহার সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "ঐ বস্ত্রখানা ৪০ হাত লম্বা এবং ২।০ সোয়া দুই হাত পরিসর ছিল কিন্তু ওজনে মাত্র ৫ তোলা।" ডাক্তার সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, "সম্রাট জাহাঙ্গীর যে মলমল পরিধান করিতেন, তাহা ১০ হাত লম্বা, ২।০ সোয়া দুই হাত পরিসর, ওজনে ৫ পাঁচ তোলা, মূল্য ৪০০৲ চারি শত সিক্কা হইত। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে ফ্রান্সাধিপতি অফ্‌ ওয়ায়লেজ যে তিনখান মলমল উপহার দিবার জন্য ঢাকায় তৈয়ার করাইয়াছিলেন তাহা ২০ বিশ গজ লম্বা, এক গজ পরিসর এবং ওজনে ৩।০ সাড়ে তিন আউন্স ছিল। ঢাকাই মলমলের এইরূপ অনেক গল্প বর্ত্তমান আছে। মিঃ টেউনির লিখিয়াছেন যে, "এই মলমল এতই মসৃণ ছিল যে, পরিধান করিলে সমস্ত শরীর স্পষ্ট দেখা যাইত। এই মলমল ভিন্নদেশে রপ্তানী করিতে

মোগল-সম্রাটগণের বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি নিষেধ ছিল। ঢাকার শাসনকর্ত্তা সমস্ত মলমল বেগমবর্গ ও দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতেন। কারণ গ্রীষ্মকালে এই মলমলই তাঁহাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতেই পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রসিদ্ধ শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ইহার অবনতির কারণ স্যার জর্জ্জ বার্ডউড্‌ লিখিয়াছেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বারতানিয়াতে পাঁচ লক্ষ থান ঢাকাই মোটা মলমলের নমুনা প্রস্তুত করা হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডবাসীদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে ঢাকার মলমলের ন্যায় মলমল প্রস্তুত করিতেই হইবে, কিন্তু অনেক যত্ন, চেষ্টা ও জেদ্‌ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত, বিলাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশের নিকৃষ্ট মলমল কিছুতেই ক্রয় করেন না দেখিয়া, ইউরোপের বণিক্‌গণ রাজার সাহায্য লইয়া ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করাইয়া লন। সুতরাং সেই সময় হইতে ঢাকাই মলমল বিলাতে রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে গিয়াছিল, কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে অধিক শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় মাত্র ৮॥০ সাড়ে আট লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে রপ্তানী হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩॥০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে রপ্তানী হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে মলমলের রপ্তানী একবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, একসময়ে ঢাকাই মলমল অনেক দূরদেশে রপ্তানী হইত এবং তৎকালীন বড় লোকেরা অতি আদরের সহিত উচ্চমূল্যে ঢাকাই মলমল ক্রয় করিতেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের তন্তুবায়গণ বিশেষ লাভবান হইতেন। কিন্তু ইংরেজ বণিক্‌গণ নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই মলমলের ব্যবসায় ধ্বংস করিয়া নিতান্ত সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকাই মস্‌লিনের ইতিহাসে ইংরেজের নীচতা ও স্বার্থপরতার কথা চিরদিন ঘোষিত হইবে।

ভাই বাঙ্গালি! একদিন ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মনী, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, আরব, মিশর, তুরস্ক, তাতার, প্রাচীন রোম প্রভৃতি দেশের সম্রাট, আমির, উমরাও এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সপরিবারে তোমাদের দেশের বস্ত্রদ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিতেন। তোমাদের দেশের বস্ত্রকেই অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মনে করিতেন। তোমাদেরই শিল্প-চাতুর্য্যে সমস্ত বিশ্ববাসী বিমোহিত ছিলেন। আর আজ তোমরা স্বীয় লজ্জা নিবারণ জন্য ইংলণ্ডের কৃপাভিখারী। ধিক্‌ তোমাদিগকে!

সৈয়দ মুজ্জল হোসেন।

আসিবে সুদিন।

পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
যখন বহিয়া যায়,
এদিকে ওদিকে ফিরে তার গতি
সামান্য উপল ঘায় ;
কিন্তু একে একে যবে তার সাথে
বহু স্রোত মিলে আসি
মত্ত ঐরাবত পড়িলে তাহায়
তৃণবৎ যায় ভাসি।
ক্ষুদ্র মোরা অতি হীন, অসহায়,
নাহিক সংশয় তবু
যদি ত্রিশকোটি হৃদয়ের বল
সম্মিলিত হয় কভু,
ফুৎকারে মোদের যাইবে উড়িয়া
দুরন্ত অরাতি চয় ;
সে দিন আবার আসিবে সুদিন
হবে নব অভ্যুদয়।
আপন শক্তিতে করিও বিশ্বাস
হয়ো না নিরাশ ভাই
আসিবে সুদিন আসিবে নিশ্চয়
অধিক বিলম্ব নাই।

ভঙ্গ তপস্যা।

মনে-পড়ে বুঝি তারে দেখেছি কোথায় সেই কৃষ্ণ আঁখি-তারা
মরতের সীমা তীরে কিম্বা অমরায় ; অপার্থিব স্নেহভরা
মৃদুভাতি জ্যোছনায় সুধাময় হিয়াখানি করুণা আলয়
তরঙ্গিত মেঘছায় ত্রিদিবের সুধারাশি
আধ উজলিত সেই কায় মোহময় একাধারে আছে মিশি

শান্তির পবিত্র উৎস বহে প্রাণময়,
বিস্ময় ভকতি ভরে
শত প্রণিপাত করে
স্থাপিনু হৃদয়োপরে কমল চরণ,
পাদ্য-অর্ঘ্য সযতনে
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দানে
সাধনার মন্ত্রে দীক্ষা লইনু তখন।
অনশনে তপস্যায়
সেইরূপ মনোময়
কল্পনার ইষ্টদেবী মানস প্রতিমা
সংসার বাসনা আশা
আসক্তি আকুল তৃষা
মুছে গেল জীবনের বিষাদ-কালিমা

অকস্মাৎ ভাঙ্গিল স্বপন
বুঝি জন্ম জন্মান্তরে
পাপের বিধান তরে
আরম্ভিল প্রায়শ্চিত্ত প্রথম সোপান
মন্ত্রমুগ্ধ তপস্যায়
কে বাদ সাধিল হায়
কেড়ে নিয়ে জীবনের শান্তি-প্রস্রবণ।
ভূতপূর্ব্ব মোহরাশি
হৃদয়ে মিশিল আসি
উন্মত্ত বাসনা প্রাণে জ্বলিল আবার
নিদ্রাভঙ্গে যেন হায়
লুপ্ত স্বপ্ন অভিনয়
জীবন নাটকে হ'ল নিদর্শন তার।

—প্রতিভাময়ী দেবী।

নব যুগ।

বহু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে এক নবযুগের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুদূর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন পল্লীগ্রাম হইতে সুচারু প্রাসাদমালা-সুশোভিত রাজধানী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই নবযুগের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। দীনের পর্ণকুটিরে এবং ধনীর সুসজ্জিত অট্টালিকায় সমভাবে এই নবজীবনের নবোচ্ছ্বাস প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে স্থানে দুইজন লোক একত্র হইতেছে সেই স্থানেই দেশের কথা, "স্বদেশীর" আলোচনা। যেন সমগ্র জাতির হৃদয়ে নবীন আশার তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া সকলকে এক নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। এ জীবন্তভাব মৃত-ভারতে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। এমন অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া নির্জীব ভারতবাসী কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। এই মৃতজাতীর হৃদয়ে কে সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণ করিল? কোন্ ভগীরথ স্বদেশ-প্রেমের পূত-জাহ্নবী-স্রোত ভারতশ্মশানে আনিল? এমন উৎসাহ, এমন উচ্চ আশা, এমন আত্ম-বিসর্জ্জনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন বঙ্গ-বিচ্ছেদই এই জাতীয় জীবনের উন্মেষক। লর্ড কার্জ্জনের শক্তিশেলের অরুন্তুদ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সুষুপ্ত বাঙ্গালীজাতি এবার জাগরিত হইয়াছে; বাঙ্গালীর অসহ্য কাতর চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভারতের বিভিন্নজাতি প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং বহুবর্ষ পরে তাঁহারাও তন্দ্রালসলোচন উন্মীলিত করিয়াছে।

বঙ্গ বিচ্ছেদ জাতীয় উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ কারণ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ সুদূর অতীতের গর্ভে সমাহিত রহিয়াছে। পর্ব্বত হইতে যখন ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসে তখন সামান্য উপলখণ্ড তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে সমর্থ হয়। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে মাত্র কিন্তু স্রোতের উৎপত্তি স্থান আরও উপরে, আরও দূরে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান বহু শতাব্দী পরে আবার এই পতিত জাতির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সভ্যতার আদিস্থান এই পবিত্রভূমি, চির-শ্মশান হইয়া পড়িয়া থাকিবে ইহা বিধাতার ইচ্ছা নয়।

এ দেশ কেবল মাটি নয়; জল-স্থল, বন-উপবন, পর্ব্বতকান্তারের সমষ্টি নয়। আমাদের জন্মভূমি কি কেবল "সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা", কানন-কুন্তলা, সাগর-মেখলা? এ দেশ কি কেবল "ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনী", "শুভ্র তুষার-কিরীটিনী," নদী-সীমন্তিনী? না, এ সেই দেশ, যেখানে প্রথম জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলিত হইয়াছিল; এ সেই দেশ, যে দেশের প্রতি জনপদের সহিত আমাদের অতীত সুখের স্মৃতি, গৌরবের স্মৃতি চির-বিজড়িত রহিয়াছে। এ দেশের প্রতি পরমাণু ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরগণের চরণ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। কত সাধক, কত ভক্ত, কত তাপস এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার স্তরে স্তরে মিশিয়া রহিয়াছেন। তাই এ ভারতভূমি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। যে দেশে রাম-কৃষ্ণ, বুদ্ধ-চৈতন্য প্রভৃতি ভগবানের অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশ চির পতিত থাকিতে পারে না। তাই আবার বহু শতাব্দীর পর ভারতে নবজীবনের উন্মেষ দেখিতেছি। নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন আশা, সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে।

ভগবৎ প্রেরণা আসিয়াছে, ইহা আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতেছি। বিধাতার ইঙ্গিতেই আজ সমগ্রজাতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ভারতবাসীর গতি চির-অপ্রতিহত থাকিবে। আবার ভারত

লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। বিধাতার ইচ্ছায় এই পতিতজাতি পুনরায় সমুন্নত সুবিমল যশশৈলে অধিরোহণ করিবে—ইহা ধ্রুব সত্য। নবযুগের আরম্ভ আমরা দেখিতেছি, কিন্তু এ যুগকে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদের উপর। সন্ধিস্থলে আমরা দণ্ডায়মান হইয়াছি; সুদিন আসিয়াছে, উহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে। দূরদর্শী বুদ্ধিমান কৃষক বন্যার জল আসিলে দূর হইতে কেবল উহার আগমন দেখিয়া নয়ন সার্থক করে না, সে তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সেই জল "আইল" বাঁধিয়া সংরক্ষণ করে এবং ভবিষ্যতে কার্য্যে ব্যবহার করে। আমাদিগকেও এই স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত স্রোতকে অনন্তকালের জন্য হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে হইবে। একবার এই স্রোত গেলে আর ফিরিবে না। জাতীয় জীবনে এমন সুযোগ দৈবাৎ আসে এবং উহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে সে সুযোগ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর ফিরিয়া আসে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আমাদের জাতীয়জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নাই, জাতীয়জীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা তিল তিল করিয়া বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে হইতেছে। এতদিন উহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতভাবে আমাদের জাতীয়জীবন গঠিত হইয়া আসিতেছে। এখন হঠাৎ উহার বিকাশ এবং পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সমাজ এ শক্তি একদিনে লাভ করে নাই, একটী ঘটনায় জাতীয়-জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হয় নাই, একজনের আঘাতে সমগ্রজাতির হৃদয় স্পন্দিত হয় নাই। বহু কারণ-সমবায়ে এই ফল জন্মিয়াছে। সেই বিচিত্র সূক্ষ্ম কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল বিচার করিয়া তথ্য নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে ইংরেজের ভারতাগমনের পর হইতেই এ দেশে জাতীয়তার ক্রম-বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজের একচ্ছত্র শাসনাধীন হইয়াই ভারতবাসী আত্মপর চিনিতে পারিয়াছে। আজ সকল দেশের লোক এক সুখ-দুঃখের ভাগী, ইংরেজশাসনের সুফল ও কুফল সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান; ব্যাধি ও প্রতীকার সকলেরই একরূপ। সুতরাং সকলজাতির লোকের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি জন্মিয়াছে। সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হইতেছে। বিপদ যতই রাশীকৃত হইতেছে, নৈরাশ্যের তিমির যতই ঘনীভূত হইতেছে, অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া লইতেছে। এরূপে দিন দিন জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হইতেছে। (ক্রমশঃ)

(১৪)

একদিন গেল, দু'দিন গেল, আজ ছ'দিন; প্রাণেশচন্দ্র আঙিনা হইতে এক পা বাড়াইতে পারিতেছেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে ছাড়িতেছেন না। শীতের দিন—আজ পুলী, কাল পাটিসাপ্টা; তৃতীয় দিন ক্ষীরের সরুচাকলী; পরদিন খেজুর রসের পায়স; মাছ অপর্য্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ এক এক দিন এক এক রূপ আহারের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। রাঁধেন সেই মাসী; প্রাণেশচন্দ্রকে ভাত দেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কন্যা উপমা।

ষ্টিমারে অবগুণ্ঠনে, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে, জ্বর ও বেদনার মধ্যে উপমাকে প্রাণেশচন্দ্রের ভাল করিয়া দেখা হয় নাই; ভাগ্যকুলে নয়; নৌকায় ও নয়। স্নাতা, কৃষ্ণ-পার্শ্বরেখ-শুভ্রবাস পরিহিতা, শুভ্রবসনোপরি বিন্যস্ত-মুক্তকেশী অবগুণ্ঠন বিরহিতা উপমা যখন প্রাণেশচন্দ্রের সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করে তখনও দেখা যায়, দেখা যায় না। পদযুগল কত সুন্দর, পদাঙ্গুলী কত সুন্দর, মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত কি সুন্দর; অঙ্গুলী চম্পক-কলিকা-তুল্য, বর্ণ কষিত কাঞ্চন-তুল্য। মুখেরদিকে চাহিয়াও চাওয়া যায় না; দেখা হইল, বুঝি-বা দেখা হইল না; চক্ষুর উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তি, ভোজনের তৃপ্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। আকর্ষণ পিঠার নয়—ঐ পদযুগলের, আকর্ষণ মৎস্যের ঝোলের নয়—ঐ মুখ-কমলের। তবু-ও তাহাকে প্রাণেশচন্দ্রের প্রাণভরিয়া দেখা হয় নাই।

সপ্তম দিনের অপরাহ্ণ; যমুনা আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁক দেওয়া বড় ঘরের বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—উপমার অনুসন্ধান করিতেছে।

বাঁক দেওয়া বড় ঘর—ঐ ঘরে শয্যা ঐ ঘরে কোষাগার, ঐ ঘরে তোষাখানা, মাথার উপরে স্তরে স্তরে পাটাতন—এক পাটাতন হইতে অপর পাটাতনে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়। পাটাতনের কোলে কোলে গাব দেওয়া ডালা, কুলো, চালুনী ঝুলানো রহিয়াছে। পাটাতনের উপর নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনের সামগ্রী অনেক।

যমুনা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া দেখিল—উপমা সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে। যমুনা কোন কথা বলিল না। উপমার চুল পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে; সিঁড়িতে সিঁড়িতে উঠিবায় সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আলোড়িত হইতেছে—পা কেমন

স্তরে স্তরে পড়িতেছে—কাপড় কেমন পায়ের কতদূর উঠিতেছে, আবার ঢাকিয়া যাইতেছে। কোন দেবকন্যা সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গে উঠিতেছে—যমুনা এরূপ ভাবিয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু উপমাকে ঐ ভঙ্গীতে উঠিতে দেখিয়া যমুনা অনিমেষ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিল। সকলের উপরের পাটাতনের এক কোণে ঘরের ছাপরের বাখারীর সঙ্গে এক ছড়া সুপক্ক অমৃতসাগর কলা ঝুলান ছিল। উপমা এক দুই করিয়া উহা হইতে কতকগুলি লইল, এক দুই করিয়া গণিল, আবার লইল, আবার গণিল, কেন গণিল, কাহার জন্য গণিল; কার কথা তার মনে আসিল; সে কথা থাক্। নামিয়া আসিয়া একখানি ডালায় যখন সাজাইল, সাজাইয়া লইয়া যখন বাহির হইল, তখন দেখিল—যমুনা বারেন্দার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

যমুনা। ঠাকুরঝি, কেমন উপরে উঠ্‌তাছিলা, আবার নাইমা আইলা, তবে এখন খুব ভাল হইচ। কলা—কত বড়, কেমন সুন্দর, এত কলা, কার লাইগা, কে খাইব? ঠাকুরঝি, এই যে একটা ঠাকুর তোমাগর সঙ্গে আইচে, তোমাগর বাড়ীতে আছে, এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে?

উপমা, তার হাতে কলা, রামপালের উৎকৃষ্ট অমৃতসাগর কলা—কলার কথা বেস্, কিন্তু তার সঙ্গে যমুনার মনে ঠাকুরটীর কথা কেন কেমন করিয়া আসিল তা স্থির করা কঠিন নয়। কিন্তু উপমা—"এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে"—এই কথায় উপমা কঠিন সমস্যায় পড়িয়া গেল। উপমা বলিল, "শরীরটা দুই দিন বড় খারাপ আছিল, এখন তো ভালই, ভাল দেখ্‌তাছিস না কি যমুনা?"

যমুনা। এত ভাল দেখ্‌তাছি যে কইবার পারি না; ঠাকুরঝি, এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে, তা তো কইলা না। বুড়া ঠাকুরকে দেখি, মাছের জন্য আমাগর পাড়ায়, দুদের জন্য গোয়াল পাড়ায়, রসের জন্য গাছীদের কাছে—ঠাকুর বড় বেস্ত। কও না, ঠাকুর ঝি, এই ঠাকুরটী কে লাগে?

উপমা। আমাদের কেউ লাগে না।

উপমার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, মুখ, কাণ লাল হইয়া উঠিল।

যমুনা। না ঠাকুর-ঝি, লাগে।

উপমা। যা—কিছু না। ঐ তো দেখ্‌ছিস্ আমাদের সঙ্গে আস্‌ছেন, বাবা যাইতে দেন নাই।

যমুনা। যাইতে যেন দেন না; ঠাকুরটি বেস্ সুন্দর; তোর সিঁথিতে সিঁদুর উঠুক।

উপমা যমুনার গা টিপিয়া দিয়া কলা লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

যমুনা যেদিন আঙ্গিনায় আসিয়াছে তার পরদিন হইতেই সে প্রতিদিন তিন বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়-বাড়ী আসে, বসে এবং উপমার সঙ্গে আলাপ করে। উপমা ব্রাহ্মণের কন্যা, যমুনা জেলের কন্যা। যমুনা ঘরে থাকিতে পারে না, কিন্তু বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই—এই দুইটী কন্যা ব্রাহ্মণ ও জেলে-জাতির—যমুনা উপমাকে ছুঁইতেছে, ঘেঁসিয়া বসিতেছে। উপমা তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা, যমুনা শ্যামাঙ্গিনী; কিন্তু এমন শ্যাম-যমুনা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। উপমা যমুনার চুল বাঁধিয়া দেয়, যমুনা উপমার চুলে নিত্য নূতন বেণী গড়ে, নূতন নূতন ছন্দের কবরী রচনা করে।

উপমা কলা রাখিয়া আসিয়া যমুনাকে টানিয়া লইয়া তাদের ঘরের পশ্চাতে আমের বাগানে লইয়া গেল। আমগাছে কোনটীতে মুকুল দেখা দিয়াছে, কোনটীর মুকুল ফুটিয়াছে, কেমন এক উন্মাদকর গন্ধ; সূর্য্য অস্ত যাইবার অধিক বাকী নাই—মধুকরগুলি মধুসঞ্চয়ে সত্বর হইয়া গুণ্ গুণ্ ধ্বনি ঘন করিয়া তুলিয়াছে। কোকিল তান-লয়-হীন অনিবদ্ধ দুই পাঁচটী কুহু—কুহু—কুক্—পিক্ শব্দে সান্ধ্য-আরতি করিয়া উড়িয়া গেল। এই আম্র-কাননের পশ্চাতে মাঠ—মাঠের অপরদিকে একটী ক্ষুদ্র খাল। খাল ও মাঠ কোয়াসায় এবং গোশালার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। রাখাল গোশালায় গরু রাখিয়া গাইয়া যাইতেছে—

কেন রে কুলীনের মাইয়া হইলাম রে—

যমুনার কাণে এই গান পৌঁছিল, যমুনা জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর ঝি, তোমার শান্তিপুরে যাওয়ার কথা তো শুন্লাম—এই ঠাকুরটী—"

উপমা। তোর সিঁথিতে তো সিঁদুর নাই—তোর সিঁথিতে সিঁদুর উঠবো কবে?

উপমা যমুনার সিঁথিতে শুধু আঙ্গুলে একটী শুধু টিপ বসাইয়া দিল।

যমুনা। তবে ঠাকুর-ঝি, তুমি আমারে বিয়া কর্‌না—

হো হো করিয়া হাসিয়া যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপমা। আমি তোরে বিয়া কর্‌লে যদি তুই সুখী হস্ মন্দ কি?

উপমা উঠিয়া যমুনার গলা জড়াইয়া ধরিল।

যমুনা। এই ঠাকুরটী—

উপমা যমুনার মুখ চাপিয়া রাখিল।

তখন তৃতীয়ার চন্দ্র আলোক ছড়াইয়াছে, আম্র-কাননে স্থানে স্থানে ছায়া, স্থানে স্থানে আলোক। যমুনা বলিল, "আইচ্ছা বল্লা না; রাত্তর হইল, এখন যাই।"

উপমা। আর একটু থাক্ না। আমি তোরে বাগান পার কইরা দিয়া আসুম।

যমুনা যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, যত পীড়াপীড়ি, উপমা যমুনাকে ততই জড়াইতে লাগিল।

আমবাগানের অপরদিকে ছোট মাঠ, ঐ মাঠ পার হইলেই যমুনার কুটুম্ব-বাড়ী। বাড়ী দেখা যায়। দু'জনে গলাগলি ধরিয়াই যমুনার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমবাগানের সীমায় একটা খাত; খাত গভীর—ঝির ঝির করিয়া মাঠের জল চলিয়াছে। ঐ খাতের উপর দুইটী মাত্র বাঁশে পাতা একটা সাঁকো। গলাগলি করিয়া দু'জনে এক সঙ্গে ঐ সাঁকো পার হওয়া অসম্ভব। যমুনা উপমার গলা ছাড়িয়া আগে সাঁকোতে উঠিল, তারপর উপমা। দু'জনের ভারে সাঁকো দুলিতে লাগিল। ঐ দোলনের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে, শরীর আঁকিয়া বাঁকিয়া দু'জনেই পার হইল। অতি অল্পদুর যাইয়াই উপমা ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে ঘন আম্রকানন—উপরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না—উপমা উহা দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া সাঁকোর উপর আসিয়া উঠিল। উপমা যাই সাঁকোর মধ্যস্থলে তখন আর একব্যক্তি ঐরূপ অনন্য মনে সাঁকোর উপর। উপমা পশ্চাতে না যাইলে ঐ ব্যক্তি যাইতে পারে না; ঐ ব্যক্তি না ফিরিলে উপমা পার হইতে পারে না। এই অবস্থায় ইতস্তত বুদ্ধিতে যা হইবার তাহাই হইতেছে—কিন্তু উপমারপক্ষে এক পলক—ঐ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত—পুরুষ। উপমার শরীর কাঁপিতেছে, ভাবিবার সময় নাই, ভয়ে নীচে পড়িয়া যায় আর কি? পড়িয়া যায়—ঐ অপরিচিত পুরুষ তাহাকে দু'হাতে ধরিয়া ফেলিল।

উপমার মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। উপমা বুদ্ধিমতী, কোন চীৎকার করিল না। ঐ ব্যক্তি তাহাকে সাঁকোর এই পারে ধীরে ধীরে লইয়া আসিয়া বলিল—"কোন ভয় নাই—ঘরে যান—ঘরে যাও। পড়িয়া যাইলে কি ভয়ানক হইত!"

উপমা স্বরে চিনিল, সত্রস্তে সলজ্জে চাহিয়া দেখিল—প্রাণেশচন্দ্র।

প্রাণেশ এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না, বাহির বাড়ী হইতে পথ এই সাঁকোর কাছে আসিয়া মিলিয়াছে; সে এই পথে মাঠে বেড়াইতে যাইতেছিল

সে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। উপমা স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে বুঝিতে পারিতেছে না, সভয়ে কত কি ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল—অনেকক্ষণ প্রদীপ জ্বলিয়াছে। মা, উপমাকে খুঁজিতেছিলেন।

মা। এত দেরি, সাঁজ হয়ে গেছে।

উপমা। যমুনাকে দিতে—

মা। তারপর—

উপমা কি উত্তর দিবে?

(১৫)

শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা এক সময়ে বেশ ভাল ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই উপার্জ্জন কমিয়া গিয়াছে—বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কমিয়াছে। তাঁহার চারি কন্যা ও একটী পুত্র জন্মে। বড় দুই কন্যার বিবাহে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, সে কন্যা দুইটীরও পরলোক হইয়াছে; পুত্রটী নিরুদ্দেশ—তাহার বয়স এতদিন পঁচিশ বৎসর হইত—আজ দশ বৎসর তল্লাস করিয়াও তাহার কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। পুত্রটী লিখা পড়ায় উত্তম এবং দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কেন চলিয়া গেল—সে সম্বন্ধে লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে। এখন দুইটী কন্যা বর্ত্তমান—একটী উপমা। বন্দ্যোপাধ্যায় "উপমা কালিদাসস্য" এই চরণ স্মরণ করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছেন। কনিষ্ঠা কন্যার নাম কমলা। কমলা জ্বর-প্লীহায় একরূপ শয্যাগত। বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাত্যায়নী এই কন্যাটী লইয়া বাড়ী ছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপমা ও উপমার মাসীকে লইয়া শান্তিপুর গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার গৃহে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, শ্যালিকা ও দুই কন্যা।

একখানি পাকা চণ্ডিমণ্ডপ আছে, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহার উপরে বটগাছ সকল উঠিয়াছে। জিনিসপত্র প্রায় সমস্তেই বার্দ্ধক্যের একটা বিষাদ-চিহ্ন পড়িয়াছে। বাহিরে দু'খানি চালাঘর, দু'খানিই হেলিয়া আছে; বাঁশের হেলা খুঁটিতে উহাদিগকে দয়া করিয়া পতন হইতে রক্ষা করিতেছে, খাট—চারিখান যা আছে—মনে হয় উহাদের তক্তা অপেক্ষা লোহার পেরেকের ভার বেশী; অষ্টপৃষ্ঠে কত পেরেক পাতামই যে বসিয়াছে তাহার অন্ত নাই। কলসী তা—সচ্ছিদ্র, ধুপদ্বারা ছিদ্র বন্ধ করা হইয়াছে; ঘটী, বহুগুণা, গামলা প্রায় সকলেরই একই দশা। ভাল আছে ঐ একখানি ঘর—বাঁক দেওয়া বড় ঘর। এই ঘরের একপার্শ্বে একখানি শয্যায় কমলা শুইয়া আছে। মা ও মাসী

নিকটে কাজ করিতেছেন। কমলার বয়স তের বৎসর কিন্তু রোগে তাহাকে পাঁচ বৎসরের শিশুটীর মত করিয়া রাখিয়াছে।'

এক কোণে তৈলের প্রদীপ, তৈল অল্প, দীপ নিবিয়া যাইতে চাহিতেছে। কমলা বলিল, "দিদি বাত্তিটায় তেল দেও।" উপমা উঠিল না; সে কথা সে শুনিতেই পায় নাই। কমলা আবার বলিল; উপমা বসিয়াই রহিল। কমলা বলিল, "—বাবা এখনও ফিরেন নাই—বাহিরের ঘর আঁধার; ঠাকুরটী-বা ঐ ঘরে আঁধারে আছেন, দিদি, বারেন্দায় বাত্তিটা কেন রাখিয়া আইস না।"

কাত্যায়নী। তাই-ত বাত্তি দেস্ নাই, বাত্তি দিয়া আয়।

কমলার মুখে "ঠাকুরটী" শব্দে উপমার যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এখন প্রদীপ লইয়া উপমার পক্ষে ঐ ঘরের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রাণেশচন্দ্র এতক্ষণ যদি ফিরিয়া থাকে, যদি ঐ ঘরে বসিয়া থাকে। উপমার পা চলিল না। সে মাসীমাকে বলিল, "মাসী-মা, বাত্তিটা তুমি রাখিয়া আইস।"

মাসী-মা প্রদীপ রাখিতে যাইয়া দেখিলেন—ঘরের বারেন্দায় একজন লোক বসিয়া আছে, সম্মুখে একটী ব্যাগ; লোকটীর হাতে একটী মোটা মস্ত লাঠি লম্বভাবে মাটিতে লগ্ন হইয়া লোকটীর মাথা ডিঙ্গাইয়া উঠিয়াছে। মাসী-মা অপরিচিত লোক দেখিয়া প্রদীপটী বারেন্দার এক কোণে রাখিয়া আসিয়া তাঁহার ভগ্নীকে জানাইলেন—কে একজন লোক বারেন্দায় বসিয়া আছে।

বাহিরের অঙ্গন ও ভিতরের অঙ্গনের মধ্যে একখানি বাঁশের বাঁকা বেড়া। উপমা, উপমার মা ও মাসী উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিলেন। আগন্তুক নীরব বসিয়া আছে; কোন পুরুষের সাড়া শব্দ নাই, কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করবে।

এই সময়ে প্রাণেশচন্দ্র আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন একটী লোক বারেন্দায় বসিয়া আছে। প্রদীপের সলিতা সূক্ষ্ম—এদিকে পবনেরও বিশেষ অনুগ্রহ, দীপ নিবিয়া গেল।

প্রাণেশচন্দ্র। কে—ও?

আগন্তুক। এই বাড়ী শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের?

প্রাণেশচন্দ্র স্বর শুনিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

আগন্তুক। এ বাড়ীতে প্রাণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে কেহ আছেন?

বারেন্দা অন্ধকার। উঠানে জ্যোৎস্না থাকিলেও প্রাণেশচন্দ্রের মাথা ঢাকা। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। তখন প্রাণেশচন্দ্র বারেন্দায় উঠিয়াছেন।

প্রাণেশচন্দ্র : আপনার নাম ? কোথেকে আসছেন ?

"কে-ও প্রাণেশচন্দ্র ভাল-ত ?"

"কে-ও দাদা ম'শায় ? কি আশ্চর্য্য ! কি ক'রে এখানে এলেন ; কি ক'রে জান্‌লেন আমি এখানে—কল্‌কাতার সব ভাল-তো ?

দাদা ম'শায় উঠিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে সস্নেহে কোল দিলেন। প্রাণেশচন্দ্র আনন্দে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,- "বাস্তবিকই আশ্চর্য্য—আপনার অসাধ্য কিছুই নাই, ছ'পরে কি খেয়েছেন ? একটা আলো পেলে হ'তো।

দাদা ম'শায়। মেয়েরা আলো দিয়া গিয়াছিলেন, নিবে গেছে।

প্রাণেশ। আলো ডক্‌ছি।

দাদা মহাশয় আলো ডাকিতে বারণ করিয়া দিয়া তাঁহার মস্ত পকেট হইতে এক পকেট-লণ্ঠন বাহির করিলেন—ম্যাচ্ জ্বালিয়া লণ্ঠনের মম-বাতিতে ধরাইলেন, লণ্ঠনের আলোর দিক্ প্রাণেশের মুখেরদিকে ধরিয়া বলিলেন—দেখ্‌লে ভায়া, এইরূপে পলাতক ধর্‌তে হয়, ধরেছি-তো।"

প্রাণেশ। বাস্তবিক কি'করে খোঁজ পেলেন।

দাদা ম'শায়। সংবাদপত্রে।

প্রাণেশ। সংবাদপত্র ?

দাদা ম'শায় পকেট হইতে সংবাদপত্র বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—"একটা জঙ্গলে চিনীমুখে পিপড়ে দেখে, ডিটেক্‌টিভ ডাকাত ধর্‌তে পারে আর এত বড় একটা সংবাদপত্র প'ড়ে তার লেখক ধ'রে—লেখকের খোঁজ ক'রে, একটা পলাতক লোককে ধরা যাবে না ? তুমি এখানে ক'দিন ? বাড়ী যাও নি ? এখানে সব ভাল তো ?

এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপমা, তাহার মা ও মাসি অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন ও কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দাদা মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া অতিশয় সুখী হইলেন, আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহার পকেট এবং ব্যাগের সামগ্রী সকল দেখিয়া। লণ্ঠন, খাটলুই, প্লেট, গ্লাস, ঘটী, ঔষধ বহু, পুতুল, খাবার সামগ্রী কত, বস্ত্র অনেক।

শশিধর। এত ঔষধ ? আপনি কি ডাক্তার ?

দাদাম'শায়। না, এই ওলাউঠার সময় বহুলোকের উপকার হ'তে পারে।

শশিধর। এত কাপড় ?

দাদাম'শায়। শীতেরদিন, দেশে গরীব অনেক।

শশিধর। এত পুতুল ?

দাদাম'শায়। ছেলে-মেয়েদেরে দিলে তারা কত সুখী হবে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর শুনিয়া বিস্ময়-ভক্তিতে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার আহারের আয়োজন করিবার প্রসঙ্গ করিতেই দাদাম'শায় বলিলেন "আমি ব্রাহ্ম—এইটুকু আপনাকে জানান আবশ্যক।"

বন্দ্যোপাধ্যায়। একটী 'ণ' কারের কম বেশী এই ত ? আপনি অতিথি—আপনি পূজনীয়।

"পূজনীয়" শব্দে দাদা মহাশয় করযোড়ে আপনার বিনয় জানাইলেন।

রাত্রিতে আহারের পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শান্তিপুর যাত্রা, ভাগ্যকুলে ডাকাতের আক্রমণ এবং তাঁহার রুগ্না কন্যার অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হইল। প্রাণেশচন্দ্র কত উপকার করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে দাদা মহাশয় প্রাণেশচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থানের প্রস্তাব করিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ একদিন থাকিবার জন্য বহু অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দাদা মহাশয় মিষ্টিকথা ও মধুর বিনয় অনুনয়ে তুষ্ট করিয়া প্রাণেশ-চন্দ্রকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার যাওয়া হইল না, তিনি প্রাণেশচন্দ্রকে বলিলেন—"বন্দ্যোপাধ্যায় বল্‌লেন তাঁহার ছোট মেয়েটী ব্যেরাম, একদিন থাকিয়া অবস্থাটা দেখিয়া গেলে হয় না ?"

প্রাণেশচন্দ্র মনে মনে ভাবিল—একদিন কেন পাঁচদিন থাকিলেও হয়; বলিল "তা দেখে যান না।"

দাদা মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। মেয়েটাকে দেখিয়া যাইবেন—শুনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুখী হইলেন। একদিন নয়, তিন দিন থাকিতে হইল। তিনি যে ঔষধ দিলেন তাহাতে উপকার দেখা গেল। দাদা মহাশয় ঔষধ ও ব্যবস্থা দিয়া অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে লিখিবার কথা বলিয়া চতুর্থদিনে বিদায় লইলেন।

প্রাণেশচন্দ্র চলিয়া গেল। উপহার মনের কথা—সে এক বৃহৎ পালা, অন্যত্র বলব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মক্কাশরীফের ইতিহাস—মৌলবী সেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা, মক্কা মহাপুরুষ মহম্মদের জন্মস্থান। ভক্ত মুসলমানগণ পবিত্র মক্কাতীর্থ দর্শন জন্য ব্যাকুল। মক্কাতীর্থের নাম শুনিলে তাঁহাদিগের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এইপুণ্য ভূমির প্রতি রেণু পরমাণুর সহিত কত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয়ই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এই ইতিহাসখানি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। মৌলবী সাহেবের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী। গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইয়াছে। ইতিহাস খানি পাঠক সমাজে আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

রুক্মিণী—কাব্য। শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত। শ্রীমদ্ভাগবতের রুক্মিণী চরিত্রই এই কাব্য বর্ণনার বিষয়। গ্রন্থকর্ত্রীর চারুতুলিকায় রুক্মিণীর চরিত্রটী বেশ উজ্জ্বলে-মধুরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রেম যেন কাব্যের প্রতি পৃষ্ঠায় উছলিয়া পড়িতেছে। সে প্রেম কত গভীর, কত উচ্চ, কত উদার; পড়িতে পড়িতে হৃদয় ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়। বাস্তবিক রুক্মিণী পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা সুমধুর, বর্ণনা চিত্তাকর্ষক, ভাব প্রকাশের কৌশল প্রশংসনীয়।

আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের এই রুক্মিণী কাব্যখানি পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজকাল যে সমস্ত কদর্য্য অশ্লীল, নাটক, নভেল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে প্রতিগৃহে বিষময় ফল ফলিতেছে। ধর্ম্মের বন্ধন, নীতির বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বৈদেশিক বিলাসিতা-স্রোতে পল্লীগ্রামের দীন-গৃহস্থের কুটির পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এখন সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রাণ সরল-হৃদয় আর্য্য নরনারীর আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আর কল্যাণ নাই।

আমরা রুক্মিণীর গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি সুসময়ে, গুণবতী সাধ্বী রুক্মিণীর পুণ্যকাহিনী সমধুর ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন। রুক্মিণীর মুদ্রাঙ্কণ অতি সুন্দর হইয়াছে।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক; ১৩১৩। দশম সংখ্যা।

নবযুগ।

(২)

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল খণ্ডরাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে বড় সৌহার্দ্দ ছিল না। বরং তাঁহারা পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের শক্তির অপচয় করিতেন। এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে দুর্ভেদ্য গিরি-প্রাচীর অথবা সুবিশাল নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এখনের ন্যায় সেই সময়েও ভাষা-বৈচিত্রের অভাব ছিল না। এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের লোকের দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় ভাবের বিনিময় হইতে পারিত না। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, দেশ-বিজয় ভিন্ন আপন শাসিত প্রদেশের বাহিরের কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা অনধিকার চর্চ্চা মনে করিতেন। মোগলসম্রাট-দিগের সময় ভারতবর্ষের প্রায় বার আনা অংশই দিল্লীর অধীন হইয়াছিল বটে কিন্তু ইংরেজ আমলের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে দিল্লীর অধীন ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা নাম মাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন। সম্রাটেরাও কেবল বার্ষিক কর পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। শাসনকর্ত্তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এক রাজার অধীন থাকিয়াও স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা এবং স্বতন্ত্র শাসননীতির অধীন হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সহানুভূতি, সমবেদনা ও সৌহার্দ্দ সমসুখ-দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ফল। মোগলশাসনকালে পূর্ব্বোক্ত কারণে সমসুখ-দুঃখের অভাবে ভারতবাসীর মধ্যে একতা এবং একদেশবাসী বলিয়া স্বজাতিপ্রেম ও সহানুভূতি বিকাশ পায় নাই।

বাঙ্গলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশ এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের ন্যায় বিরাজিত ছিল। সমস্তটা ভারতবর্ষ যে একটা দেশ এ কথা কাহারও মনে হইত না। প্রত্যেক প্রদেশের লোক আপন আপন সুখশান্তি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। আপন প্রদেশের বাহিরে কোন রাজ্যধ্বংস হইলে অথবা নূতনরাজ্যের অভ্যুদয় হইলে কেহ গ্রাহ্য করিত না। এই ঐক্যের অভাবেই ভারতের সমগ্র অধিবাসী একটী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই ; এই ঐক্যের অভাবেই বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এত সহজে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, চেঙ্গিস্ খাঁ, নাদির সা, প্রভৃতি লুণ্ঠনকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, জনপদ ভস্মীভূত করিয়াছে, নরশোণিত-স্রোতে সুবিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত করিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। যখন যে দেশে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই দেশেরই বিপদ, অন্য প্রদেশের লোকেরা দূর হইতে নিশ্চেষ্ট চিত্তে এই তাণ্ডব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ভিন্ন প্রদেশের প্রতিবেশীকে সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কেহ মনে করে নাই। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ যদি আপনাদিগকে এক মায়ের সন্তান বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা পরস্পর যদি ঐক্যসূত্রে সম্বদ্ধ হইতেন তাহা হইলে সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজী, বাবর প্রভৃতি-তো দূরের কথা পৃথিবীর কোন প্রবল শক্তিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ, ইংরেজরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল তাই এদেশের অধিবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্দ, সহানুভূতি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। ইংরেজ আমলে ভারতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভাবনীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে। ইংরেজ অধীনে আসিয়া সমগ্র ভারতবাসী একটী বিরাট জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এক কথায় আমরা এদেশে Nation এর বিকাশ দেখিতেছি। স্বদেশপ্রেম বা Patriotism এই মহামূল্য জিনিসটী আমরা ইংরেজের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস এবং শাসননীতি আমাদিগকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, আমাদিগের হৃদয়ে জাতীয়তার বীজ বপন করিয়াছে। সময়প্রভাবে এই জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহাক্রমে পরিণত হইবে, ইহাই মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা। পলাশীর শ্মশানে যে জাতীয় স্বাধীনতা-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে সেই সূর্য্য আবার মহাসহিম-মণ্ডিত

হইয়া ভারত-আকাশ প্রদীপ্ত কিরণ-ছটায় আলোকিত করিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীকে ঐক্যসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্যই ভগবান ইংরেজকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন; মীরজাফর, উমীচাঁদ, জগৎশেঠ কেবল যন্ত্র মাত্র স্বদেশদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্র কেবল উপলক্ষ।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইংরেজ আমাদিগের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত জনপদ। এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে নৈসর্গিক প্রাচীর গড়খাইদ্বারা সীমাবদ্ধ। তারপর ভারতে বহুভাষা বহুজাতি এবং বহুধর্ম্মের প্রচলিত। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সমস্ত ভারতবাসীর একতা, আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসার কল্পনা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ইংরেজের সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সকল বিঘ্ন দূর হইয়াছে, সকল সমস্যা তিরোহিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত জন-ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাসই জাতিগঠনের সর্ব্বপ্রধান সহায়; যেহেতু এক রাজার শাসনাধীন হইলে সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সম্পদ-বিপদ প্রায় একরূপ হয়। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সহানুভূতিই ক্রমে স্বজাতিপ্রেমে পরিণত হয়, ভারতবর্ষেও তাহাই হইতেছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত এক রাজার অধীন হইয়া সকল বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে স্পেন ও পর্টুগাল প্রকৃত প্রস্তাবে একদেশে হইলেও এবং অধিবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্ববিধ সাম্যসত্ত্বেও রাজনৈতিক ভেদবশতঃ স্পেন, পর্টুগাল দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাতিগঠন সম্বন্ধে এক গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বপ্রধান সহায়, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষে এক মহাজাতি সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে।

ইংরেজ বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীকে একটা সার্ব্বজনিক ভাষা প্রদান করিয়াছে। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমরা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের লোকের সহিত আলাপ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি। একভাষা না হইলে আমরা পরস্পরের সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারিতাম না; সকলে পরামর্শ করিয়া উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইতাম না। পরস্পর ভাব বিনিময়ের অক্ষমতাই পশুপক্ষীদিগের হীনতার

প্রধান কারণ। ভাষার সাহায্যেই সমস্ত জাতির হৃদয়ের বল, সাহস এবং উৎসাহ একত্রিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষা না হইলে আমরা জাতীয় মহাসমিতি-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে পারিতাম না। ইংরেজীভাষা জাতিগঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটী ভারতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠিত না হইবে সে পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষাই বিভিন্ন জাতির সহিত ভাব বিনিময়ে ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং ইংরেজের আমলে ভাষার পার্থক্যজনিত অসুবিধা ও দূরীকৃত হইয়াছে।

সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ নৈসর্গিক সীমাদ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কিন্তু ইংরেজ-প্রকৃতিদত্ত সীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া সুদূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে লৌহশৃঙ্খলে একত্র সবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ হিন্দুস্থান এখন লৌহবর্ম্মে সমাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্র গমনাগমনের এখন কত সুবিধা। বাহিরের ব্যবধানের সহিত অন্তরের ব্যবধানও তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা ও পঞ্জাব আর এখন পৃথক দেশ নয়, একটা বিরাট সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটা অংশ মাত্র। যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের সম্মিলন অতিশয় সহজসাধ্য হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন অথবা বিষয় বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের নানা জাতির লোক এখন প্রতিদিন একত্র সম্মিলিত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করিতেছি সমগ্র ভারতবাসী এক জননীর সন্তান। আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুখশান্তি এবং আমাদের উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি দেশহিতে নিযুক্ত করিয়াই আমরা সফল মনোরথ হইব, পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলেই এ অধঃপতন চিরস্থায়ী হইবে, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইবে, ইহা এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না—ইহা ইংরেজশাসনের সুফল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় যে কোনদিন ঐক্যসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারিবে তাহা নিতান্ত অসার কল্পনা বলিয়া অনুমিত হইত কিন্তু ভগবান কি অচিন্তনীয় কৌশলে এই দুরূহ কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় পুলকিত হয়।

অমর কবি হেমচন্দ্র ইংরেজ রাজত্বের এই অত্যাশ্চর্য্য শুভফল সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

"ধন্য রে নূটন ধন্য শিক্ষা তোর
যুগযুগান্তের অমানিশা ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন
তোরি গুণে আজ ভারত ভুবন
এ সত্য বন্ধনে বাঁধিল।"

(ক্রমশঃ)

বৃহস্পতি।

সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এইজন্য বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই গ্রহ চতুষ্টয়কে কনিষ্ঠ গ্রহ (minor planets) বলে। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী বহুসংখ্যক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রহ অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় শতাধিক হইবে। উহাদিগের বৃত্তান্ত অন্য প্রবন্ধে বলিব।

পূর্ব্বোক্ত চারিটী কনিষ্ঠ গ্রহের মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শুক্র প্রায় পৃথিবীর সমান; মঙ্গল পৃথিবীর প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। বুধ ও পৃথিবী হইতে অনেক ছোট।

বৃহস্পতি হইতে সৌর জগতের সুবৃহৎ গ্রহ সকলের আরম্ভ হইয়াছে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাশ, নেপচুন এই গ্রহ চতুষ্টয়কে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ গ্রহ (Giant planets) বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহ চতুষ্টয়ের মধ্যে বৃহস্পতিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শনি উহার অর্দ্ধেক, ইউরেনাশ শনি অপেক্ষাও ছোট; নেপচুন প্রায় ইউরেনাশের সমান।

যে সকল গ্রহ খালি চক্ষে বেশ উজ্জ্বল দেখা যায় সেই সকল গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই চিনিয়া ছিলেন এবং উহাদের এক একটী নামও প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই; কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও পর্য্যবেক্ষণ সাহায্যেই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাত্রির পর রাত্রি তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে ঊর্দ্ধনেত্রে গ্রহ ও নক্ষত্রাদির গতি ভ্রমণ পথ পরীক্ষা করিতেন। এইরূপে বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ

অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য সমূহ উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খালি চক্ষে কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রের স্বরূপ তথ্য আবিষ্কার করা কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ইউরেনাশ্ এবং নেপ্‌চুন এই দুইটী গ্রহ আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত এই দুইটী গ্রহ চিনিবার সাধ্য নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু চেষ্টা করিয়া বহু বৎসর অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই গ্রহ দুইটী আবিষ্কার করেন। এইজন্য প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইউরেনাশ ও নেপ্‌চুনের নাম নাই।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই গ্রহগুলি আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ-গণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই সকল নাম ও তাঁহাদেরই প্রদত্ত। বৃহস্পতি নামটী পণ্ডিতেরা বড়ই পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে বৃহস্পতি দেবগুরু তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহটীর নাম বৃহস্পতি রাখিয়াছেন। অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা বৃহস্পতি আয়তনে কত বৃহৎ তাহার আভাস দিতেছি। সৌর জগতের অপর সকল গ্রহগুলিকে একত্র করিয়া একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিলে উহা বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইবে। আমাদের অধিষ্ঠান-ভূতা, সুবিস্তৃত সাগর পরিবেষ্টিতা, অভ্রভেদি পর্ব্বত শোভিতা পৃথিবীর ন্যায় সাড়ে বার শত পৃথিবী একত্র করিলেও বৃহস্পতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে।

বৃহস্পতি আটচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া বৃত্তাভাস (Elliptic) পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর খুব নিকট আসে তখনও উহা, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূর প্রায় উহার চারি গুণ দূরে থাকে অর্থাৎ বৃহস্পতি সর্ব্বদাই পৃথিবী হইতে পঞ্চাশ কোটি মাইলের অধিক দূরে অব-স্থিতি করে। এইজন্যই এত বৃহৎ বৃহস্পতিকে দূরস্থিত নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়।

সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে সেই গ্রহের গতি তত মৃদু। বুধ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ উহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত। বুধের পর শুক্র তারপর পৃথিবী ও মঙ্গল; ইহাদের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। বৃহস্পতির গতি উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল হিসাবে চলে. বৃহস্পতি সেকেণ্ডে ৮ মাইল মাত্র যায়।

বৃহস্পতি পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহ সমূহের তুলনায় অধিকতর দূরবর্ত্তী বিধায় উহার বৃত্তাভাস ভ্রমণ পথ (Elliptic orbit) বৃহত্তর এবং উহার গতি ও

দূরত্বের অনুপাতে মৃদু। এই দুই কারণেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বৃহস্পতির প্রায় আমাদের ১২ বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ আমাদের ১২ বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর হয়।

বৃহস্পতির গতি খুব মৃদু বলিয়াছি কিন্তু উহা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে অতিশয় দ্রুত পরিভ্রমণ করে। প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহই লাঠিমের ন্যায় আপন আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক দেয় এবং এরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রহ সকল সূর্য্যের চারিদিকে এবং উপগ্রহ সকল গ্রহের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। বৃহস্পতি আপন মেরুদণ্ডের উপর অতি দ্রুত পাক দিয়া থাকে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এক পাক দেয় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর এক দিবস হয় বৃহস্পতি ১০ ঘণ্টায় এক পাক দেয় সেইজন্য বৃহস্পতির দিবস ১০ ঘণ্টা দীর্ঘ। এত তাড়াতাড়ি ঘুরিবার দরুণ বৃহস্পতির মধ্যভাগটা ফুলিয়া গিয়াছে এবং উহার দেহটা কিছু বাদামী ধরণের হইয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির মধ্যভাগ স্ফীত হইবার কারণ অতি সহজেই বোধগম্য হইবে। কাদার ন্যায় নরম পদার্থ নির্ম্মিত একটী বলের ভিতর দিয়া একটী শলাকা ঢুকাইয়া যদি দ্রুত ঘুরাণ যায় তাহা হইলে সেই বলটার দুই প্রান্ত ক্রমেই চাপা হইয়া যাইবে এবং মধ্যভাগ স্ফীত হইবে। কেন্দ্রাপসারিণী গতিই (centre fugal force) ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ উপগ্রহ এক সময়ে কোমল ছিল এবং এখনের ন্যায় সেই সময়েও উহারা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিত এইজন্য সকল গ্রহ উপগ্রহের মধ্যভাগই ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং দুই প্রান্ত চাপা হইয়া গিয়াছে। যে বস্তু যত দ্রুত ঘুরে সেই বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রাপসারিণী গতি তত প্রবল হয়। পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি অধিকতর দ্রুত পাক দেয় এইজন্য বৃহস্পতির মধ্যভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্ফীত হইয়াছে। বৃহস্পতির ফুলা অংশে অর্থাৎ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থানে উহার ব্যাসের পরিমাণ ৮৯৬০০ মাইল কিন্তু দুই প্রান্তের নিকট ব্যাস ৮৪০০০ মাইল। মধ্যভাগটা অতিশয় ফুলিয়া উঠাতে ঐ স্থানের ব্যাস ৫৬০০ মাইল অধিক হইয়াছে।

বৃহস্পতি পৃথিবীর ন্যায় কোন কঠিন পদার্থে গঠিত নয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন (Jupiter is not so far as we can see a solid body —Ball.) পৃথিবী যেমন পূর্ব্বে কোমল বাষ্পাকারে বিরাজিত ছিল বৃহস্পতিও এখন সেই অবস্থায় আছে। হয়তো ভবিষ্যতে বৃহস্পতি ও পৃথিবী এবং

অপরাপর গ্রহের ন্যায় কঠিন হইবে। বৃহস্পতির দেহ যে কঠিন নয় এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রায় তের শত পৃথিবী একত্র করিলে আয়তনে বৃহস্পতির সমান হইবে। যদি বৃহস্পতি পৃথিবীর ন্যায় কোন কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজনের তের শত গুণ অধিক হইত। কিন্তু বাস্তবিক বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজন হইতে মাত্র তিন শত গুণ অধিক। In mass he does not exceed our earth so greatly ; but still it would require the mass of three hundred earths to make up jupiter's—R. A. Proctor.

আমাদের আবাস ভূমি পৃথিবী যখন বাষ্প পিণ্ডাকারে শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিত তখন উহার আয়তন বর্ত্তমান আয়তনের শত গুণ বৃহৎ ছিল কিন্তু ওজন এখন যাহা আছে তখনও তাহাই ছিল। সুতরাং সেই বৃহদায়তনের তুলনায় তখন পৃথিবীর ওজন যে খুব কম বলিয়া বিবেচিত হইত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া ঘন ও কঠিন হইয়াছে এবং উহার আয়তনও ক্ষুদ্র হইয়াছে। ভূগর্ভে এখনও পূর্ব্ব উত্তাপ কতক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূগর্ভের যত নীচে যাওয়া যায় উত্তাপও তত বৃদ্ধি পায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ মাইল নীচে এত উত্তাপ যে তথায় কঠিন ধাতু সকল অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রব হইয়া যায়। চন্দ্রও পূর্ব্বে বাষ্প পিণ্ড ছিল কিন্তু চন্দ্র এখন একবারে শীতল হইয়া গিয়াছে, এত শীতল হইয়াছে যে চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি সমূহ হইতে আর অগ্ন্যুদ্গম হয় না। উহারা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। মঙ্গল, শুক্র, বুধ ও পৃথিবী শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে এবং উহাদের আয়তনও ক্ষুদ্র হইয়াছে কিন্তু বৃহস্পতি, শনি ইউরেনাশ, নেপচুন এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে; উহাদের উপাদান ঘনীভূত হইয়া কঠিন হয় নাই এজন্য আয়তনের তুলনায় উহাদের ওজন খুব কম। যখন ঐ সকল গ্রহ শীতল হইবে তখন উহাদের উপাদানও জমাট বাঁধিবে এবং আয়তন ক্ষুদ্র হইবে। তখন আর আয়তনের তুলনায় ওজন নিতান্ত সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বৃহস্পতি যে এখনও বাষ্পাকারে বিরাজিত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। আর একটী ঘটনায় পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমান সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃহস্পতির আকৃতি বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। দূরবীক্ষণ দ্বারা উহার উপরিভাগের যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা এক এক সময় এক এক রকম দেখায়।

উহার এক কারণ এই হইতে পারে যে বৃহস্পতি অতি দ্রুত ঘুরিয়া থাকে এইজন্য উহার পৃষ্ঠের অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু উহা একমাত্র কারণ হইতে পারে না। বৃহস্পতির পৃষ্ঠে যে সকল কৃষ্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয় ঐ সকল দাগ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুরিয়া আসিবার কথা কেন না বৃহস্পতির গতি পরিবর্ত্তিত হয় না, সর্ব্বদা একপ্রকার থাকে। কিন্তু ঐ সকল দাগগুলি কখন দ্রুত কখন বা বিলম্বে প্রকটিত হয়। পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষাদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ সকল দাগ আর কিছুই নহে, কেবল মেঘমালা। বিস্তৃত মেঘরাশি উৎপন্ন হইয়া বৃহস্পতির দেহকে সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বৃহস্পতির পৃষ্ঠে অনবরত প্রবল ঝড় বহিতেছে। সেই ভীষণ ঝটিকায় মেঘসমূহ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিতাড়িত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলী এক মুহূর্ত্তও জন্য স্থির থাকিতে পারে না। মেঘসমূহও সেইজন্য সর্ব্বদা আকার পরিবর্ত্তন করে অথবা বারি বর্ষণ করিয়া একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং আবার নূতন মেঘ উৎপন্ন হয়। *

বৃহস্পতির পৃষ্ঠে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে। সেই ঝড়ের মত প্রবল ঝড় যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে বহিত তাহা হইলে গাছপালা বাড়ী ঘর কিছুই থাকিত না— সকলই উড়িয়া যাইত। বৃহস্পতির ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় দুই শত মাইল আবার সেই ঝড় দুই মাস আড়াই মাসকাল স্থায়ী হয়।

বৃহস্পতি-পৃষ্ঠে এমন ঝড় হয় কেন এবং এত মেঘই বা জন্মে কেন ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। সূর্য্যের উত্তাপই পৃথিবীর ঝড়ের একমাত্র কারণ। এবং সূর্য্যোত্তাপেই পৃথিবীপৃষ্ঠে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উঠে ও উহাতে মেঘের উৎপত্তি হয়। সূর্য্যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহার কারণ সূর্য্যের অচিন্তনীয় উত্তাপ। সুতরাং বৃহস্পতিপৃষ্ঠেও অসাধারণ তাপাধিক্য বশতঃই প্রচণ্ড ঝড়, মেঘ ও প্রবল বৃষ্টি হইয়া থাকে।

দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, অনবরত বৃহস্পতিপৃষ্ঠ হইতে বাষ্প আকাশে উঠিতেছে এবং সেই বাষ্প আবার বৃষ্টিরূপে বৃহস্পতির পৃষ্ঠেই

---

* But these cloud zones change sometimes so rapidly in shape as to show that either some of the clouds discharged thier contents in rain and new clouds have been very rapidly formed or else that great cloud masses have been carried along with enormous rapidity by winds of hurricane force.

R. A. Proctor.

পতিত হইয়াছে। বৃহস্পতি এখনও এত উত্তপ্ত যে জল উহার দেহ স্পর্শ করিবা মাত্রই পুনরায় বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। এখন প্রশ্ন এই, বৃহস্পতি এত উত্তাপ কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়ই সূর্য্য হইতে এই তাপ আসে না। যদি সূর্য্য হইতে উত্তাপ আসিয়া বৃহস্পতির দেহ এরূপ উত্তপ্ত হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে সূর্য্যের উত্তাপ আরও কত ভীষণ হইত। যেহেতু পৃথিবী সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে উত্তাপ পায় বৃহস্পতি তাহার পঁচিশভাগের একভাগ মাত্র উত্তাপ পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর ন্যায় বৃহস্পতি এখনও শীতল হয় নাই উহার পূর্ব্ব তাপই এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই তাপেই বৃহস্পতি এখনও বাষ্পাকারে বিরাজিত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলি একবারে শীতল হইয়া গিয়াছে, বিরাটদেহ বৃহস্পতি একবারে শীতল হইতে আরও কত শতাব্দী লাগিবে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসাধ্য। কিন্তু একদিন যে বৃহস্পতিও পৃথিবীর ন্যায় কঠিন এবং শীতল হইয়া পড়িবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ অনুমান করেন, কালে আমাদের প্রভাকরও প্রভাহীন হইয়া নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। বহু লক্ষ বৎসর পর নাকি সূর্য্য একবারে শীতল হইয়া যাইবে। ইহা অনেক দূরের কথা সুতরাং তজ্জন্য আমাদের ভীতিবিহ্বল হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই।

পৃথিবীর একটী চন্দ্র উহাকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর পরবর্ত্তী গ্রহ মঙ্গল; উহারও দুইটী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মঙ্গলের পরবর্ত্তী গ্রহ বৃহস্পতি উহার চারিটী চন্দ্র। এই চন্দ্র চতুষ্টয় যখন একবারে আকাশের গায় প্রকাশিত হয় তখন অপূর্ব্ব মাধুরী বিকাশ পায়। কিন্তু বৃহস্পতিপৃষ্ঠ হইতে সে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যেহেতু বৃহস্পতির আকাশ সর্ব্বদাই নিবিড় বাষ্পরাশি ও ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। তারপর আমাদের চন্দ্র হইতে বৃহস্পতির চন্দ্র অনেক বৃহৎ হইলেও অধিকতর উজ্জ্বল নহে। আমাদের চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতির চন্দ্রও সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য এত দূরে যে ঐ সকল চন্দ্র অতি সামান্য আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্রের আলোক একত্র হইলেও আমাদের একমাত্র চন্দ্রের আলোকের সমান উজ্জ্বল হয় না। তারপর ঐসকল চন্দ্র এক সময়ে আকাশে উদিত হইলেও একবারে ষোল কলায় পূর্ণ হয় না। তারপর নিকটতম চন্দ্রটী যখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে তখন বৃহস্পতির ছায়াই ঢাকা পড়িয়া যায়।

বৃহস্পতির চন্দ্রগুলি স্থূল দৃষ্টিতে কোন কাজে আসে বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

বৃহস্পতিপৃষ্ঠে যেরূপ ভয়ানক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং তথায় এরূপ ভীষণ উত্তাপ যে বৃহস্পতিতে কোন প্রাণী বাস করিতে পারে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান সেই স্থানের উপযোগী কোন প্রাণী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা কে বলিতে পারে?

জ্যোতির্ব্বিদ প্রক্টার বলেন, বৃহস্পতিপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার চন্দ্র চতুষ্টয় প্রাণীবাসের অধিক অনুকূল। সমুজ্জ্বল সুবিশাল বৃহস্পতি সূর্য্যের ন্যায় মধ্যস্থলে বিরাজিত তাহার চারিদিকে চন্দ্রচতুষ্টয় গ্রহের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রগুলিতে প্রাণী-বাস করা বিচিত্র নহে। বাস্তবিক চন্দ্র পরিবৃত্ত বৃহস্পতি অনেকটা সূর্য্যস্থানীয় এবং বৃহস্পতির রাজ্যটা যেন আর একটা সৌরজগত। বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্র বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য ঐ সকল গ্রহের অনুপাতে যত বড়, বৃহস্পতিও উহার চন্দ্রগুলির অনুপাতে তত বড়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীহরিনাম-সূত্র।

ধর্ম্মানুশীলন-ব্যপদেশেই বাঙ্গালিগণ পূর্ব্বে সাহিত্য-চর্চ্চায় রত হইতেন। প্রাচীন সাহিত্যান্তর্গত যে কোন গ্রন্থ বা বিষয়-আলোচনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে সেকালের সমগ্র সাহিত্যটাই ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মকথার সহিত সম্পর্কিত নহে, প্রাচীন সাহিত্যে এমন গ্রন্থ অতি বিরল। অনেক গ্রন্থ শুধু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বিবৃত করিবার উদ্দেশ্যেই বিরচিত দেখা যায়। তা ছাড়া, গ্রন্থগুলির নামে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গের ছাপ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানিও আমাদের তথা কথিত গ্রন্থরাজির মধ্যে অন্যতম। ইহা একখানি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগ্রন্থ। গ্রন্থখানির নামেই তদ্বর্ণিত বিষয় সূচিত হইতেছে। বৈষ্ণব-সমাজে ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি কতদূর, তাহা না জানিলেও ইহা যে তৎসমাজের সমাদর-যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার রচয়িতা 'দ্বিজ রামেশ্বর' সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। পুঁথিখানি প্রাচীনকালের রচনা বটে, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত প্রতিলিপিখানি আধুনিক। কেবল আধুনিক হইলেও ক্ষতি ছিলনা, উহা বড়ই কদর্য্যভাবে লিখিত ও নানাস্থানে অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। পুঁথিখানি সম্ভবতঃ এই প্রথম বিশ্রুত হইল; সুতরাং ইহা যে দুর্লভ, তাহা বলাই বাহুল্য। একরূপ দুর্লভ গ্রন্থ অপূর্ণতা অথবা অবিশুদ্ধতার জন্য অনাদৃত হউক, ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে ভাবিয়া আমরা ইহা এখানে প্রচারিত করিয়া দিলাম। আশা আছে, সহৃদয় পাঠকগণের হস্তে একদিন ইহার পূর্ণতা বিহিত হইবে। পুঁথিখানি যেখানে যেমন ছিল, অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইল। যথা :—

শ্রীহরি।

শ্রীহরিনামের সূত্র ॥

ছয় দল অষ্টদল আর ষোল দল।
নামসূত্র জন্মস্থান গোলক মণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী ষোলদলে খেলা।
অষ্টদলে সংকীর্ত্তন গোপীগনে কৈলা॥
ষোলদলে নামসূত্র ভুবন প্রচার।
অষ্টদলে সংকীর্ত্তন জীবের নিস্তার॥
ছয় দলে ছ' অক্ষর তিন নাম সার।
তিন নামে তিন বীজ গোপ্ত (গুপ্ত) সমাচার॥
রমাবীজ পরাবীজ মদবীজ কাম।
তিন বীজে পূর্ণ হয় শ্রীহরির নাম॥ ৫
সেই নাম হৈতে জন্ম অনন্ত কোটী ধাম।
দিবানিশি জপে জীবে নাহিক বিশ্রাম॥
সপ্ত কোটী মহামন্ত্র চিত্তেতে বিশ্রাম।
আর কোন মন্ত্র নাই হরিনামের সমান॥ *
ষোল নাম—বত্রিশ অক্ষর বত্রিশ দেবতা।
কোন্ অক্ষরে কোন্ দেবতা না কৈল সর্ব্বথা॥

* 'হরিনামের সমান' স্থলে 'কৃষ্ণমন্ত্রের সমান'—পাঠান্তর।

(শুনিয়া আচার্য্য কহে ফল না কহিব।)
পরিণামে জিজ্ঞাসিলে সকলি কহিব ॥ (?)
আচার্য্যে বলেন শুন পূর্ণাবেশ করি।
আর কিছু কহ কথা শুনি কর্ণভরি ॥
হরি নামে ছয় অক্ষর ছয় দলে বৈসে।
কোন্ অক্ষরে কোন্ ফল কহিবা বিশেষে ॥
চৈতন্য বলেন শুন আচার্য্য মহামতি।
যথ অক্ষরের ফল শুন একমতি ॥

সুবর্ণের বর্ণ হয় রবির সমান।
হ উচ্চারিতে পাপ হয়েত খণ্ডন ॥
হ উচ্চারণ যদি মহাপাপী করে।
অবিলম্বে চলি যায় গোলক মণ্ডলে ॥
রে উচ্চারণ যদি মহাপাপী করে।
অবিলম্বে চলি যায় গোলক মণ্ডলে ॥
কৃ-কার অক্ষরটি কোটী সূর্য্য সম।
মন্ত্র বলিতে পলাএ পাপ সূর্য্যোদয়ে তম ॥
দুই নাম যুক্ত করি যেই জনে লয়।
হরে কৃষ্ণ রাম নাম তারকব্রহ্ম হয় ॥
শ্রীগুরু কৃপাতে পাপ সব যায় ক্ষয়।
সর্ব্বপাপ নাশে তার প্রেমের উদয় ॥
কৃ-কার অক্ষর বর্ণ কোটিরূপ ধরে।
সপ্তকোটী জন্মের পাপ তৎক্ষণে হরে ॥
র অক্ষর জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরে অতি।
রা উচ্চারিতে পাপ নাশ হয় ক্ষিতি ॥
ম বলিতে পাপনাশ অঙ্গ সুনির্ম্মল।
তুলারাশি দহে যেন প্রবল অনল ॥
হরে কৃষ্ণ রাম নাম তারকব্রহ্ম হয়।
শ্রীগুরু কহিলে কর্ণে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥

শ্রীচৈতন্য চরণে কহে দ্বিজ রামেশ্বর। *
ভক্তিভাবে যেবা শুনে † মুক্ত সেই নর॥

.:—————————.:

করজোড়ে কহে সেই চৈতন্য চরণে।
হরে২ অষ্টবার কৃষ্ণ চারি কেনে॥
রাম২ চারিবার বলি কি কারণ।
শুনিতে এই সব কথা লয় মোর মন॥
এই কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল।
প্রেমভাবে আচার্য্যকে আলিঙ্গন দিল॥
শুন২ আচার্য্য মোর প্রাণের দোসর।
তোমি বিনে বান্ধব কেবা আছে মোর॥
অতি বড় গুপ্তকথা কৈতে অনুচিত।
আচার্য্যে পরিচয় পাইলে দেখিবে বিহিত॥ (?)
পরমহংস মন্ত্র জীবে জপে মোরে।
সবের আহ্লাদী রাধা তারে বোলে হরে॥ ‡
ঋষাশৃঙ্গ সুবাচক নির্ব্বিগ্রহ মতিনাঞ্চ।
অতএব প্রভুর নাম বলি কৃষ্ণ২॥
নিষ্কাম নিত্যানন্দ শ্যাম কলেবর।
অতএব কৃষ্ণ বলি গোলক ঈশ্বর॥
অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডনাথ সেই গুণধাম।
বেদ পুরাণে সবে জানে কৃষ্ণনাম॥
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ সেই সে সকল।
গুণান্বিত মহাপ্রভু চৈতন্য কেবল॥
কমল আশ্রয় মাত্র সুখযুক্ত নিরন্তর।
তাহারে সে রাম বলি শুনহ সত্বর॥

---

* 'চরণে' স্থলে 'কৃপাএ' ও 'দ্বিজ' স্থলে 'দীন' পাঠান্তর।
† 'যেবা শুনে' স্থলে 'শুনে যেবা' পাঠান্তর।
‡ ২৯ পদের পর "ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি শিবে জপে যারে। সুবের আহ্লাদী

যোগীর অন্তরে রমেন রাম অনুক্ষণ।
তাহারে সে রাম বোলে শুনহ কারণ॥ ৩৫
কৃষ্ণে বিলাস করে রাধার সহিতে।
অতএব রাম নাম শুন সাবহিতে॥
অতি শুভ কমল নাম তারক ব্রহ্ম হয়।
শ্রীগুরু কৃপাতে পাপ সব হয় ক্ষয়॥
ষোল নামের সূত্র এই কহিলাম তোমারে।
অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরু মুখে যেবা না শুনে হরি নামের সূত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্টা মূত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন বস্তু না শুনে কর্ণ পথে।
চৌরাশী নরকের ভোগ ভোগে জন্ম পথে॥

এই সূত্র সাঙ্গ।

গ্রন্থোল্লিখিত 'আচার্য্য' কে, তাহা আমরা অবধারণ করিতে অক্ষম। স্থানে স্থানে মহাপুরুষ চৈতন্য দেবকে যখন বর্ণনীয় বিষয়ের বক্তৃ-রূপে দেখা যাইতেছে তখন এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন না হইতে পারে।

বলিতে ভুলিয়াছি, এই পুঁথি খানি চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চলস্থ সিংহরা গ্রামবাসী জনৈক যোগীর (যোগী জাতী) নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

আবদুল করিম।

প্রণয়ী-যুগল।

কুমার উঠিল অশ্বে　　রাজার মেয়েরে
লইল তুলিয়া কোলে;
নিদ্রার কোমল অঙ্কে　　সুষুপ্ত তখন ধরা
দিবসের শ্রান্তি ভুলে।
নিবিড় আঁধারে তা'রা　　অতি সংগোপনে আসি
পঁহুছিল নদীতীরে,
কুমার মাঝিরে ডাকি　　বলিল ব্যাকুলকণ্ঠে
"নিয়ে চল পর পারে।"

"উঠিছে পূরবে রবি আলোকে ছাইল দেশ
বিলম্ব সহে না আর,
বেয়ে চল দ্রুতগতি এখনি দিতেছি আমি
যাহা চাও পুরস্কার।"
"ঝটিকা বহিছে বেগে গর্জ্জিছে তরঙ্গমালা
সহস্র ফণীর মত,
কে তোমরা এ সময় যেতে চাও পর পার,—
কেন গো সাহস এত?"
"গভীর নিশীথে মোরা ছাড়িয়া রাজার পুরী
আসিয়াছি ছদ্মবেশে
প্রভাতে জাগিয়া রাজা নাশিতে মোদের প্রাণ
পশ্চাতে ধাইবে রোষে।
"ধরিতে পারিলে হেথা নিশ্চয় মরণ মোর
রক্ষিতে নারিবে কেহ,
ভাসাইয়া দিবে জলে তীক্ষ্ণ তরবারি ঘায়
শতখণ্ড করি দেহ।
দেখ গো সঙ্গিনী মোর কাঁপিছে ধরিয়া গলি
কোমল ব্রততী প্রায়,
সজল আনত আঁখি, চারু চন্দ্রানন তার,
মলিন হয়েছে হায়।
উঠেছে পূরবে রবি আলোকে ছাইল দেশ
বিলম্ব সহে না আর,
বেয়ে চল দ্রুতগতি এখনি দিতেছি আমি
যাহা চাও পুরস্কার"।
"হো'ক ঝড় বজ্রপাত নিয়ে যাব পরপার
নাহি চাহি পুরস্কার,
তব প্রেয়সীর ম্লান সজল নয়ন দুটী
ব্যাকুল করেছে প্রাণ।"
"ওগো চল বেয়ে তরি থেক না এখানে আর"
বলিল ডাকিয়া বালা,

"ক্রোধান্ধ পিতারে ডরি নাহি ভীত দেখি এই
উত্তাল তরঙ্গমালা।"
অনিচ্ছায় কর্ণধার কাতর মিনতি শুনি
চালিল বাহিয়া তরি;
গর্জ্জিল আকাশে মেঘ ভীম প্রভঞ্জন বেগে
বহিল হুঙ্কার ছাড়ি।
কূল ছাড়ি এল তারা অতিকষ্টে অবশেষে
গভীর নদীর বুকে,
ঘুরিতে লাগিল তরি পড়িয়া আবর্ত্ত মাঝে,
—নাহি যায় কোনদিকে।
বৃথা হলো এত শ্রম যায় বুঝি ডুবে তরি
সঙ্গিনী উঠিল কাঁদি,
চিন্তাকুল যুবা তায় গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে
যতনে লইল বাঁধি।
এমন সময় তথা সসৈন্যে আসিল রাজা
যেন মৃত্যু-অবতার,
শোণিত-লোলুপ-অসি ঝলসিছে রবিকরে
নয়নে ক্রোধাগ্নি তার।
একটী মৃণাল-বাহু আবেগে জড়ায়ে বালা
প্রণয়ীর গলদেশে
সভয়ে অপর ভুজ দিল প্রসারিয়া
পিতার সাহায্য আশে।
দেখি সে করুণদৃশ্য চিন্তিত হইল রাজা
দ্রবিল তাহার প্রাণ,
কাতরে বলিল ডাকি "ফিরে এসো কূলে ত্বরা
অভয় করিছি দান।
ক্ষমিলাম বৎসে তব প্রণয়ীর অপরাধ
এস দোঁহে কূলে ফিরে।"
কিন্তু সে তরঙ্গমাঝে নারিল ফিরাতে তরি
প্রাণপণ চেষ্টা করে।

দেখিতে দেখিতে হায় ঝটিকা বহিল বেগে
গভীর হুঙ্কার ছাড়ি,
না পারি থিতিতে আর ভীষণ তরঙ্গ মাঝে
ডুবিল অতলে তরি।
প্রেম আলিঙ্গন করি যুবক যুবতী হায়
সমাধি লভিল জলে
ব্যথিত হৃদয়ে রাজা ফিরিল আপন গেহে
জলি অনুতাপানলে। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুরবস্থা।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শরীর-রক্ষণোপযোগী আহার পরিচ্ছদ ও বাসস্থান সকলেরই চাই। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, সুখে থাকিতে চায়। যে কোনও মতে বাঁচিয়া আছে, আর কোন সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পায় না তাহাকেই যখন আমরা দরিদ্র বলি, তখন কোনও মতে বাঁচিয়া থাকাই যার দায়, শুধু বাঁচিয়া থাকিতে যাহা চাই, তাও যার নাই, তাকে কি বলিব জানি না। ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এরূপ হতভাগ্য যারা, তাদের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালীর আজকাল এই অবস্থা, এখন একেবারে না হউক, এইভাবে চলিলে অচিরেই যে এই অবস্থা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আহার্য্য, পরিধেয় গৃহোপকরণ প্রভৃতি মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা চাই তাহাই প্রকৃত ধন। যে দেশে ঐ সব যত বেশী আছে, যে দেশের লোকের পক্ষে ঐ সব যত সহজলভ্য, সেই দেশের লোক তত ধনী তত সুখী। টাকা কড়িতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ সুবিধায় মিলান যায়, তাই টাকাকড়ির আদর, তাই টাকাকড়িকে আমরা ধন বলি; নহিলে টাকাকড়ি খাইবার জিনিস নয়, পরিবার জিনিস নয়, টাকাকড়ি দিয়া ঘরবাড়ীও কেহ গড়িতে পারে না। দেশে টাকাকড়ি না থাকিলেও কোনমতে চলে, কিন্তু ভাতকাপড় না হইলে চলে না।

---

* একটী ইংরেজী কবিতার ছায়া লইয়া লিখিত।

এক দেশে মাসিক পাঁচ টাকা আয়ে লোকের স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যায়। অন্য দেশে মাসিক ১০০৲ টাকাতেও সেই ভাবে দিন চলে না। কোন্ দেশকে আমরা ধনী বলিব? সকলেই এক উত্তর দিবেন। টাকা হিসাবে যে যাই আয় করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। সেই টাকাতে কি পরিমাণে আবশ্যকীয় জিনিস পত্রাদি জোটে, তাই দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বিচার করিতে হইবে। যাহা আমাদের প্রয়োজন তাই যখন প্রকৃত ধন; টাকায় কি পরিমাণে সেই ধন পাওয়া যায় তাই বুঝিয়া যখন টাকার আদর; ধনের অভাবই যখন দারিদ্র্য, টাকার অভাব নয়; তখন দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে ধনবৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের ধন না বাড়িলে, শুধু টাকাবৃদ্ধি অথবা টাকা হিসাবে ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধিতে দারিদ্র্য দূর কখনও হইতে পারে না। ধনবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া শুধু টাকা অর্জ্জনে যারা যত্নশীল, তাদের দারিদ্র্যও কখনও ঘোচে না। কৃষি ও শিল্পে ধন উৎপাদিত হয়। বাণিজ্যে উৎপাদিত ধন দেশময় সকলের সহজপ্রাপ্য হয়। সুতরাং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত, দেশের ধন তাঁহাদেরই হাতে। চাকুরী প্রভৃতি অন্য উপায়ে যাহারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে জীবিকার জন্য অনেক পরিমাণে ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জন্য কোন প্রতিকূল কারণ বিদ্যমান না থাকিলে স্বভাবতঃই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেতনভোগী চাকুরের অপেক্ষা কৃষক, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীর অবস্থা ভাল।

বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত দ্রব্যাদিই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতির গুণে কৃষকই সেই ধনের প্রধান ভোক্তা। বাঙ্গালার সেই কৃষকসম্প্রদায় প্রায়ঃ নিম্নশ্রেণীর লোক। বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্প যা আছে তাও সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর হস্তে। ব্যবসা বাণিজ্যও একরকম তাহারাই করে। মধ্যবিৎ ভদ্রসম্প্রদায় সাধারণতঃ চাকরী বা আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ভদ্র ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালার ভদ্রসম্প্রদায় অপেক্ষা চাষার অবস্থা যে মোটের উপর ভাল ইহা সকলেই আজকাল স্বীকার করেন। আবার ভদ্রলোকের যত বাজেখরচ আছে, চাষার তত নাই। মোটা ভাতকাপড়ে তাদের দিন বেশ যায়, কিন্তু বিলাসিতায় ভদ্রলোকের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়াছে।

চাকুরী করা কোন হাঙ্গামা নাই, নিয়মবাঁধা কাজগুলি করিয়া যাইতে পারিলেই

নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটিয়া যাইতে পারে, তাই আরামপ্রিয় ক্লেশকুণ্ঠ শিক্ষিত বাঙ্গালী চাকুরীই খুঁজেন। কিন্তু চাকুরী হইলে সুবিধা হয় বলিয়া কেহ কাহার জন্য চাকুরী লইয়া বসিয়া আছে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকর কেহ রাখে না। তাই চাকুরী চাহিলেই মেলে না। চাকুরী পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকেই উকিল মোক্তার ডাক্তার কবিরাজ হইতেছেন। আমাদের আর কোন গুণ থাক আর না থাক, আর কিছুতে কষ্ট করিতে পারি না পারি, শরীরপাত করিয়া পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ হইতে পারি, সুতরাং ইচ্ছা করিলে উকিল মোক্তার ও ডাক্তার কবিরাজ সাজিয়া বসিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই যে দেশের লোক সব অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা করিয়া বা নানাবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের ঘরে আনিয়া টাকা ঢালিয়া দিবে, এমন হইতে পারে না। যত্ন ও পরিশ্রম অবস্থা-উন্নতির প্রধান উপায় এ কথা সত্য, কিন্তু যত্ন ও পরিশ্রম উপযুক্ত ক্ষেত্রেই কেবল সফল হয় হালগরু লইয়া মরুভূমি কর্ষণে শস্য জন্মে না, মরু-সাগরে জাল ফেলিলে মাছ মেলে না, পাহাড় খুঁড়িলে জল আসে না। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, ধনবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে লোকের অবস্থা ভাল হইতে পারে। যে সব কাজে ধনোৎপাদন বা ধনবৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই তাহাতে যত পরিশ্রমই লোকে করুক, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি গবর্ণমেণ্ট বড়২ চাকুরীগুলি বাঙ্গালীকে দেন না। তাই আমরা এত দুঃখী, কিন্তু বড় চাকুরী কয়টি আছে? খুব বেশী হইলেও দুই তিন শতের উপর হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি এই চাকুরীগুলি সব বাঙ্গালীকে দেন, তবে দুই তিন শত বাঙ্গালী বড়লোক হইল। কিন্তু তাহাতে এই যে হাজার হাজার সামান্য বেতনভোগী চাকুরে, হাজার হাজার চাকুরী প্রার্থী, হাজার হাজার নিঃস্ব আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী, ইহাদের কি হইবে? বড় চাকুরেরা কি তাঁহাদের মাসিক বেতন ইহাদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন? দিলেই বা কি? তাহাতেও এ অভাব এ দুঃখ ঘুচিবে না। চাকুরে বাঙ্গালীর অধিকাংশই বিশ পঁচিশ টাকা বেতনে সামান্য চাকুরে। আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীদেরও অধিকাংশের আয় উহা অপেক্ষা বেশী হইবে না। প্রতি বৎসর চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে সেই সামান্য চাকরীও আর মেলে না। ওকালতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধি আরও বেশী। যাঁরা আছেন তাঁদেরই অন্ন জোটে না, যাঁরা যাইতেছেন তাঁদের যে কি হইবে ভাবিয়া স্থির করা যায় না। সকলেই এ কথা বোঝেন, স্বীকার করেন, অথচ সকলেই

সেই এক সোজা নিষ্ফল পথে ধাবিত হইতেছেন। ইহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দিন দিন যে কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া কুল পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানেই এই ভীষণ দুরবস্থা, ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান সন্ততিবর্গের যে কি উপায় হইবে তাহা মনে করিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক কত আশার আকাশকুসুম গাঁথিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, আট দশ বৎসর কত অর্থব্যয়ে বহু পরিশ্রমে শরীরপাত করিয়া, কেহ উপাধি লইয়া কেহ বা সে আশায় জলাঞ্জলী দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংসারক্ষেত্রে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের এত পরিশ্রম, এই স্বাস্থ্যনাশ, ইহার মূল কি হইবে? কোনও মতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ও নাই। হায়, আমাদের এই সব শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে এই ঘোর নিরাশার অন্ধকার কি ভয়ঙ্কর, কি মর্ম্মস্পর্শী যাতনাময়! ইহাদের নিম্নে আবার আরও কত সহস্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভই করিতে পারিতেছে না। ইহারা সকলেই চাকুরী প্রার্থী, চাকুরী করিয়াই সকলকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহাদের ভবিষ্যত যে কি তাহা বর্ণনার অতীত, ধারণার বহির্ভূত! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য শুধু সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নয়, কোনও মতে জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রের অভাব! মানব সমাজে নিকৃষ্টতম দারিদ্র্য,—মানব জীবনের অতুলনীয় দুঃখ।

ইহার উপর এই সব হতভাগ্য যুবকগণ আবার বেশীর ভাগই বিবাহিত—দুই চারিটি সন্তানসন্ততি-গ্রস্ত। যার নিজের উদরান্নের সংস্থান নাই, তার স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভারবহন করিতে হইলে যে কি ভীষণ কষ্টে পরিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুস্থ সবল দেহ পুরুষ যে প্রকারেই হউক, কায়ক্লেশে ছোট কি বড় কাজে, সুখে কি দুঃখে,—নিজের অন্ন-বস্ত্র নিজে জুটাইতে পারে। স্বদেশে না হউক, দূর দেশান্তরে যেখানে হয় যাইবে, না হয় মরিবে—মরিয়া দুঃখ যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু বিবাহিত ও পরিবারগ্রস্ত হইলে তার আর উপায় নাই। কাছে না থাকিলে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ চলে না। আবার কাছে থাকিয়া পরিবারকে ভাতকাপড় দিয়া রাখিবে এমন কোন উপায়ও দেখে না। আপনার দুঃখ কষ্ট মান অপমান লোকে সহিতে পারে, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রাদির সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব, সেজন্য পরের অধীনতা, দিবারাত্রি নানা গঞ্জনা নানা অপমান মানব-হৃদয়ে অসহ্য। হায় কত যুবক যে এই অসহ্য দুঃখ বুকে লইয়া বিষণ্ণ জীবন-

যাপন করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই! ভুক্তভোগী ব্যতীত এ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে আর কেহ পারেন না। এই বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল হতভাগ্য যুবকদের একজীবনেই শেষ হয় না। ভীষণ দারিদ্র্যে প্রতিপালিত সন্তানসন্ততিগণও আজীবন উপযুক্ত শিক্ষা ও সুখস্বচ্ছন্দতার অভাবে চিরদিন কষ্ট পাইয়া যায়। এই বিষবৃক্ষ একবার রোপিত হইলে বংশানুক্রমে সকলে তার ফলভোগ করিতে থাকে! সন্তানসন্ততির বিবাহ দেওয়ার সময় কেহই একথা মনে করেন না। নবীনা পুত্রবধূর সহাস্য সলজ্জ মুখশোভা, পৌত্রপৌত্রীর স্নিগ্ধ সুকোমল স্পর্শ, সুমিষ্ট আধ আধ ভাষ ইত্যাদি কাম্য সংসারসুখ ভোগের আশায়, অথবা হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্তের সর্ব্বস্বহরণ করিয়া নিজের অভাবমোচন করিবার জন্য, অনেক পিতা অনুপযুক্ত পুত্রের দুর্ব্বল স্কন্ধে চিরদিনের মত দুর্ব্বিসহ ভার চাপাইয়া যান। তাঁরা যতদিন জীবিত থাকেন, পুত্র স্বীয় স্ত্রীপুত্রের জন্য কোন কষ্ট পায় না সত্য কিন্তু তাঁহারা পরলোকগত হইলেই হতভাগ্য পুত্র পৃথিবী অন্ধকার দেখে। বিবাহ দেওয়ার সময় অনেকে পুত্রকে 'স্থিতি' করিয়া যাইবার কথা বলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা পুত্রকে চিরদুঃখে 'স্থিতি' করিয়াই যান। যাহাদের এরূপ অবস্থা নয় যে অভিভাবকের অভাব হইলেও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন, অথবা অন্ততঃ সহজে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত হইতে পারেন, তাহাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত অবস্থাপন্ন না হইয়া বিবাহ করার মত ভুল আর নাই। এ ভুল জীবনে আর শোধরাইবার উপায় নাই। জীবন ভরিয়া এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সন্তান সন্ততিগণ বংশানুক্রমে এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অবশ্য অনেক সময় দরিদ্র পিতা ধনীকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার ভবিষ্যতে উন্নতির উপায় করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় বিবাহ একেবারে অবিবেচনার কার্য্য এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে সমাজের আর একটী ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। ভদ্রলোকের কন্যাদায় যে ক্রমে কি ভীষণ হইতেছে তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। অবস্থাপন্ন শ্বশুরের অর্থসাহায্যে পড়াশুনা করিয়া মানুষ হওয়া অনেক দরিদ্র যুবকের পক্ষে সুবিধা জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু এক সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালা ছাড়া এরূপ সুবিধা পৃথিবীর আর কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। সে সব স্থানেও অনেক দরিদ্র যুবক নিজের চেষ্টায় বড় হইয়া থাকেন। বাঙ্গালাতেই বরং শ্বশুরের রাশি রাশি অর্থ ধ্বংস সত্ত্বেও, অনেক যুবক যেমন তেমনই থাকেন। বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানগণের দারিদ্র্যের যে সব কারণ উল্লিখিত হইল, ইহা

ব্যতীত আরও দুই একটা আছে। যে কারণেই হউক দিন দিন আহার্য্য দ্রব্যাতর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। আগে যে পয়সায় যে পরিমাণে জিনিসপত্র মিলিত এখন সে পয়সায় আর তা মেলে না। বিশ পাঁচশ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্য তাহা অপেক্ষা তিন চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিস্তারে আমাদের নানাপ্রকার বিলাসিতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বড় চাকুরেদেরই অনেক সময় অভাব ঘোচে না শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট বিশ পাঁচশ বা দশ পনের টাকা বেতনের চাকুরেদের ত কথাই নাই। যদি জিনিসপত্র আগের মত সস্তায় মিলিত, বিলাসিতার বাজেখরচ এত না বাড়িত, তবে অন্ততঃ যাঁহারা চাকুরী করেন কোনও মতে তাঁহাদের এক রকম দিন চলিত। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহদের আমলে বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানদের অবস্থা এত হীন ছিল না। তখন ভদ্রলোকগণ সকলেই একেবারে চাকুরীর উপর নির্ভর করিতেন না। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য নিজেরাই অনেক উৎপাদিত করিতেন। ভদ্র গৃহস্থগণের সকলেরই প্রথমতঃ এই প্রধান লক্ষ্য ছিল, যাহাতে কিছু ক্ষেত খামার করিতে পারেন যে বৎসরের প্রধান খাদ্য চাউল ও কলাই না কিনিতে হয়, ইহা ছাড়া গৃহস্থদের নানাপ্রকার আহার্য্য জন্মাইবার প্রবৃত্তি ও যত্ন ছিল। এই প্রবৃত্তি ও যত্নফলে বসতবাটীসংস্পৃষ্ট বাগানে নানা-প্রকার ফল ও তরীতরকারী জন্মিত, পুকুরে অনেক মাছ পাওয়া যাইত গৃহপালিত গাভী দুগ্ধ দিত, গৃহিণীরা সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখনাদিও প্রস্তুত করিতেন। সুতরাং আহার্য্য পদার্থ ভদ্র গৃহস্থের মধ্যে অনেকের অতি কমই কিনিতে হইত। যাহা কিনিতে হইত তাও অনেক সুলভে মিলিত। এইসব কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য কেহ না কেহ বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু এখন বাড়ীতে থাকিয়া গৃহস্থালী করিবার প্রবৃত্তি কাহারও বড় নাই। সকলেই বিদেশে যাইয়া চাকুরী করিবার জন্য ব্যস্ত। এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে ভদ্র গৃহস্থগণ নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়া ক্ষেত খামারের চাষবাস, বাড়ীতে বাগান, পুকুর, গাভী ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। ইঁহারা শিক্ষিত চাকুরে না হইলেও, অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার বাহ্যিক চাক্‌চিক্য ইঁহাদের মধ্যে না থাকিলেও, বাঙ্গালার ভদ্রলোকদের মধ্যে ইঁহারাই সুখী, ইঁহাদের অবস্থা ভাল, বর্ত্তমানের ভীষণ দারিদ্র্য ইঁহাদিগকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

তারপর এখনকার নব্য বাবু ও বাবুগৃহিণীগণের মত তখনকার গ্রাম্য গৃহস্থ

ও গৃহিণীগণের এত বিলাসিতা ছিল না—এত নানাবিধ কাপড়, জামা, জুতা, অলঙ্কারাদি লাগিত না। বাজার করিতে চাকর দরকার হইত না, ঘরের বেড়ার একটা বাঁধন ছিঁড়লে ঘরামী লাগিত না, লাউ-কুমড়া গাছের গোড়ায় একটু মাটি দিতে কৃষাণ লাগিত না; বামুন না হইলেও পাক হইত, ঝি না থাকিলেও বাসন মাজা হইত, দেশলাই ছাড়া প্রদীপ জ্বলিত; বার্ডসাই মিলিত না, ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও ছেলেদের খেলা হইত, চা-পান ব্যতীত শরীর সুস্থ থাকিত, সোডা-লেমনেড ছাড়া হজম হইত; কুন্তলীন বিনা কেশ-বিন্যাস চলিত, অডিকোলন-ল্যাভেণ্ডার ছাড়া মাথা ঠাণ্ডা থাকিত, কত আর বলিব? দারিদ্র্য দুঃখ কি এক রকমে বাড়িয়াছে? এক রকমে কি আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে? আমরা কাচের চাকচিক্যে সোনা ছাড়িয়াছি; চক্ষু নষ্ট করিয়া চশমা পরিয়াছি; নদী সেঁচিয়া রাস্তা বাঁধিয়াছি; কীর্ত্তন ছাড়িয়া বল নাচিতেছি।

বাঙ্গালী ভদ্র সম্প্রদায় দরিদ্র, তাই তারা দুঃখী। কিন্তু যে সব গুণে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য সে সবগুণ যদি তাহাদের থাকিত, তবে এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তাহারা মানব সমাজের মধ্যে আদৃত হইত। হীন অধঃপতিত জাতি বলিয়া জগতে হেয় হইয়া থাকিত না। যে কারণে তাহারা দরিদ্র, ঐসব গুণ থাকিলে সে কারণ দূর করিয়া তাহারা দারিদ্র্য ঘুচাইতেও পারিতেন। নিজের বুদ্ধি ও প্রকৃতির দোষে যেখানে লোকে দুঃখ পায়, সেখানে আর প্রতিকারের উপায় নাই। প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা স্বত্বেও প্রতিকুল ঘটনা-প্রভাবে লোকে নিজ দুঃখ দূর করিতে অসমর্থ হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। সেজন্য দুঃখীকে সকলেই সহানুভূতি করে, কেহ দোষ দেয় না। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক অধোগতিও বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের দুরবস্থার আর একটী প্রধান কারণ। সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ এবং শ্রমক্লেশ-সহিষ্ণু দেহ মানবজীবনের প্রধান কাম্য বিষয়। জীবনের কর্ত্তব্য পালনের জন্যই হউক অথবা সুখভোগের জন্যই হউক, এরূপ শক্তিসম্পন্ন দেহ ব্যতীত মানব-জীবন ব্যর্থ। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান সাধারণতঃ নানা রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ, দুর্ব্বলদেহ। বাল্যাবধি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান এরূপ অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হয় যে সুস্থ, সবলদেহ-সৌভাগ্যলাভ তার পক্ষে বড়ই দুর্ঘট। অতি শৈশবেই বালকগণ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। আমাদের গরম দেশ, তাই বরাবর নিয়ম ছিল প্রাতে ও অপরাহ্ণে লোকে কাজ করিত, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। প্রাচীনকালে রাজসরকারে কাজকর্ম্মের ঐ ব্যবস্থা ছিল শুনিয়াছি। এখনও সেকেলে দেশী ভাবে যেখানে কাজকর্ম্ম হয়, অর্থাৎ জমিদারসরকারে, টোলে ও পাঠশালা প্রভৃতিতে ঐ নিয়ম

দেখা যায়। শীতপ্রধানদেশবাসী ইংরেজ রাজার নিয়মানুসারে এখন সব উল্টা হইয়া গিয়াছে। শিশু বিদ্যালয় হইতে প্রবীণের আফিস কাছারী প্রভৃতি সবই দুপুরে বসে। দুপুরের গরমে বালকগণকে উপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচল বিহীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয় গৃহে চারি পাঁচ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিতে হয়। পাঠ্য বিষয় ও পুস্তকাদি তাদের কোমল মস্তিষ্কের পক্ষে নিতান্ত গুরুতর এবং দুঃসহ ভারবৎ। শিক্ষাদান প্রণালীও সেই দুঃসহ ভারের উপর কঠোর আঘাত মাত্র। অনেক স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মানসিক শক্তি সেই কঠিন আঘাতে জড়নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। অতি অল্পসংখ্যক বালকেই প্রকৃত বিদ্যাভ্যাসের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। কেবল অসুস্থ শরীর ও মস্তিষ্কের ক্ষয়ই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ফল দেখা যায়। ছেলেরা স্কুলে যাক, রাতদিন পড়ুক, ভাল পাশ করুক, আমরা এই চাই। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারেই নাই। অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এবং সুস্থ সবল দেহ গঠনের জন্য ব্যায়াম ক্রীড়াদি এবং পুষ্টিকর আহার্য্য নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি একেবারেই নাই। বালকগণের ক্রীড়া ও ব্যায়ামপ্রসক্তি আমরা বড় ভাল চক্ষে দেখি না। বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়াই আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যদি ছেলে পড়ে, মোটে বাড়ীর বাহির না হয়, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের ভাল ছেলের প্রধান লক্ষণও ইহাই। কিন্তু এই ভাল ছেলে যে কালে নানা ব্যাধিগ্রস্ত ও সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম হইয়া দুর্ব্বিষহ দেহভার কোনও মতে বহন করিয়া সুতরাং জীবন কাটাইবে, তা আমরা একেবারেই বিবেচনা করি না। বালকগণের ব্যায়াম সম্বন্ধে যেরূপ, তাদের উপযুক্ত আহার সম্বন্ধেও আমরা তদ্রূপ উদাসীন। অনেকে দারিদ্র্যবশতঃ সন্তানের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু যাঁরা পারেন তাঁরাও করেন না। সর্ব্বদা নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনার জন্য আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ক্ষয় হইতেছে। একমাত্র উপযুক্ত আহারেই সেই ক্ষতির পরিপোষণ হইতে পারে। স্বাস্থ্যনীতির এই গূঢ়তত্ত্ব আমরা জানি না, জানিয়াও বড় গ্রাহ্য করি না। মিতব্যয়ী গৃহস্থ আহার্য্যের ব্যয়সংক্ষেপে যা কিছু মিতব্যয়িতা দেখান। অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্ম, ভদ্রোচিত চাল চলন, বেশভূষা সবই অতিমাত্রায় চলিতে থাকে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ। এই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যা আমরা বাঁচাইতে পারি তাই অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা সাধারণতঃ এই ধর্ম্মের হানি

করিয়া অন্যান্য কাজকর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করি। যা দিয়াই হউক কোনও মতে দুবেলা পেট ভরিতে পারিলেই আমরা মনে করি, যথেষ্ট আহার হইয়াছে। কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে শরীর পুষ্টি, কেবল উদরপূর্ত্তি নয়, একথা আমরা মনেই করি না। এই উদ্দেশ্য এবং ইহার অত্যাবশ্যকতা যদি আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তবে অযথা ভদ্রলোকের চালচলন ইত্যাদি ছাড়িয়াও—চাষার মত থাকিয়াও—দেহ-রক্ষা-ধর্ম্ম আমরা পালন করিতাম। প্রথম বয়স—যে বয়সে লোকের শরীরপুষ্টি ও শরীরগঠন হয়, সে বয়স আমাদের এইভাবে কাটে, তারপর পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া যখন সংসারে প্রবেশ করি, তখন উদরান্নের জন্য চাকুরী অন্বেষণ, সেই চাকুরীতে রাত্রিদিন বদ্ধগৃহে মস্তিষ্ক চালনা, দারিদ্র্যজনিত নানাবিধ দুশ্চিন্তা, আহারের অভাব, শরীর চালনায় শৈথিল্য ইত্যাদি কারণে পাঠাবস্থায় ভগ্ন-স্বাস্থ্য, জীবনে আর শোধরাইতে পারি না। ইহার উপর বিলাতী সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে আমরা মজিয়াছি, বিলাতী বিলাসিতার একেবারে গা ঢালিয়াছি। বিলাসিতা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আইসে না, তবে যদি তাহাতে শরীর অকর্ম্মণ্য না হয়, তবে স্বচ্ছন্দ টাকা থাকিলে তাহাতে বিশেষ কোন হানিও দেখা যায় না। সাহেবদের টাকা আছে, তারা বিলাসীও খুব। কিন্তু এই বিলাসিতা সত্ত্বেও সাহেবরা সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ। বিলাসী সাহেব অনেক কাজ করিতে পারে—তার শরীরে অনেক সয়। বিলাসবিহীন সেকেলে পল্লী-গৃহস্থও অনেক কাজ করিতে পারে, তার শরীরেও অনেক সয়! কিন্তু সাহেবী বাঙ্গালীবাবু না এদিক না ওদিক। তাঁর শরীর যে কি কাজের উপযুক্ত, তাঁর শরীরে যে কি সয় তা জানিয়া পাই না। দু পা চলিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইয়া তাঁকে পাখার বাতাস খাইতে হয়। ফ্লানেল নহিলে তাঁর গায় ঠাণ্ডা লাগে, জুতা মোজা না হইলে পায় ঠাণ্ডা লাগে, ছাতা না হইলে মাথায় রৌদ্র সয় না, চা না খাইলে শরীরে স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহাতে কোথায় কার শরীর ভাল থাকে? সুস্থ শরীরে হাওয়া, রৌদ্র, বৃষ্টি সব সহিবে, সুস্থ শরীর সকল কার্য্যে সমর্থ হইবে। শরীর সুস্থ করিতে হইলে তাহাতে হাওয়া, রৌদ্র, বৃষ্টি সহাইতে হয়, যাহাতে তাহা সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ হয়, তাই করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু ফ্লানেলে জড়িত হয়, ফ্লানেলে জড়িত হইয়াই পরিবর্দ্ধিত হয়। গরম দেশে অত সহিবে কেন? সর্ব্বদা বসনাবৃত দেহ যখনই উন্মুক্ত হয়, তখনই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হয়। শারীরিক ব্যায়াম আরাম ও পরিচ্ছন্নতা কিছুর অভাবই আমাদের দেশে অত

কাপড় লাগে না। ব্যবহার করিয়া অযথা অর্থব্যয়ও হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার শরীরটিও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলি। আবার পুনঃ পুনঃ স্বেদসিক্ত দুর্গন্ধ ইস্ত্রী করা সার্ট কোটে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যে কতদূর রক্ষা হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। নানা কারণে স্বাস্থ্য নাশে এবং ভোগবিলাসিতার প্রাণ আসক্তিতে বাঙ্গালী-দেহে পুরুষোচিত বলবীর্য্য, সামর্থ্য, দৃঢ়তা, কর্ম্মকুশলতা, শ্রম-ক্লেশসহিষ্ণুতা গুণ একেবারেই নাই। যে দেশে মাতৃকক্ষচ্যুত শিশুরামের দেহাঘাতে পাষাণ ভগ্ন হইয়াছিল; যে দেশের কবিগুরু কালিদাস "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শাল প্রাংশু মহাভুজ" প্রভৃতি বিশেষণে পুরুষরূপের আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন; যে দেশের আদর্শ রমণী মূর্ত্তিমতী কোমলতা সীতা চিত্রাঙ্কিত রামের "দেহ সোহাগগণ অণাদরস্ফুড়ব সঙ্করসরাসনঃ" মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই দেশে শিশিরস্নাত উষার সেফালীবৎ স্নিগ্ধলাবণ্যময় নধর কোমলদেহই বাঙ্গালীপুরুষের দেহসৌভাগ্যের চরম আদর্শ হইয়াছে। বাঙ্গালীর দেহ যেন বিধাতা-কুসুম-শয্যার সুস্নিগ্ধ আরাম উপভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষোচিত কোন কার্য্যের জন্য নয়। দীন বাঙ্গালী ক্ষীণ, দুর্ব্বলদেহ, শ্রমকাতর, ক্লেশকুণ্ঠ। অলস বাঙ্গালী সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যমবিহীন, ভোগবিলাস ও আরাম-বিরামে একেবারে গা ঢালা। হীন বাঙ্গালী নিজের ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, সুখ স্বার্থ প্রভৃতি মানবজীবনে যা কিছু কাম্য, সমস্ত রক্ষার ভার পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত। পরে শিক্ষা দিলে বাঙ্গালী শিখিবে, পরে খাইতে দিলে খাইবে, পরে মান রাখিলে তার মান থাকিবে, পরে ধরিয়া তুলিলে উঠিবে, ফেলিয়া দিলে পড়িয়া থাকিবে, পড়িয়া পড়িয়া গালি দিবে। ইংরেজের অধীন বাঙ্গালী, ইংরেজ যা করিতে দিবে না, তা করিতে পারে না। তাই বলিয়া যা পারে তাই-বা করে না কেন? সকল কাজে-ত ইংরেজ-রাজা আসিয়া আমাদের হাত চাপিয়া ধরে না? ক্ষেত পড়িয়া আছে, চাষিতে গেলে ইংরেজ হালগরু কাড়িয়া লইবে না। জলকষ্ট হইয়াছে, আমরা পুকুর কাটিলে ইংরেজ সে জল সেঁচিয়া ফেলিবে না। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, আমরা ক্ষুধার্ত্তকে ভাত দিলে ইংরেজ তার মুখ চাপিয়া ধরিবে না। আমাদের ছেলেপিলেকে আমরা মনোমত লেখাপড়া শিখাইলে ইংরেজ যাদুমন্ত্রে তাহা ভুলাইতে পারিবে না। আমরা গিয়া সাহেবের দোকানের বাবুয়ানা জিনিষ না কিনিলে তারা বাড়ী বহিয়া দিয়া যাইবে না। আমরা জোলার বুনি পরিলে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক তাহা কাড়িয়া লইয়া তাদের কাপড় পরাইয়া দিবে না।

আমরা কেরাণীগিরি না করিলে ইংরেজরাজ গলায় গামছা দিয়া তাদের আফিসে টানিয়া নিবে না। শান্তিপূর্ণ ইংরেজরাজত্বে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সভ্যতা বিস্তারে আমরা বড়ই উন্নত ও সভ্য হইয়াছি বলিয়া মনে করি। সর্ব্বত্র স্কুল কলেজে সহস্র সহস্র বালক ও যুবকের বিদ্যাভ্যাস, সভা সমিতি, বক্তৃতা আন্দোলন, প্রত্যহ সংবাদপত্রে গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ, সরস তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায় শাসননীতির অবাধ সমালোচনা, এই সব দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, আমরা যেন কত বড়ই হইয়াছি। কিন্তু সবই মাকাল ফলের বাহ্যিক শোভা,—তুবড়ী বাজীর ফাঁকা জাঁকাল আগুনের ঝাড়। আমরা ইংরেজের মত ভাবিতে পারি, লিখিতে পারি, কথা কহিতে পারি; পারি না কেবল ইংরেজের মত কাজ করিতে, ইংরেজের মত নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে। ইংরেজের মত সাজিতে শিখিয়াছি, ইংরেজের চাল চলনে চলিতে শিখিয়াছি; শিখি নাই কেবল ইংরেজের মত সাধারণ কর্ত্তব্যে স্বার্থ বলি দিতে, মন্ত্রের সাধনে শরীরপাত করিতে। বাঙ্গালীর যা কিছু উৎসাহ উদ্যম ছাত্রজীবনেই দেখা যায়। সভাসমিতি আন্দোলন যেখানে যাই হউক, অঙ্গপুষ্টি ছাত্র-সমাবেশেই হয়। ছাত্র বাদ দিলে বড় কিছু থাকে না। ছাত্রজীবনে অনেক সভাসমিতি ও আন্দোলনে অদম্য উৎসাহ উদ্যম দেখাইয়া, কত উচ্চ আশা, উচ্চ সংকল্প বুকে লইয়া যুবকগণ সংসারে প্রবেশ করেন। খড়ের আগুন যখন জ্বলে, বেশ দেখায়, তবে দপ্ করিয়া পড়িয়া যায়। চাকুরে যুবক চাকুরীর নিশ্চিন্ত সুখ সম্ভোগের আরামে আলবোলার নলটী মুখে লইয়া তাকিয়ায় গা ঢালিয়া একবার নয়ন মুদিলে ভারতমাতার জীবন্ত জাগ্রতমূর্ত্তি ক্রমে স্বপ্নের ক্ষীণছবি হইতে ক্ষীণতর হইয়া কোথায় মিলাইয়া যায়! তখন সাধের ঠেকান হাতের লাঠি সাহেবের পথরোধকারী হীন নেটিভের পৃষ্ঠে পড়ে। মুষ্টিবদ্ধ হস্ত কোমল হইয়া সাহেব চরণের আরাম সাধন করে। ওজস্বিনী বক্তৃতাময়ী রসনা সাহেব তুষ্টির মিষ্ট রস বর্ষণ করে। উপার্জ্জিত অর্থ সাহেব বণিকের অর্থকোষ পূর্ণ করে। জীবনের সমস্ত লক্ষ্য, সমস্ত সংকল্প নিজের পদোন্নতি, ও পুত্র জামাতার চাকুরীপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। নিজের দোষ আমরা দেখি না, দেখিতে চাই না, কিন্তু দেখিলে বলিয়া শেষ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট ইহা করিল না, তাহা করিল না বলিয়া গালি দিই। কিন্তু এমন হতভাগ্য অসারপ্রকৃতি জাতির উন্নতিসাধন [illegible]-[illegible] সর্ব্বত্যাগেচ্ছু স্বয়ং রামচন্দ্র রাজা হইলেও করিতে পারিতেন না।

আত্মোন্নতি সাধনে যত্নশীল ব্যক্তি বিপদে অন্যের সাহায্যে উপকৃত হইতে পারে। অলস ভিখারীর হাতে কুবেরের ধন সঁপিয়া দিলেও দুদিন পরে সে যে ভিখারী সেই ভিখারীই হইবে।

বাঙ্গালীর এই অধঃপতিত অবস্থার যতগুলি কারণ পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, সকলের মূলে একটী গূঢ় কারণ নিহিত আছে, সেই কারণটী বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত নিশ্চেষ্টতা, স্বাবলম্বনের ক্লেশকুণ্ঠতা! সহজে অন্যদ্বারা কাজ চলিয়া গেলে বাঙ্গালী নিজে কষ্ট করিতে চায় না। কোন হাঙ্গামায় না গিয়া কোনও মতে আরাম বিরামে দিন কাটাইতে পারিলে বাঙ্গালী, জীবন কৃতার্থ মনে করে। বাঙ্গালী চিরদিনই চতুর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু এই প্রধান প্রকৃতিগত দোষে বাঙ্গালী কোনদিনই জাতীয় গৌরবে বড় একটা গৌরবান্বিত হয় নাই। বাঙ্গালার পল্লীগুলি বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনপুষ্টির প্রধান ক্ষেত্র, পূর্ব্বে পল্লী-বাসী বাঙ্গালীগৃহস্থ চাকুরীলালসায় সহরে বড় যাইত না। নিজেদের ক্ষেত, খামার, বাগান, পুকুর, গোশালা প্রভৃতির কার্য্যতত্ত্বাবধানে পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিত অর্থাৎ নিজেরাই দেশের উৎপাদিকা শক্তির সাহায্যে নিজেদের জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিত। বিলাতী সভ্যতার আনুসঙ্গিক বিলাসিতার বায়ও ছিল না। তাই বাঙ্গালী এরূপ দারিদ্র্য দুঃখে পীড়িত কখনও হয় নাই। চাকুরীর উপায় স্বরূপ বিদ্যাউপার্জ্জনের জন্য বা চাকুরীর জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কঠোর মস্তিষ্কচালনা করিতে হইত না। অযথা দেহসজ্জা ও গৃহসজ্জার জন্য অনাহারে শরীর নষ্ট করিতে হইত না। স্বেদসিক্ত দুর্গন্ধ বস্ত্রাবৃত দেহে জনপূর্ণ সহরের দূষিত বদ্ধবায়ুর মধ্যে, নিষ্ফল শ্রমে লেখনী চালনা না করিয়া, সজীব প্রকৃতির লীলাভূমি পল্লীর মুক্ত নির্ম্মল শীতল বায়ুতে স্নিগ্ধ নগ্নদেহে সফল শ্রমে দেহ চালনা করিত। তাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজশাসনে বাঙ্গালীকে অনেক সময়ে কঠোর আত্ম ও সমাজ হিতকর কার্য্যেও ব্রতী হইতে হইত। তাই বাঙ্গালী আত্মসুখ, আত্মভোগবিলাসে গা ঢালিয়া এত হীন কখনও হয় নাই। এখনও বাঙ্গালী চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত। ইংরেজী শিক্ষায় বাঙ্গালীর মত ভারতের আর কোন জাতি এত শীঘ্র, এতদূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু এই উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও, প্রবলশক্তিসম্পন্ন ইংরেজের জাতীয় গুণ সমূহের শত শত উদাহরণ চক্ষের সমক্ষে দেখিয়াও, বাঙ্গালী যে প্রকৃত পক্ষে কোনও উন্নতি লাভ করে নাই—বরং ইংরাজী সভ্যতার বাহিক চাকচিক্যে ভুলিয়া পুরাতন যা কিছু ভাল ছিল সব ছাড়িয়া, ইংরেজের চালচলন

অবলম্বনে যতদূর হীন অবস্থায় পড়িতে হয় পড়িয়াছে ; তাহার কারণও বাঙ্গালীর সেই প্রকৃতি গত প্রধান দোষ। প্রকৃতি-গত দোষ পরিহার করা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। দৈব ও প্রকৃতি যতই বলবৎ হউক্ পুরুষকারের বলও কম নয়। অদৃষ্টবাদে প্রবল আস্থা বলিয়া অনেকে হিন্দুর অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন বটে, কিন্তু বিচক্ষণ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ দৈবের নিম্নে কখনও পুরুষকারের স্থান দেন নাই। দৈব যতই প্রতিকূল হউক, প্রকৃতির প্রভাব যতই বলবান হউক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞের পুরুষকার সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। নিজের হীনাবস্থা বুঝিয়া বাঙ্গালীর মনে যদি আন্তরিক ধিক্কার জন্মে ; নিজের উন্নতি নিজের চেষ্টাসাপেক্ষ এই মহাসত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে নিজের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয় ; প্রকৃতিগত নিশ্চেষ্টতা, দৈব প্রতিকূলতা সকল বাধা পদদলিত করিয়া বীরের মত বাঙ্গালী সেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেই হইবে। বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে ;—আত্মনির্ভরতার সকল কষ্ট সহিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার পর ঠিক পথটি ধরিয়া চলিতে হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

অগ্নিপরীক্ষা।

সময় এসেছে এবে, আর বাক্যজালে
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ঢাকি সযতনে
রাখিতে নারিবে কেহ। সরম আড়ালে
লুকায়ে স্বার্থের তৃষ্ণা অতি সঙ্গোপনে
আসিছে সম্মুখে এক প্রলয় ভীষণ,
হইতেছে ঘনীভূত কৃষ্ণ মেঘ রাশি,
তাই দেখি করিতেছে দূরে পলায়ন—
কপট দুর্ব্বল যারা যশের প্রত্যাশী!

কে পারে দেশের পূজা লভিতে কখন?
মিছে ভাণ প্রতারণা হবে ভস্মীভূত
অগ্নি পরীক্ষায় শুষ্ক তৃণের মতন,
লজ্জায় গর্ব্বিত শীর্ষ হবে অবনত!
নিষ্কাম সাধক যত মায়ের সন্তান
উল্লসিত সংগ্রামের দেখি আয়োজন ;
দেশের কল্যাণে তারা সমর্পিয়া প্রাণ
দিব্যধামে সহোল্লাসে করিবে গমন।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। } একাদশ সংখ্যা।

কালীধ্যানের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ।

সাকারবাদী হিন্দু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞাত। কিন্তু নিরাকারই যে সাকার, এ সূক্ষ্মতত্ত্ব অনেকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। "মৃণ্ময় আধারে চিণ্ময়ী দেবী" যিনি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি সাকারবাদীকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন না।

"নিরাকারাপি সাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

নিরাকারাই সাকারা এবং তিনি আত্মমায়া দ্বারা বহুরূপে প্রতীয়মানা হন।

"একোঽহং বহুস্যাং" ইত্যাদি।

(শ্রুতি)

একমাত্র আমিই বহুরূপ ধারণ করি, ইত্যাদি শ্রুতিতেও বহুরূপের আভাস আছে।

ধর্ম্মজগতের সারভূত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

জ্ঞানযোগে নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারা জ্ঞানী সাধক অমৃতত্ব লাভ করে, আবার ভক্ত সাধক সাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু,—

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"

দেহধারীর পক্ষে অব্যক্ত পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির করা বড়ই ক্লেশকর।

অপিচ—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতং
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরং।"

অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ পরমতত্ত্ব না জানিতে পারিয়া আমার মানুষী তনুকে অবজ্ঞা করে।

এইরূপ ভাবে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই নিরাকার, সাকার, সগুণ, নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই তত্ত্ব নিরূপিত আছে।

ব্রহ্ম—"একমেবাদ্বিতীয়ং"—হইলেও পুরুষ-প্রকৃতি, পরমব্রহ্ম-মায়া, পরমাত্মা-ইচ্ছাশক্তি, মহারুদ্র-মহাকালী, পরমশিব-আদ্যাশক্তি, কৃষ্ণ, রাধা ইত্যাদি নানা সংজ্ঞায় অভিহিত।

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপুরুষাত্মকব্রহ্ম, শক্তি শক্তিমানের অভেদ কল্পনা দ্বারা "এক"।

এই প্রকৃতি পুরুষাত্মক ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ হইলেও* কাপিল মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী। এবং দেবীভাগবৎ মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি কতিপয় শাক্ত গ্রন্থেও আদ্যাশক্তি মহামায়াকেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার বেদান্তবাদীগণ এবং বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি পুরুষ প্রধান গ্রন্থে পরমাত্মা বা পরমপুরুষ বিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা স্থির করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শক্তি শক্তিমানের অভেদ কল্পনা করিলে মূলে কোনই দোষ ঘটে না।

নিরাকারবাদী পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া অবশেষে "সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরূহং," "অবাঙ্ মনসোগোচরং," "অজ্ঞানখণ্ডং," "নিজবোধরূপং," "সচ্চিদানন্দং"—ইত্যাদি অব্যক্ত রূপ [illegible] করিয়াছেন।

আবার সাকারবাদীগণ বিরা[illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তরূপের বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি [illegible] ভাবপ্রসবন, তাঁহার রূপের বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

সাকারবাদীগণ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মের উভয় ভাবকেই তুল্য মনে করিয়া প্রত্যেক ভাবেরই বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

কার্য্যবিশেষে ভগবান যতপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছেন, সাকার-বাদী সাধকগণ তন্মধ্যে যে যেরূপে শ্রদ্ধাবান্ সে সেই রূপেই উপাসনা করেন। কিন্তু একটী প্রদীপ হইতে বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত হইলে যেমন প্রত্যেকটীর ঔজ্জ্বল্য

* ঋষিগণমধ্যে কেহ কেহ পুরুষের প্রাধান্য ও কেহ কেহ প্রকৃতির [illegible] স্বীকার করেন।

ও দাহিকাশক্তি তুল্য হয়। একমাত্র ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া ছাঁচে ঢালিলে যেমন হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতি নানা আকারে প্রতীয়মান হইলেও মিষ্টাস্বাদাদি গুণের কোন তারতম্য হয় না, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্ম প্রয়োজনানুসারে নানারূপ পরিগ্রহণ করিলেও মূলের কোন অপচয় হয় না।

সাকারবাদীগণ যে সমস্ত রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক রূপের পৃথক পৃথক ধ্যান আছে। তন্মধ্যে আদ্যাশক্তি বা দশমহাবিদ্যার "আদ্যা" কালীর ধ্যান এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীগণ বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত ও মার্জ্জিতরুচি হিন্দু যুবকগণ কালীর ধ্যান পাঠ করিয়া শাক্ত ভক্তগণকে নানারূপ উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে কালীরূপের অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য চিত্তে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। আমি সাধকও নহি, ভক্তও নহি, অথচ বিদ্যাবুদ্ধিও সেরূপ নাই, সুতরাং কালীর ধ্যানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কি বুঝিব? তবে দয়াময়ী দয়া করিয়া যে টুকু বুঝাইয়াছেন, তাহাই আজ আলোচনা করিয়া প্রাণের আবেগ মিটাইব।

কালীধ্যানং যথা,—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং অভয়াং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথৈব চ দিগম্বরাং কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাং শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥"

অস্যার্থ। দক্ষিণা কালিকাদেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করী, আলুলায়িতকুন্তলা, চতুর্ভুজা, পরমরূপবতী, মুণ্ডমালা পরিশোভিতা, বামভাগের অধোহস্তে অভয়, ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা, দেবী মহা মেঘপ্রভা, এবং শ্যামা ও দিগম্বরী (নগ্না)। দেবীর গলদেশস্থিত মুণ্ডশ্রেণী হইতে বিগলিত রুধিরধারায় সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত। শবমুণ্ড কর্ণভূষণ, দেবীরূপ অতি ভয়ানক, ভীষণ

করালমুখ-বিবর, স্থূল অথচ উন্নত স্তনদ্বয়, এবং কটিদেশে নরকরকাঞ্চী বিরাজমানা দেবীর মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বিগলিত রুধিরধারায় বদন উদ্ভাসিত, দেবীর স্বর অতি ভয়ঙ্কর, এবং মহারুদ্রভাবাপন্না (প্রকৃতি অতি উগ্র) দেবী সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন। দেবীর নয়নত্রয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, দন্তশ্রেণী উন্নত এবং বহির্গত, আলুলায়িত কেশপাশ দক্ষিণাংশব্যাপী। দেবী শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা চতুর্দ্দিক ঘোর-নিনাদিনী শিবাকুল পরিবেষ্টিতা। দেবী মহাকালের সহিত বিপরীত রতাতুরা (মৈথুনাশক্তা) দেবীর বদনমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল, এবং মুখপঙ্কজ হাস্যযুক্ত সর্ব্বকাম ফলপ্রদা কালীকে এইরূপ ভাবে চিন্তা করিবে।

এইত ধ্যানের বাক্যগত সরলার্থ। কিন্তু এই অর্থই যদি ধ্যানের প্রকৃত অভিপ্রায় হয়, তবে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ অবশ্যই আমাদিগকে আদিম অসভ্যযুগের কুসংস্কারাপন্ন প্রেতোপাসক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে মার্জ্জিতরুচি যুবকগণও নাসাকুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই ধ্যানের তাৎপর্য্যার্থ কখনই এইরূপ নহে।

কারণ; অনন্তজ্ঞান-সমুদ্র-দেবাদিদেব শঙ্করকে যদি তন্ত্রবক্তা বলিয়া স্বীকারলাভ করি, তথাপি এই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সংস্কৃত পদগুলি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার যে উপক্রম উপসংহারের সামঞ্জস্য বিধানের জ্ঞান অনুমাত্রও ছিল না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অর্থাৎ যে দেবীর করালবদন অতি ভয়ঙ্কর, যাঁহার উন্নত ও বহির্গত দন্তপংক্তি অতি ভীষণ, যাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, সৃক্কদ্বয়ে বিগলিত রুধিরধারা, নরমুণ্ড-নরকর যাঁহার ভূষণ, যিনি মহারুদ্রভাবাপন্না, করে অসিমুণ্ড, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে অনুলিপ্ত, তিনি কিরূপে সুরূপা (দিব্যাং) প্রসন্নবদনা, হাস্যমুখী সুলক্ষণা (শ্যামা) এবং বরাভয়দায়িনী হইতে পারেন?

করালবদনা বিকট-দশনার (ঘোর দংষ্ট্রাং করালাস্যাং) পক্ষে মুখ প্রফুল্ল মুখকমল সতত হাস্যযুক্ত (স্মেরানন সরোরুহাং) বড়ই বিসদৃশ এবং আলোক ও অন্ধকারের একত্র সমাবেশের ন্যায় অসম্ভব।

এরূপ রণোন্মত্তা বেশে ঘোরনাদিনী-শিবাকুল পরিবেষ্টিতা হইয়া শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি উপবিষ্টা হওয়া বা মহাকালের সহিত বিপরীত রতাশক্তা হওয়া কতদূর স্বাভাবিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ [illegible]

সম্বন্ধে এরূপ বিসদৃশভাব চিন্তা করা ভক্তসাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহাও পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতএব কালীর ধ্যানের অবশ্যই কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। অনন্তরূপা অনন্তভাব-প্রস্রবণ পরমাপ্রকৃতির লীলারহস্য মানববুদ্ধির অগোচর। ইহার প্রকৃতার্থ ভক্তসাধক ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

তবে দয়াময়ী কৃপা করিয়া এ ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে যতটুকু বুঝাইয়াছেন, এ স্থলে তাহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ আদ্যাশক্তি "কালী" শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? তাহাই দেখা যাউক,— "ভবরূপ মহাকাল জগৎ-সংহারকারক। মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ কালসংগ্রসনাৎ "কালী" সর্ব্বেষামাদিরূপিণী তোমার অন্যতররূপ জগৎ-সংহারক মহাকাল মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত কলন (গ্রাস) করিবেন। সর্ব্বভূতকে কলন করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি সেই মহাকালকে কলন (গ্রাস) কর বলিয়া তোমার নাম "কালী" অতএব তুমিই সকলের আদিরূপা। অর্থাৎ কালে সর্ব্বভূত (মহত্তত্ত্বাদি পর্য্যন্ত) তোমাতে লয় হওয়ায় প্রকৃতিরূপা তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট থাক।

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসি তমোরূপমগোচরং ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া মহত্তত্ত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ। নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণং॥ তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা। করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরং॥" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

সৃষ্টির আদিতে তুমিই একমাত্র তমো অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে, তোমার সেই তমোময়ী রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। পরমব্রহ্মের সিসৃক্ষাহেতু তোমা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন সর্ব্বকারণের কারণ সেই পরমব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী তুমি পরমব্রহ্মের ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বজগৎ সৃজন করিতেছ, পালন করিতেছ, পরিশেষে সংহার করিতেছ। এক্ষণ দেখিতে হইবে, কালী কেবল অসুরনাশিনী নৃমুণ্ডমালিনী অথবা আদিম অসভ্য যুগের আম-মাংস বা শোণিত-লোলুপা রাক্ষসভাবাপন্না নগ্না নারী নহেন। ইনি পরমপুরুষের পরাপ্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা সাংখ্যাচার্য্য কাপিল মতে "গুণত্রয়ঃ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের

কারণ স্বরূপ প্রকৃতিই শাস্ত্রান্তরের মায়া, ঈশ্বরের সৃজনীশক্তি, প্রাধানিক, অব্যক্ত, অগত্যোনি, বিক্ষেপশক্তিই আদি। সাকারবাদিগণ এই বিশ্ববীজ মূল প্রকৃতিকেই আদ্যাশক্তি "কালী" নামে অভিহিতা করিয়াছেন। উল্লিখিত কালীর ধ্যানেও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং॥ (মনু)

সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ তমোময়ী প্রকৃতিতে লীন ছিল, এবং প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দজ্ঞানের অতীত ছিল। সুতরাং প্রকৃতি প্রলয়ান্ধকার স্বরূপ তমোময়ী। অতএব "ঘোরাং" ভয়ানকাং।

সে সময় "নাহোর্নরাত্রির্নভূর্নভো নাগ্নিঃ। * * * *
প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ।"

দিবা নাই, রাত্রি নাই, ভূমি নাই, জল নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, বায়ু নাই, কেবল গাঢ় তমসাচ্ছন্ন, অনন্ত অন্ধকার সে অবস্থা অতি ভীষণ। তৎকালে একমাত্র প্রকৃতি এবং পরমব্রহ্ম অথবা (প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম) এই বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং প্রকৃতিরূপা আদ্যাশক্তি কালীকে "ঘোরাং" বলা হইয়াছে।

সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যখন প্রলয়কালে তমোগুণ প্রধানা হইয়া বিশ্বগ্রাসিনী সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন,—তখন তাঁহার করাল-মুখবিবরে অতিবেগে সর্ব্বভূতময় চরাচর বিশ্ব প্রবেশ করিতে থাকে। তখন সেই ভীমদন্তের ভৈরব চর্ব্বণে জগচ্চূর্ণীকৃত হইয়া প্রকৃতির বিশাল উদরে বিলীন হইয়া যায়।

মহাসংহার সময়ে যখন মহাকাল সমস্ত জগৎ কলন করিতে থাকেন, তখনকার অবস্থা কিরূপ ভয়ানক তাহার কিয়ৎপরিমাণ আভাষ গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং
* * * *
দংষ্ট্রাকরালানিচ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ॥

তোমার বিস্ফারিতানন বিশাল প্রদীপ্ত নেত্র, করাল দন্তশ্রেণী, কালানল সদৃশ অতি ভয়ানক, তুমি অনন্ত বদন ব্যাদান করিয়া সমস্ত লোক গ্রাস করিতেছ।

এক্ষণ দেখিতে হইতেছে, সর্ব্বসংহারক মহাকালকে যিনি কলন (গ্রাস) করেন, সেই তমোরূপা সংহাররূপিণী কালীকে "করালবদনাং॥ "ঘোরাং" "ঘোররাবাং" "দন্তরাং" "মহারৌদ্রীং" প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বিশেষণে বিশেষিত না করিলে স্বরূপ বর্ণন হয় না। মহাকাল গ্রাসিনী কালীর যে ব্যাত্তানন সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে সমুদ্যত, সে মুখের বিশেষণ "করাল" ভিন্ন আর কি হইবে? সেই জন্যই কালী "করালবদনা"।

যে ভীমদন্তের ভৈরব চর্ব্বণে জগৎ চূর্ণীকৃত হয়, তাহার বিশেষণ "ঘোর দংষ্ট্রা"ই স্বাভাবিক।

যিনি বিশ্বসংহারিণী, তাঁহাকে "মহারৌদ্রী" না বলিয়া আর কি বলিব?

যখন অনন্ত জগৎ প্রাণীহীন, বিশ্ব শূন্যময়, তখন তাহাকে মহাশ্মশান ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সেই সত্তাশূন্য অনন্ত শ্মশানরাজ্যে যিনি পরমপুরুষসহ বিরাজিতা তিনিই "শ্মশানালয়বাসিনী"।

যখন তমোরূপা কালী লোকক্ষয়ে প্রবৃত্তা, যখন শ্মশানালয়বাসিনী, তখন তাঁহার নৃমুণ্ডমালিনী, নরকর-কাঞ্চী বিভূষিতা, নরশিরকুণ্ডলা, নামই উপযুক্ত।

কালী, শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা কেন?

এ স্থলে "মহাদেব" পরমপুরুষের নামান্তর। পরমপুরুষ "সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু, ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি॥"

চিন্মাত্র পরমপুরুষ সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত, তিনি ভোজন করেন না, গমন করেন না, কোন পদার্থে অবস্থিতি করেন না। তিনি কিছুই করেন না, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়,—শবপ্রায়"।

সুতরাং শবপ্রায় (নিষ্ক্রিয় পরমপুরুষ) মহাদেবের হৃদয়োপরি প্রকৃতিরূপিণী "কালী" সংস্থিতা।　　(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

প্রত্যাখ্যাতা।

সভাতলে উপেক্ষিতা কহিলা সুন্দরী
প্রদীপ্ত সতীত্ব গর্ব্বে গ্রীবা উচ্চ করি
ক্রুদ্ধা রাজহংসী সম, "একি মহারাজ?
রমণী কি আসিয়াছে তেয়াগিয়ে লাজ
বিন্দু করুণার আশে দুয়ারে তোমার?
ভেবে দেখ মহারাজ, ভাব আরবার
শত অভিজ্ঞান-স্মৃতি, পড়ে না কি মনে
উভয়ের আত্মাহুতি প্রথম দর্শনে
নব-মুকুলিত পুষ্পে সজ্জিত-শোভিত
শ্যামল সে বনচ্ছায় কোকিল-কূজিত!
সেদিন রজতরেখা পবিত্রামালিনী
গেয়েছিল আমাদের মিলনরাগিণী!
কোমল নলিনী দলে গুঞ্জরি ভ্রমর,
বলেছিল সে কাহিনী মনোমুগ্ধকর!
প্রিয়ম্বদা অনুসূয়া পল্লব আড়ালে
দাঁড়াইয়া দেখেছিল ফুল্ল কুতূহলে
আমাদের দু'জনের প্রথম চুম্বন,
শঙ্কিত সন্ত্রস্ত দোঁহে লজ্জায় মগন
নিশার শিশির-সিক্ত সেফালীর প্রায়
শিথিল, পড়িনু ঢলে কম্পিত লজ্জায়
তোমার ও বক্ষপ্রান্তে, আমি অভাগিনী!
কে জানিত ছলনায় মজিনু তখনি!
আরো মনে করে দেখ, যবে একদিন
উভয়ে প্রেমের মোহে আছিনু নিলীন
দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশু এসেছিল ছুটে
তৃষাতুর পরিশ্রান্ত, পদ্মপত্র পুটে
ছিল তব বারিরাশি, মুখ ফিরাইয়া
চাহিল সে মোর পানে অধীর হইয়া!
সস্নেহে আদর করি দিনু তারে জল,
আনন্দে সে ছুটে গেল হইয়া বিহ্বল!
ঈষৎ হাসিয়া তুমি বলিলে তখন
আত্মজন সকলেরি বিশ্বাসভাজন!
আজ তুমি নরনাথ কেন জ্ঞানহারা?
কহিছ প্রলাপ একি হয়ে আত্মহারা?
হায়! পুরুষের প্রেম! অলির মতন,
নিত্য নব মধুলোভে করে বিচরণ
ফুলে ফুলে রসালাপ—কেবল ছলনা!
কেবল প্রেমের ফাঁদ ভুলাতে ললনা!
ধূর্ত্ত তুমি করিয়াছ বঞ্চনা আমায়
ধর্ম্ম কঞ্চুকের মত দুষ্ট শঠতায়!
ধর্ম্ম সাক্ষী নৃপবর সাক্ষী সখীদ্বয়
গন্ধর্ব্ব বিধানে বনে হৃদি বিনিময়
তোমার আমার! আজ নির্লজ্জের প্রায়
তবে কি, এসেছি রাজা সেবিতে তোমায়?
ধিক্ ধিক্ নগরের ঘৃণ্য আচরণ?
কলুষ করেনি স্পর্শ পুণ্য তপোবন।
চেয়ে দেখ চিত্ত মোর শুভ্র অনাবিল,
বন জ্যোছনার মত,—হয় নি পঙ্কিল।
কোথা আছ দেখা দাও জননী আমার
মাগিছে আশ্রয় মাগো! চরণে তোমার
উপেক্ষিতা শকুন্তলা?—ভিজিল বল্কল
অশ্রুজলে, অকস্মাৎ ভাতিল ভূতল
দিব্যরূপে মেনকার—সতী পতিব্রতা
উড়িলা বিমানপথে মহিমামণ্ডিতা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সামাজিক উপন্যাস।

["লহরী"]

গত আশ্বিন মাসের "আরতি"তে আমরা "নাটক উপন্যাস ও ইতিহাস" এর পরস্পর সহকারিতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। উপন্যাস হইতে তত্তৎকালের সমাজের যে একটী জীবন্তচিত্র লাভ করা যাইতে পারে এবং মানবচরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা কি মহোচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায় আমরা অদ্য তাহারই আলোচনা করিব। গতবারে উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাসের কথা লিখিতে আমরা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত "লহরীর" উল্লেখ করিয়াছিলাম। এখন দেখা যাউক, এই নূতন সামাজিক উপন্যাসে সমাজ ও লোকচরিত্র কিরূপভাবে প্রতিবিম্বিত বা পরিস্ফুট হইয়াছে।

আজকালকার অধিকাংশ অসার উপন্যাস, নবন্যাসের দিনে অমর বাবুর 'লহরী' খানা অতি উপাদেয় বস্তু। ইহা পাঠক, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িলেই স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট হইব। 'লহরী'র গল্পাংশ এই:— উৎপল বাবু স্বরূপগঞ্জের একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। 'লহরী' তাঁহার ভার্য্যা। একটী নবজাত শিশুর মৃত্যুতে লহরীর শরীর অসুস্থ বলিয়া স্থলের বাসা পরিত্যাগ করিয়া দম্পতী নদীবক্ষে বজরায় বাস করিতেছেন। কিছুদিন এইরূপ চলিয়াছে। বর্ষার নদীর মত দাম্পত্যপ্রেমের দুইকূলবাহী স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে। ইতিমধ্যে উৎপল বাবুর বাল্যবন্ধু, পাঠাবস্থার সহচর, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপগঞ্জে ওকালতী করিতে আসিলেন; আসিয়া উৎপল বাবুর শূন্যবাসায় আবাস গ্রহণ করিলেন! কিন্তু লহরীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্তের শান্তিভঙ্গ হইল। লহরীর প্রতি তাঁহার পাপদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল এবং কিরূপে লহরীকে আয়ত্ত করিবেন এই পাপ-বাসনা অনুদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ঝিকে টাকা দিয়া বশীভূত করা হইল। কিন্তু তাঁহার প্রলোভন-চিঠিগুলি উৎপলবাবুর প্রতিপালিত ইন্দ্র নামক একটী বালকের হস্তগত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে লহরীর পিতার স্বগ্রামবাসী পরোপকারব্রত, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, দেহবদ্ধনিষ্কামধর্ম্ম, যণ্ডখুড়া উৎপলবাবুর বাসায় লহরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উৎপলবাবু কার্য্যোপলক্ষে মফস্বল গিয়াছেন—যণ্ডখুড়া পাপিষ্ঠের সেই চিঠিগুলি লইয়া

তাঁহার নিকট ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে গিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়; পাপিষ্ঠ সুকুমার পাপ-ইচ্ছা বলপূর্ব্বক চরিতার্থ করিতে লহরীর নির্জ্জন মন্দিরে উপস্থিত, এমন সময় কপাট ভাঙ্গিয়া মণ্ডখুড়া, উৎপলবাবু ও চন্দ্র ইত্যাদি উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিয়া লুক্রেশিয়ার লাঞ্ছনা হইতে লহরীকে রক্ষা করিলেন। মণ্ডখুড়ার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ননাস সুকুমার পাপের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিল। লহরী প্রথমভাগ বা "প্রতিফল" এইরূপে শেষ হইয়াছে। তারপর "প্রতিদান" বা দ্বিতীয়ভাগ।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী উৎপলবাবু কলিকাতায় লহরীর পিতৃদত্ত প্রাসাদে বাস করিতেছেন। ডেপুটীগিরি ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তি নগদ ৩৮ লক্ষ টাকা মারোয়ারী ব্যাঙ্কে মজুত। কিন্তু ব্যবসায়ীর রীতি অনুসারে তিনি চারি লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া ব্যবসায় পাতিয়াছেন। সুকুমারের পাপ-চক্রান্তে হঠাৎ হরণচাঁদ দেউলিয়া হইয়া গেল। কত লোকের সঙ্গে সঙ্গে উৎপলবাবুও দেউলিয়া হইয়া প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু লহরী রাজপ্রাসাদের ভোগ, বিলাস ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া কেবল শাঁখা সিন্দূর লইয়া বিপুল 'পিতৃপ্রাসাদ' পরিত্যাগ করতঃ আজ কাঙ্গাল স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। সামান্য কুটীরে, আজন্ম-সুখ-বর্দ্ধিতা ধনি-কুমারী নবজাত শিশুটী ও স্বামীর সেবায় স্বর্গসুখ লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে পাপিষ্ঠ 'সুকুমার' বেনামী করিয়া সেই পিতৃপ্রাসাদের অধিকার লাভ করতঃ তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিল। এদিকে মহাপুরুষ ভাস্করানন্দের কৃপায় উৎপলবাবু প্লেগের দারুণ আক্রমণ হইতে মুক্তি ও পিতৃপ্রাসাদের সহিত সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন। তাহাতেও বিপদের চিরাবলম্বন মণ্ডখুড়া সহায়। পাপিষ্ঠ সুকুমার এবার ছিন্নকর্ণ হইয়া পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত লাভ করিল। আর সাধুর পরিত্রাতা, দুষ্কৃতকারীর বিনাশক, নিষ্কামধর্ম্মরূপী মণ্ডখুড়া বা যোগজীবন অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ইহা লইয়া গ্রন্থকার 'লহরী' শেষ করিয়াছেন।

উপন্যাস খানি আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গসমাজের মনোগৃহের একখানি আদর্শ চিত্র। 'লহরী' ধনি-কন্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, পিতামাতার আদরের মেয়ে, স্বামীর সোহাগ-পালিতা; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পায় নাই; কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগৃহে শিক্ষিতা, আধুনিক কলা-বিদ্যা-ভূষিতা। প্রাচীন হিন্দুগৃহের গৃহলক্ষ্মী দুহিতার সজীব মূর্ত্তি চারিদিকে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকরশ্মি

বিকীর্ণ হইয়া "উজ্জ্বলে মধুরের" অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়াছে। হিন্দু বধূর ন্যায় স্বামিগত জীবিতা, রন্ধন-কুশলা, গৃহ-কার্য্যদক্ষা লহরী যেখানেই যায় সেখানেই ফুল্ল যূথী লতার মত সৌরভে চতুর্দ্দিক মোহিত করে, স্নেহ-স্রোতে শারদ-চন্দ্রিকার মত পরিজনবর্গকে কূলে কূলে প্লাবিত করিয়া রাখে। চন্দ্র যেমন সর্ব্বত্র সুধাবর্ষী, লহরীও তেমনি ভাই-বন্ধু, দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজনে সমভাবে স্নেহ-বর্ষিণী। ভ্রমর, সূর্য্যমুখীও হিন্দুগৃহের চিত্র। কিন্তু তাহাতে কবির উদ্দেশ্য অন্যরূপ; ভ্রমর স্বামীতে দেবতা ভক্তি ও সরল বিশ্বাসের মূর্ত্তি। সূর্য্যমুখী পতির সেবায় নীরব আত্মত্যাগের সজীব চিত্র। এই উভয়ে কবি—সর্ব্বতোমুখী স্নেহবৃত্তি বিকাশ দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। কিন্তু অমরবাবু লহরীতে সবগুলি রমণীবৃত্তির কোমল বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মতে বেশ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এক কথায় বলিতে হইলে অনিন্দ্য-সুন্দরী "লহরী" ত্রিস্রোতা ভাগিরথীর ন্যায় গুরু, পতি এবং পুত্র ও দাসদাসীতে স্নেহের ত্রিধারা প্রবাহিত করিতেছে। তাহার গুরুভক্তির মন্দাকিনী, মা ও শশুখুড়ায়; প্রেমের অলকানন্দা স্বামীতে; আর বাৎসল্যের ভোগবতী শিশুটী, ইন্দ্র ও দাসদাসীতে। কেবল ইহাই নহে করুণারূপিণী বিপন্নের সাহায্যে মুক্তহস্তা। সুদূর চট্টগ্রামের বাত্যা-পীড়িত দরিদ্রও তাহার নীরব দানের পাত্র। গ্রন্থকার রূপগুণের চৌম্বক শক্তি দিয়া লহরী গড়িয়াছেন। যে রূপের ছটায় পাগল সুকুমার "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" সেই রূপের নিকট হ্যামিল্টনের অলঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরীবৃন্দ লজ্জাবনত-মুখী। গ্রন্থকারের ভাষায় "লহরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাভরণা সত্যবতী ভিন্ন সকলেই মনে করিতেছেন, অলঙ্কার গৃহে রাখিয়া আসিলে সুবোধের কার্য্য হইত।"

যে রূপগুণের রাশি দেখিয়া গন্ধপ্রাণ ডাক্তারবাবু ভাবিয়াছিলেন, "না করিবে কেন? লহরীর মত রূপেগুণে স্ত্রী পাইলে লোকে কি না করিতে পারে?" সেই লহরীকে দেখিয়া বৃদ্ধ হরনাথ, প্রাচীন হিন্দু হরনাথ, লহরীর বিদায়দিনে বিজয়াদশমীর বিসর্জ্জন-চিত্র মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "মা, আবার এসো।" বজরার মাঝি-মাল্লায়ও কিছুদিন লহরীশূন্য বজরায় সুনিদ্রা যাইতে পারে নাই। বজরা প্রতিমাহীন বেদীর ন্যায় এক উদাসভাব ব্যক্ত করিয়াছিল।" আমরাও বলি, "আদর্শ-হিন্দু-মহিলা-লহরি, তুমি যুগে যুগে হিন্দুর ঘরে, "আবার এসো।"

তারপর 'বগুখুড়া'; দেবী চৌধুরাণীর 'প্রফুল্লর' মত, সীতারামের 'চন্দ্রচূড়ের' মত, কুরুক্ষেত্রের 'কৃষ্ণা' মত বগুখুড়া নিষ্কামধর্ম্মের অবতার।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তাই বগুখুড়া আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী বগুখুড়া কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সব সকলেই সমভাবে মিশিয়া আপনার চরিত্রের প্রভাতী আলোকে সকলই হাস্যময় ও সকলই প্রদীপ্ত করিতেছেন। তিনি সুখের সহচর; আমোদের সঙ্গী; স্নেহের প্রস্রবণ; প্রণয়ীর বিশ্বস্ত সুহৃদ এবং দুঃখ-ক্লান্তের আশ্রয় তরু। কিন্তু তাই বলিয়া বুঝিতে হইবে না— বগুখুড়া একটী রূপক মাত্র। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট আছে। ধর্ম্মের ন্যায় তাঁহার গতি সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয়। প্রয়োজন মত তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। প্রয়োজন সাধন হইলে তিনি আবার কোথায় চলিয়া যান। তিনি "অপক্ষপাতী পবনের মত।" তাঁহার হৃদয়ের উপাদানগুলি "বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি শিরীষাদপি।" তিনি সুকুমারে অশনি-সম্পাত, বিভূতরণের দুঃখে রোরুদ্যমান বালক। তিনি ন্যায়ের অবতারস্বরূপ, মহাত্মা ভাস্করানন্দের শুভ বাসনার অভিব্যক্তি। শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অসীম সাহসিক কার্য্যে ব্রতী। তিনি যাহা ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া বোঝেন, কিছুই তাঁহাকে সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। বন্ধুগণের অমতেও তিনি বিভূতরণকে রেণুকার নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে প্রাণ দিয়াছিলেন উন্মত্ত ঝটিকাচ্ছন্ন অন্ধকারে দুর্গম প্রান্তর পারি দিয়া উৎপলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে পুলিশের তীব্র লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও ইন্স্পেক্টরের ভ্রান্তি অপনীত হইলে তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাসাদ হইতে কুটীর—সর্ব্বত্রই তাঁহার অব্যাহত গতি। এমন সুন্দর লৌকিক অলৌকিকের মিশ্রণ—এমন আকাশের মত নির্ম্মল, পর্ব্বত-বায়ুর মত মুক্তপ্রাণ, গিরিনদীর মত স্বচ্ছ, বৃক্ষের মত পরোপকারী চরিত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই মানুষ ও অতিমানুষের সংমিশ্রণ টেনিসনের আর্থারে আছে, বানিয়ানের Pilgrim's progress-এ আছে, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের প্রত্যেক চরিত্রে আছে।

অস্তাচলে এই দুইটীই প্রধান চরিত্র। উৎপলবাবু লহরীর অনুরূপ স্বামী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষ কিছু নাই। লহরীরূপ স্রষ্টা

সাজাইবার একখানা সোণার পাত মাত্র—ইংরাজীতে বলিতে হইলে—a gold foil to set off the gem Lahari. সংস্কৃত অলঙ্কারের ভাষায় তিনি "ধীরললিত" নায়ক—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

পাপ যেমন আপাত মধুর অথচ পরিণাম দাহী, সুকুমারও তেমনি মধুরাকৃতি, মিষ্টভাষী, চতুরালাপী যুবা কিন্তু পয়োমুখ বিষকুম্ভ। মিল্টনের সয়তান কিম্বা সেক্ষপীয়রের 'Iago'র মত পাপের জন্য পাপী নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গঙ্গারামের মত প্রবৃত্তির দাস। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কৌশলেন বলেন বা" ইহাই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। সুকুমারের নীতিজ্ঞান শূন্য হৃদয়, জলহীন সাহারা।

ইন্দ্র বালক। বালকের চরিত্র আরো একটু পরিস্ফুট হইলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু ইন্দ্রের বালকত্ব অনুকরণ প্রবৃত্তির অধিক দূর যায় নাই। চতুরা পুরাতন পাপী ঝির নিকট হইতে সুকুমারের পত্রগুলি আত্মসাৎ করা ঠিক বালকের কর্ম্ম কি না জানি না। তবে বালক হইলে কতকটা ইঁচড়ে পাকা সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রকে ঠিক অতটা বালক না সাজাইলেই ভাল হইত। কারণ সুকুমারের একরাশ চিঠি জমাইয়া রাখা ও সুযোগের অপেক্ষা করা অগ্রপশ্চাৎ অতটা বিবেচনা করা একটু পরিণত বয়সের আত্মসংযম ব্যতিরেকে সম্ভব বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। নিশীথে সুকুমারকে গাছ হইতে নামিতে দেখিয়া বোধ হয় বড়খুড়াও ইন্দ্রের মত চুপটী করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এই গেল লহরীর চরিত্রাঙ্কণ। এখন ভাষা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আজকালকার বাঙ্গালাভাষার উন্নতি দেখিয়া মনে হয় পাশ্চাত্য ভাব-সংঘর্ষে বাঙ্গালা ক্রমেই নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিতেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এরূপ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। অন্ততঃ মনোজগতে এমন কম ভাবই আছে যাহা বাঙ্গালায় সুন্দররূপে প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালা ঐশ্বর্য্যশালিনী সংস্কৃতভাষার দুহিতা, তাহাতে পাশ্চাত্য-ভাবালক্ষ্মী তাহার অঙ্গরাগ মার্জ্জিত করিয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিতেছেন সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব শ্রী হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বঙ্কিমের পর আধুনিক লেখকগণের শীর্ষভূত রবীন্দ্রনাথ সরল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সজীব গদ্যে সিদ্ধহস্ত। অমরবাবু এমন পরিমার্জ্জিত কবিত্বপূর্ণ প্রাঞ্জলভাষা লিখিতে পারেন জানিয়া দেখিয়া বড়ই [illegible]

হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের ভাষার সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নিজ ভাষার প্রতি প্রযোজ্য:—"তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সরলভাষায় সংক্ষেপে সজীবভাবে বিষয় ব্যক্ত করিবার এরূপ ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়।" লহরীর ভাষাটী তেমনই। স্থানে স্থানে উহা "ছন্দহীন কবিতা"। দুই একটী নমুনা দিতেছি:—

"লহরীর কথার সঙ্গে কচুরী বেশ মচমচে; চাহনীর সঙ্গে চমচম্ চমৎকার; রসিকতার সঙ্গে রসগোল্লা রসেভরা; মমতার সঙ্গে মোহনভোগ অতিমিষ্ট; আদরের সঙ্গে ফজলী আম—খেতে খেতে কি আরাম; ভক্তি ও প্রীতির সঙ্গে জল ও পান সুশীতল ও সুমিষ্ট।"

আবার, "লহরী স্বপ্ন দেখিল, তাহাদের নয়নের মণি চন্দ্রলোকে শ্বেত রাজহংসে চড়িয়া মধুর হাসি ছড়াইয়া উড়িয়া যাইতেছে, সে হাসির মৃদু আঘাতে শরতের সেফালিকা ফুটিতেছে, শীতল সৌরভ ছুটিতেছে।" এ সাকার হাসির তুলনা কেবল "রাশীভূতঃ প্রতিদিন মিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।"

আবার, "সেই অনুপস্থিত শ্রোতাকে শুনাইতে লহরীর হাত ছুটিল; পলক গিটকিরির সঙ্গে গলা আসিয়া যোগ দিল; হরিদ্বারে জাহ্নবী-তীরে দেবর্ষির সামগান তুল্য, সাগরসঙ্গমে বিহঙ্গের কলধ্বনি তুল্য সুরে তালে কি মধুর মিলন।"

অমরবাবুর উপমাগুলি এক একটী ক্ষুদ্র কাব্য। উহা রসে ভরপুর, ব্যাকরণের সূত্রের মত অল্পাক্ষরে, বিশ্বতোমুখ ও অনবদ্য। যথা:—

"জলস্রোতে যুবতীর জীবন্ত ছবি; জলদেবী যেন লহরীকে দেখিবার জন্য উঁকি দিতেছেন।"

এইরূপ তটিনীর স্বভাব-মুকুরে সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বে বিধাতার আদি সৃষ্টি Eve মুগ্ধ হইয়াছিল:—

As I bent down to look just opposite
A shape within the watery gleam appeared,
Bending to look on me :— P. L. Bk. VI.

আবার,—"রবির কিরণ তোমাদের আতসী পাথরে অমন সূক্ষ্ম বিন্দুতে ধরতে যেও না, আগুন ধরে যাবে।"

কিংবা,—"ওদারের অন্ত নাই, ভোজনের ভরসায় ওস্তাদগুলি রবাহূত [illegible] যেখানে সেখানে বসিয়া গিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর "পদচারণা করিতে লাগিলেন, যেন থাকবস্তার নক্সার উপর কাটা-কম্পাস চালিয়া বেড়াইতেছে।"

"খুড়া লাল কাল গোঁজল, তু'দিকে লাগে।"

"প্রফুল্ল একটী ছন্দহীন কবিতা।"

তা'র পর ভাষার Assonance অথবা ছেকানুপ্রাস দেখুন :—

"জিওগ্রাফীটা জঙ্গল," "ইহরী হাবড়ার হাট, মেথেমেটিক্‌স-ত মাথামাটী আছেই" ইত্যাদি।

অথবা,—"অষ্টিন অপেক্ষা তিনি এলিসন ভালবাসেন, যেন অপেক্ষা মন্নুতে তাঁহার মন অধিক, সেক্সপীয়রের নিকট সাক্ষী দাঁড়ায় না" ইত্যাদি।

"সামলার অপেক্ষা সাম্‌লা অনেক।"

পড়িতে পড়িতে কালিদাসের,

"স দুষ্প্রাপ যশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্ত বাহনঃ।
সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষে র্মহিষী সখঃ॥"

কিংবা টেনিসনের,

"Even to the tipmost lance & top most helm"
"Then with that friendly–fiendly smile of his"

অথবা "All day the wind breaths low with mellower tone
Thro' every hollow came & alley lone!"

মনে হয় না কি?

লহরীতে কাব্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ধ্বনি অথবা Suggestiveness এর অভাব নাই। দুই চারিটী কথা বলিয়া পাঠকের কল্পনাকে পথ ধরাইয়া দিয়া যে কবি নীরব থাকেন, তাঁহার বর্ণনাই ধ্বনিপূর্ণ অথচ Suggestive. লহরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনের প্রয়াস অতি অল্প; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে কবি ধ্বনিদ্বারা কত কাজ সুন্দরভাবে সারিয়া লইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ডাক্তারবাবুর স্বগতোক্তি বা নিরাভরণা সত্যবতীর বর্ণনা উল্লিখিত হইতে পারে। দুই একটী মাত্র কথা বলিয়া, যে একটী পূর্ণ চিত্র মানসপটে উদিত করিয়া দিতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি।

প্রাচীন রীতি অনুসারে অমর বাবুও "দুধে আল্‌তা" ইত্যাদি করিয়া প্রকাণ্ড ভাবে লহরীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ধ্বনিই বহুল। নৈষধকারের মত দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় শ্লোকের পাতিকা না গাঁথিয়া কবিতার

বিবাহ সম্ভাপে হর গৌরীর রূপ প্রকাশ্য বর্ণনা না করিয়াও কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন :—

“প্রযুক্তপাণিগ্রহণং যদন্যদ্
বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্।
সান্নিধ্যযোগাদনয়োস্তদানীং
কিং কথ্যতে শ্রীরুভয়স্য তস্য॥”

যণ্ডখুড়ার মৃত্যুকালে, তাহার সদ্গতির কথা অমরবাবু কেমন সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“একটী নির্ম্মল আত্মার পবিত্র চিত্র খুড়ার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল।”

অথবা অদ্ভুত Telepathyর তত্ত্ব কেমন দুটা কথায় সর্ব্বাঙ্গ পরিস্ফুট হইয়াছে :—

“এই প্রভাতে রেণুকা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। জল সর্ব্বত্র সমান।”

প্রবন্ধ বড় বাড়িয়া গিয়াছে; পাঠক মনোযোগ সহকারে পড়িলে আরো কত সৌন্দর্য্য অযত্ন সজ্জিত দেখিতে পাইবেন।

অমরবাবু সজীব চিত্রেও সিদ্ধ হস্ত। তাঁহার ছাত্রাবাস, সার লাইব্রেরী, উৎসবের স্বপ্ন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমের মুখে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা প্রাচীনবিন্দু। সুখের গৃহস্থালী প্রভৃতির চিত্রগুলি কেমন প্রাঞ্জল ও জীবন্ত। শত বৎসর পর বঙ্গ সমাজের ইতিহাস লেখক ইহা হইতে আর উৎকৃষ্ট উপাদান অল্পই পাইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, লহরী বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। এই গ্রন্থখানি নিঃশঙ্ক চিত্তে যুবতী কন্যা, ভগিনী কিংবা ভার্য্যার হাতে দেওয়া যায়। লহরীর শিক্ষা, সমাজ শিক্ষার ভিত্তি। দাম্পত্য জীবনের চরমোৎকর্ষ যাহা মনু বলিয়াছেন এখানে তাহা দেখিতে পাই :—

“সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্ন কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥”

বাস্তবিক মিল্টনের ভাষায়ও,

“Harmony to behold in wedded pair
More grateful than harmonious sound to the ear.”

সতীত্বের আদর্শ অতুল। সাবিত্রী যমকে, দময়ন্তী ব্যাধকে, দ্রৌপদী কীচককে [illegible] করিয়াছিলেন। কেমন [illegible]

প্রাণাংশ্চারিত্র্যকবচান্ ধারয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।"

আর নিষ্কামধর্ম্মরূপী বঙ্কু খুড়া? উনি সনাতন পুণ্যের চির সহায়, পাপের [illegible]। সেই বীর ভাষায় "বঙ্কু খুড়া তুমি ছিলে, তুমি আছ, স্বর্গে মর্ত্তে তুমি।"

উপসংহারে অমর বাবুর নিকট আমাদের একটী অনুরোধ আছে। ৩৮ লক্ষ টাকার মালিক দলিলকার হইলে সহজেই চির কবিতায় সাধ করা যায়। আমরা ত খুব কম উপন্যাস দেখিয়াছি যে নায়ক দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও লোক। আশা করি সেই বীর সৌভাগ্যবান কবি তাঁহার সরস সুললিত ভাষায় দরিদ্র কুটীরের একখানি সুখময় চিত্র বঙ্গ সাহিত্যকে উপহার দিবেন। "স্বর্ণলতায়" স্থান আছে সে তত্ত্ব নাই। অমর বাবুর লেখনীর পক্ষে বিচিত্র ঘটনাময় সাহিত্য সহজ সাধ্য হইবে।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

---

* লহরীর শ্রদ্ধেয় সমালোচকের সহিত আমাদের কয়েকটী বিষয়ে মতভেদ আছে। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই স্থানেই প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। বিধাতা যেমন সকল রত্ন তিল তিল সংগত করিয়া তিলোত্তমার দেহ গঠন করিয়াছিলেন—শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয়ের মতে তেমনি নিখিল গুণ-সমবায়ে গ্রন্থকার লহরী উপন্যাস বিরচিত করিয়াছেন। লহরী পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছিলাম তথাপি এই সমালোচনাটী অতিশয় অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয় লহরীর চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর চরিত্র চিত্রাঙ্কনের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন "এই উভয়ে কবি (বঙ্কিমচন্দ্র) সূর্য্যমুখী স্নেহবৃত্তির বিকাশ দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। কিন্তু অমর বাবু লহরীতে সেগুলি মনোবৃত্তির কোমল বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মতে বেশ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।"

সুনিপুণ শিল্পী যেমন প্রকৃতির মনোহর চিত্রশালা হইতে আপনার পছন্দমত এক একটী দৃশ্য বাছিয়া লন এবং সেই দৃশ্যটী চারু তুলিকার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলেন তেমনি সুদক্ষ কবি, মানব-প্রকৃতি হইতে বাছিয়া এক একটী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং তাহারই বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পান। পারিপার্শ্বিক ঘটনা কেবল সেই একটী বৃত্তিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই গৃহীত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি, তাই তিনি সাধারণ লেখকের ন্যায় সকলগুলি বৃত্তি এক চরিত্রে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান নাই। জগতের কোন শ্রেষ্ঠ লেখকই সকলগুলি [illegible] অথবা সকলগুলি মনোবৃত্তি এক চরিত্রে সমাবেশ করিয়া দেখান নাই। দেখাইলেও কৃতকার্য্য হইতেন কিনা সন্দেহ। মানবচরিত্র যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি কবিও চরিত্র চিত্রাঙ্কণে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই, কেহ সীতা, কেহ দ্রৌপদী,

কেহ রাধিকা, কেহ রুক্মিণী, কেহ উমা, কেহ শকুন্তলা, কেহ দেস্‌দিমনা, কেহ মিরাণ্ডা, কেহ লেডি মেক্‌বেথ্, কেহ ওফেলিয়া, কেহ জুলিয়েট, কেহ রোজেলিণ্ড। প্রত্যেক চরিত্রেরই এক একটী বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক চরিত্রেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা দোষ পরিস্ফুট করিয়া তোলাই কবির উদ্দেশ্য। মহাপুরুষদিগের চরিত্রও এক একটী অসামান্য গুণের সমাবেশে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সর্ব্বত্যাগী—হরিশ্চন্দ্র, কেহ ধর্ম্মবীর—যুধিষ্ঠির, কেহ স্থির-প্রতিজ্ঞ—ভীষ্ম, কেহ দাতা—কর্ণ, কেহ সত্যব্রত—রাম, কেহ স্বদেশ-বৎসল—দধীচি, কেহ সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী—নারদ, কেহ ভক্তি-গদগদচিত্ত—প্রহ্লাদ। সকলেই মহাপুরুষ তথাপি এক একটী গুণ এক এক জনের মধ্যে সমধিক পরিস্ফুট।

আবার সুবিখ্যাত লেখক ডাক্তার জন্‌সন্ বলিয়াছেন—চিন্তাশীল প্রতিভাবান লেখক অনেক সময় তাহাদের আদর্শ পুরুষের চরিত্রেও সামান্য দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এরূপ করিবার কারণ এই, তাঁহাদের চিত্রিত আদর্শ পুরুষ যদি কেবল সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দেবতুল্য হয় তাহা হইলে সাধারণ লোক তাহাদের মহত্বের অনুকরণ করিতে সাহস পায় না; নিজের অভাব এবং আদর্শ পুরুষদের পূর্ণতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, লহরী-সমালোচক যে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি দেখাইয়াছেন তাহা ত্রুটি নয়, পরন্তু তাহাই প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয়।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয় লহরী উপন্যাসে যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রন্থকার, "জিওগ্রাফীটা জঙ্গল, হিষ্টরী হাবড়ার হাট, মেথেমেটিক্‌স্ মাথামাটি" লিখিতে পারিয়াছেন দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং পাঠকদিগকে ডাকিয়া Assonance-এর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। কচি শিশুর কণ্ঠনিঃসৃত অর্থহীন অব্যক্ত শব্দও যেমন স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করে তেমনি লহরী-লেখকের অতি অকিঞ্চিৎকর কথাটীও সমালোচক মহাশয়ের প্রাণে অসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছে। তাই "মামলা অপেক্ষা সামলা বেশী" এই কথাটীও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মিল্টন, কালিদাস, টেনিসন প্রভৃতির কবিতা তুলিয়া তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রতি কথায় সম্পাদক মহাশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি রেণুকার স্বপ্ন হইতে Telepathy তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। আমরা লহরী পড়িয়াছি, লহরী উপন্যাসখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উহার ভাষাও অতি সুন্দর; কিন্তু সমালোচক মহাশয় বাছিয়া বাছিয়া যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পাঠকদিগের লহরী পড়িবার বাসনা কতদূর উদ্দীপ্ত হইবে বলিতে পারি না। পরিশেষে তিনি সর্ব্বজন প্রশংসিত "স্বর্ণলতায় ভাব আছে সাহিত্য নাই" বলিয়া অমর বাবুকে একটী নিখুঁত গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনের ভার প্রদান করিয়াছেন। কোন গ্রন্থকারকে এমনভাবে আকাশে তুলিতে আমরা কদাচ দেখি নাই। সমালোচনায় ও বিজ্ঞাপনে পার্থক্য থাকা উচিত। (সম্পাদক)

প্রাণেশচন্দ্র।

(১৬)

দাদা মহাশয়ের ইচ্ছা অন্য কোথাও না যাইয়া কলিকাতা চলিয়া যান। প্রাণেশচন্দ্রের এত শীঘ্র কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা নাই। প্রাণেশচন্দ্র মাতুলালয়ে যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন; এখন শ্রীপুর যাইতে চাহিতেছেন না—মন মাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে।

প্রাণেশচন্দ্র মাকে দেখিয়া যাইবার অভিপ্রায় জানাইলে দাদা মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। প্রাণেশচন্দ্র জীবনের যে একটা বাঁধ বাঁধিয়াছিলেন তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে; দাদা মহাশয় তাহাকে যে ব্রতে, যে পথে চালাইতে চাহিয়াছিলেন সে ব্রতে সে পথে কাঁটা পড়িতে বসিয়াছে। এই অবস্থায় মায়ের মায়ায় পড়িলে প্রাণেশচন্দ্র একবারে হারাইয়া যাইবে ভাবিয়া দাদা মহাশয় বিচলিত হইলেন; আবার তাঁহার কোমল প্রাণে ইহাও উঠিতেছে—প্রাণেশচন্দ্র মাকে দেখিয়া যাইতে চাহিতেছে—তা দেখিয়া যাইবে না?

নৌকা গোয়ালন্দ অভিমুখে চলিল; তাঁহারা গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ যাইবেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত নন্দনপুর প্রাণেশচন্দ্রের জন্মভূমি। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তাঁহারা নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন।

নন্দনপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই ক্ষুদ্র গ্রামে ব্রাহ্মণই অধিক। ইঁহাদের মধ্যে প্রাণেশচন্দ্রের অবস্থাই ভাল; তালুক আছে, খামার আছে; তার মা ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই, মায়েরও এই এক পুত্র ব্যতীত অন্য সন্তান নাই। মা আনন্দময়ী একমাত্র পুত্রের দিকে চাহিয়া সংসার পরিচালন করেন, তাঁহার—সাধ পুত্রকে বিবাহিত করাইয়া—আঁধার ঘরে আলো জ্বালাইবেন। পুত্র বিদ্বান—অনেক কন্যার পিতা আনন্দময়ীর নিকট আসিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের অনেকেরই বিশ্বাস—প্রাণেশচন্দ্র হিন্দুমতে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। তাঁহারা এ কথা আনন্দময়ীকে বলিয়া থাকেন, আনন্দময়ীর বিশ্বাস—পুত্র মায়ের অবাধ্য হইবে না।

প্রাণেশচন্দ্র মায়ের চরণধূলি লইলেন; দাদা মহাশয় আসিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিলেন।

প্রাণেশ। ইনি আমাদের দাদা ম'শায়—যাঁর কথা কত বলেছি।

আনন্দময়ী। দেখ বাবা, বড় ভাল হয়েছে—তোমার দাদামহাশয়কে নিয়ে এসেছ, তিনি মত দিলেই সব হয়ে যায়, বিয়ে ঠিক—মেয়েটী পরমা সুন্দরী, কি বল?

আনন্দময়ী দাদাম'শায়ের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাণেশ। তোমার ঐ তো রোগ—ঘরে পা না দিতেই বিয়ের কথা। দাদা ম'শায় এসেছেন—কি খেতে দিবে তাই আগে দেখো না।

আনন্দময়ী। তুই আজ বাড়ী আস্‌বি তা আমার মনেই বল্‌ছিল; মণি বিড়ালটা তুই যেখানে বসে খেয়ে থাকিস্‌ সেইখানে বার বার ঘু'রে ঘু'রে যেন তোর আসবার কথাই বল্‌ছিল। খাবার—তা দুঃখ কি, বাড়ীতে গাই আছে; ক্ষীর ক'রে রেখেছি। বাবা সন্দেশচন্দ্র—হাত মুখ ধু'য়ে এস।

প্রাণেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ও কি বলছো মা, দাদা ম'শায়ের নাম সন্দেশচন্দ্র নয়—স্বদেশ-চন্দ্র।

আনন্দময়ী। আমাদের অত স্বদেশ টদেশ মনে থাকে না—আচ্ছা বসো বাবা স্বদেশচন্দ্র।

প্রাণেশচন্দ্র দাদামহাশয়কে বলিলেন "তখন স্বদেশ স্বদেশ বলে এত কথা হয় নাই, এত আগে আপনার মা বাপ কি ক'রে আপনার নাম স্বদেশচন্দ্র রাখলেন?" মার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা তুমি একদিকে ঠিকই বলেছ— দাদাম'শায়কে সন্দেশচন্দ্র না বলুক অনেকে "মিঠাদাদা" ব'লে ডাকে।

প্রাণেশচন্দ্রের মা দাদা ম'শায়কে খুব আদর করিয়া খাওয়াইলেন।

জলযোগের পর আহার, আহারের পর গল্প—অনেক রাত্রিতে তাহারা নিদ্রা গেলেন। প্রাণেশচন্দ্রের মা, প্রাণেশের বিবাহের কথায়ই দাদা মহাশয়কে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আনন্দময়ী শয্যায় যাইবার আগে বলিয়া গেলেন "বেস্‌ হয়েছে, তুমি এসেছ—মেয়ের বাপ মেয়েটীকে এই গাঁয়েই আমাদের এক কুটুমবাড়ী নিয়ে এসেছে, প্রাণেশ, দেখ্‌বে, তুমি দেখ্‌বে।

দাদা মহাশয় রাত্রে ভাবিতে লাগিলেন—এ হলো কি? ওদিকে মুক্তি, ঐ উপমা, আবার এই একটী উপস্থিত, প্রাণেশচন্দ্রকে ত্রিভুজের তিন কোণায় দাঁড়ায়ে ত্রিভুবন দেখ্‌তে হবে।

ভোর হইতেই দাদা মহাশয় উঠিয়াছেন। তাঁর যা স্বভাব, উঠিয়াই বাড়ীর চারিদিক্‌ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, কোথায় কোন্‌ ঘর, কোথায় কোন্‌ গাছ, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সব্‌জি বাগান—সব। সব ঘর খড়ের কিন্তু অতি সুন্দর—একখানি ঘরের চালে লাউ গাছ উঠিয়াছে, কচি কচি লাউ

যেন ছোট ছোট শিশুর মত ঘুমাইয়া আছে। এক কোণে একটী খোলা পাতিল চূণ আঁকা চোক লইয়া চাপরাশির মত পাহাড়া দিতেছে। উঠান পরিষ্কার, গোয়াল পরিষ্কার, গাইগুলি নাদুশ নুদুশ; বাছুরগুলি বেশ্। সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়িয়া আছে।

প্রাতে দাদা মহাশয়ও প্রাণেশচন্দ্রকে কন্যা দেখান হইল। কন্যাটী সুন্দরী। নাম—লাবণ্য। এখন প্রাণেশচন্দ্র যাইয়া ভাবুক গিয়ে—মুক্তি—না, উপমা, উপমা—না লাবণ্য, লাবণ্য—না মুক্তি।

তাঁহাদিগকে তিন দিন থাকিতে হইল, চতুর্থ দিনে তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রাণেশচন্দ্রের কলিকাতা যাইতে সাহসে কুলাইতেছিল না। কিন্তু দাদা মহাশয় যে স্থানে কাণ্ডারী, সে স্থানে কূল পাইতেই হইবে; তাঁহারা জাহাজে পদ্মা পার হইলেন। এ সেই জাহাজ, যে জাহাজে উপমার সঙ্গে প্রাণেশচন্দ্রের প্রথম দেখা হইয়াছিল।

জাহাজ গোয়ালন্দ পৌঁছিতে রাত্রি হইল। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, জাহাজ দুর্জ্জয়বেগে ছুটিয়াছে—থাকিয়া থাকিয়া বংশীধ্বনি করিতেছে। উপরের তালায় প্রাণেশচন্দ্রের সম্মুখে উন্নতদেহ দাদা মহাশয় উপবিষ্ট—প্রাণেশচন্দ্র উচ্চ গলায় গাইতে লাগিল—

এস গো ভক্তি-গঙ্গা—
ভগবৎ পদকমল হ'তে, হৃদয়-মরু মাঝারে
রজতশুভ্র পুণ্য হিল্লোল বাহিনি!

জলের উপর গান বড় জমিয়া গেল। গান শেষ করিয়া প্রাণেশ বলিলেন—"এই ভক্তির কথা লইয়াই আনন্দমঠের আরম্ভ।

দাদা ম'শায়। না, সে ভক্তি স্বদেশভক্তি, তোমার এ ভক্তি ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরে ভক্তিই স্বদেশভক্তির মূল। ঐ কথাই তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই।

দাদা মহাশয় বলিলেন—"আবার গাও।" প্রাণেশ আবার গাইল।

দাদা মহাশয়ের চোক হইতে জল পড়িতে লাগিল—তাঁহার মন ডাকিতেছে—ঈশ্বর কোথায় তুমি, ভক্তি কোথায় মা। স্বদেশ! তুমি মাটি না মানুষ, ফুল না ফল, জল না স্থল—তোমার জন্য আমি কি করিলাম—স্মরণ হইল পিতা মাতাকে তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাদের দত্ত স্বদেশচন্দ্র নাম কি সার্থক হইবে।

দাদা ম'শায় প্রাণেশচন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; প্রাণেশচন্দ্র দাদা মহাশয়ের চির আরাধ্য বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জাহাজ গোয়ালন্দ পৌঁছিল। দাদা মহাশয় দুখানি টেলিগ্রাম করিলেন। একখানি ইনমাইলকে অপর খানি ব্রজেন্দ্র বাবুকে৷ রাত্রিতেই তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

দাদা মহাশয় ভোরে ব্রজেন্দ্রবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। চাকর উঠিয়াছে; বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কলে জল আসিয়াছে—জল বাল্তিতে পড়িয়া একটি মিষ্ট স্বর তুলিয়াছে। চাকরটী অন্য বাল্তি কলে রাখিয়া ভরা বাল্তির জল বারেন্দায়, স্নানের কামরায় ঢালিয়া দিতেছে, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেছে। কলতলায় বাল্তিতে জলের শব্দে, জল ঢালার শব্দে, ঝাঁটা দেওয়ার শব্দে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা তাল বাজিয়া যাইতেছে।

দাদা মহাশয় বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন; কেহ উঠে নাই কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কাহাকেও ডাকিলেন না।

মুক্তি অতি ভোরে উঠে। ভোরের বড় তারাটী না দেখিলে তার চলে না; ভোরের বাতাস টুকু না হইলে তার গা ঠাণ্ডা হয় না; উষার আলোক টুকু না হইলে তার প্রাণটা জাগে না; ভোরে ফুলের গন্ধ না শুঁকিলে, বারেন্দায় টাঙ্গান পিঁজরায় 'বউ-কথা-কও' এর ডাকটা না শুনিলে তার ভাল লাগে না। ভোরে না হইলে তার পড়া তৈয়ার হয় না। মুক্তি ভোরে উঠিয়াছে, তেতলার ছাতে বেড়াইতেছিল, টবে টবে দুপাঁচটী গোলাপ ফুটিয়াছে, তার গন্ধ লইতেছিল। নামিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

মুক্তি। দাদা ম'শায় এসেছেন, আমি আপনাকেই মনে কর্‌ছিলেম; কেবল মনে নয়; আপনি যে এসেছেন তা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম; আপনার পা পড়লেই আমরা টের পাই। ব্রজেন্দ্র বাবা আপনার টেলিগ্রাম পান; আপনাদের একি একটা রোগ হলো; গেলেন তা বলে গেলেন না যে।

দাদা ম'শায়। আমি কবেই বা ব'লে যেয়ে থাকি; আমি ব'লে যাইও না, ব'লে আসিও না। এই দেখ্‌ এসেছি, ব'লে এসেছি কি?

মুক্তি। আপনার নিজের বাড়ীতে কে কবে ব'লে এসে থাকে। থাক্‌, প্রাণেশ দাকে নিয়ে এলেন না যে?

দাদা ম'শায়। সে কি মোট, যে নিয়ে আস্‌বো, তার-ত পা আছে।

মুক্তি। পা আছে—পালাবার জন্য। আপনি পদ্মাপার গিয়াছিলেন, প্রাণেশ দার সঙ্গে দেখা হয়েছে? আমার পত্র দিয়েছিলেন?

দাদা ম'শায়। পদ্মাপার যাই নি! এই নে পদ্মাপারের খেঁজুরে গুড়।

দাদা ম'শায় পকেট হইতে গুড় বাহির করিয়া সম্মুখের টেবিলে রাখিলেন।

মুক্তি গুড় ছুঁইল না।

দাদা ম'শায়। এই নে পদ্মাপারের টক্ কুল।

মুক্তি কুল তুলিয়া লইল।

দাদা ম'শায় এ পকেট ও-পকেটে হাত দিতেছেন আর তুলিতেছেন, বলিলেন,—এই নে পদ্মাপারের তেঁতুল কাসন্দি।

মুক্তি কাসন্দির ডেলা হাতে লইল, আঙ্গুলের ডগায় একটু জিবে দিয়া অতি আরামে টক্ করিয়া একটা শব্দ তুলিয়া বলিল—"পকেট হ'তে আপনি প্রাণেশ দাকে বের্ কর্তে পারেন তবে বুঝি আপনার কেমন পকেট।"

দাদা ম'শায়। এপকেটে ওপকেটে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইলি মিলি ঝিলি, আয়—প্রাণেশচন্দ্র, আয় প্রাণেশচন্দ্র, না প্রাণেশচন্দ্র এলো না।"

তিনি একটু চাপিয়া হাসিলেন।

মুক্তি। প্রাণেশ দা এলেন্ না, তাঁর মনটা বুঝি বড্ড ভেঙ্গে গেছে।

দাদা ম'শায়। দীক্ষিত হ'তে না পেরে খুব ভেঙ্গে গেছিল, তবে ডাকাতের হাত হতে মেয়েটীকে রক্ষা ক'রে তার মনে একটা বল এসেছে, ভাল কাজ কর্লেই মনে বল আসে।

মুক্তি ঐ মেয়েটীর কথা তুল্বে বলেই ভাব্ছিলো। উপলক্ষ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাইত—আঃ ডাকাতের হাতে পড়ে মেয়েটীর মনটা যেন কেমন কর্ছিলো। বেঁচে গেছে, প্রাণেশ দা খুব কাজ করেছেন। মেয়েটী দেখ্তে কেমন? বয়স কত?

দাদা ম'শায়। বয়স তোর মত; দেখ্তে—বিনা সাবানে অপ্সরা, বিনা পাউডারে স্বর্গের পৈরী—বিনে আল্তায় স্থল পদ্মের মত।

মুক্তি। আপনার কবিত্ব রাখুন, দেখ্তে কেমন্? লেখা পড়া জানে?

দাদা ম'শায়। বল্ছি খুব সুন্দরী, ওরূপ সুন্দরী আমি কম দেখেছি। লেখা পড়া জানে না। কেবল কি ঐ মেয়েটী দেখেছি, আমরা প্রাণেশদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তার মা এক পাত্রী ঠিক করেছেন, সে মেয়েটীও দেখেছি। তোর চাইতে বয়সে ছোট, ও মেয়েটীও বেস্।

মুক্তি। এরই বা নাম কি, ওরই বা নাম কি।

দাদা ম'শায়। এর নাম লাবণ্য. ওর নাম উপমা।

লাবণ্য উপমা, উপমা লাবণ্য পাঁচ বার মনে মনে উলটী পালটী মুক্তি বলিল "উপমা নামটী তো বেস্। লাবণ্য—তবে প্রাণেশ দার বিয়ে—

হাসি আস্‌তে আস্‌তে মুক্তির মুখ মলিন হয়ে গেল, মুখ মলিন হ'তে হ'তে মুক্তি হেসে ফেল্‌লো।

মুক্তি। প্রাণেশ দাকে পেলে হতো। খুব একটা নেমন্তন্ন আদায় ক'রে ছাড়্‌তো। তা আপনি নিয়েই এলেন না।

দাদা ম'শায় "আয় প্রাণেশচন্দ্র আয় প্রাণেশচন্দ্র" ব'লে ছ'পকেটে হাত দিতে লাগিলেন বলিলেন, "তুই দেখ্‌তো হাত দিয়া।"

মুক্তি কৌতুকের ছলে হাত দিয়া বাহির করিল একটা পাকা কুল—কচ্ করিয়া এক কামর খাইল।

দাদা ম'শায়। দেখ্‌তো ঐ টেবিলটার দেরাজে।

মুক্তি কৌতুকের ছলে তাহাই করিল—একটা নেংটে ইন্দুর বাহির হইয়া পলাইয়া গেল।

দাদা ম'শায়। দেখ্‌তো ঐ বিছানায়।

বিছানা লেপদিয়া ঢাকা ছিল। মুক্তি লেপ তুলিয়া ফেলিল।

হো হো হো—প্রাণেশ দা, তুমি এসেছ, লুকিয়ে ছিলে, দাদা ম'শায় তোমায় লুকিয়ে রেখে এই খেলা খেলেছেন, প্রাণেশ দা তবে তুমি আমাদের কথা সব শুনেছ?

প্রাণেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে চোক কচালিতে কচালিতে উঠিয়া আসিয়া বসিলেন।

দাদা ম'শায়। এই নে তোর প্রাণেশ দা। এনে দিলুম তো।

মুক্তি। আপনার অসাধ্য কিছু নাই।

এই সময়ে ব্রজেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন। প্রাণেশচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপ্রতিভ হইয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন।

দাদা ম'শায় বলিলেন "রেল হইতে নেবেই এখানে আস্‌ছি, আমরা এখন যাই, পরে আস্‌বো"

মুক্তি তার বাবার দিকে চাহিয়া বলিল, "না বাবা যেতে দিও না, এরা এবেলা এখানে খাবেন।" প্রাণেশ দাকে ডাকিয়া বলিল—"যেতে পারিবেন না; এই খানে খাবেন; আপনার কাছে আমার অনেক কাজ আছে; বসুন, আমি আস্‌ছি!"

মুক্তি চলিয়া গেল, দাদা ম'শায় আগেই উঠিয়া গিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও চলিয়া গেলেন। মুক্তি ছাতে একখানি বই হাতে লইয়া পড়িতেছিল, বই আনিয়া বৈঠকখানার টেবিলে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাণেশচন্দ্র বইখানি খুব মনোযোগের সহিত উল্‌টিপাল্‌টি দেখিতে দেখিতে মুক্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩১৩। } দ্বাদশ সংখ্যা।

কালীর ধ্যানের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাংখ্যকার কপিলের মতে মহাপ্রলয়কালে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্রমে স্ব স্ব কারণে লয় হইয়া সমস্ত জগৎ শেষ তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়। এবং প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলিতা হন।

ইহাই কালীর ধ্যানের তমোগুণান্বিতা সংহারিণী মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ভাবার্থ।

আবার যখন মহাপ্রলয়াবসানে পরমপুরুষের সিসৃক্ষা মাত্র অবলম্বন করিয়া আদ্যাপ্রকৃতি "কালী" সৃজনোন্মুখিনী হন, তখন তিনি সত্ত্বগুণান্বিতা জগজ্জননী।

পরমপুরুষ নির্লিপ্ত, তিনি কিছুই করেন না। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিই জগৎ সৃজন করেন। কিন্তু ভৌতিক সৃষ্টিতে যেমন স্ত্রী-পুরুষ সংযোগের প্রয়োজন, বিশ্ব সৃষ্টিতেও তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ আবশ্যক।

সাংখ্যমতে,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরং পুমান্।
বীর্য্যমাধত্তে সা-সূত মহত্তত্বং হিরণ্ময়ং॥"

দৈবশক্তি বশাৎ প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইলে, সেই বিক্ষোভিত-ধর্ম্মিণী প্রকৃতির যোনিতে পরমপুরুষ বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। তৎপর প্রকৃতি হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব সংজ্ঞক সন্তান প্রসব করেন। এই মহত্তত্ত্বই জ্ঞানস্থানীয় "হিরণ্যগর্ভ" এবং শাস্ত্রান্তরের "ব্রহ্মা"।

প্রকৃতির প্রথম উন্মেষে যে মহত্তত্ত্ব নামক সাত্ত্বিকপ্রকাশ আবির্ভূত হয়, তাহাই জগদঙ্কুর বা জগচ্চিত্রের সূক্ষ্ম রেখাপাত।

মনুর মতেও—

"অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।"

পরমপুরুষ বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বাগ্রে জল সৃজন করিয়া তাহাতে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন, সেই প্রক্ষিপ্ত বীর্য্য সহস্র সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হয়, এবং ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়েছেন,—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।"
"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার গর্ভাধানের স্বরূপ, আমি সেই প্রকৃতিতে গর্ভাধান করিয়া থাকি। এবং তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তাহার যোনি (অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া); আমি তাহাদের বীর্য্যাধান কর্ত্তা পিতা স্বরূপ।

তন্ত্রমতেও—আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি (মহাকালী) পরমপুরুষ (মহারুদ্র) হইতে গর্ভগ্রহণ করিয়া, প্রথমে সত্ত্বগুণান্বিত ব্রহ্মাকে প্রসব করেন। দ্বিতীয়ে রজোগুণান্বিত বিষ্ণুকে, এবং তৃতীয়ে তমোগুণান্বিত শিবকে প্রসব করেন।

উল্লিখিত মত সমূহের সাধারণতঃ পার্থক্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব একরূপ।

কালীর ধ্যানেও সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হইতেছে।

"মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।"

জগজ্জননী কালী মহাকালের সহিত বিপরীত রতাশক্তা, অতএব সুখ-প্রসন্ন-বদনা, এবং মুখকমল হাস্যযুক্তা।

এ স্থলে যিনি শবরূপে মহাদেব, তিনিই মহাকাল। এক্ষণ দেখিতে হইতেছে যে, শবরূপ মহাদেবের সহিত বিপরীত রতাশক্তা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং এ রতি সাধারণ রতি নহে। এ রতি কামগন্ধহীন জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা। শবরূপ মহাদেবের সহিত, অর্থাৎ নির্গুণ, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়

পরমপুরুষের সহিত "বিপরীত রতাশক্তা" অর্থাৎ নির্লিপ্ত পরমপুরুষ হইতে বীর্য্য (চিৎপ্রভা) গ্রহণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ বা জ্ঞানস্থানীয় মহত্তত্ত্বাদিকে (ব্রহ্মাদিকে) প্রদান করার জন্য মিলিত হওয়া।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাপ্রকৃতি বিশ্বজননী (জগদম্বা) আর করালবদনা নহেন। বিশ্বপ্রসবিনী তখন "সুখ-প্রসন্নবদনাং" আনন্দোৎফুল্লাননা, "স্মেরানন সরোরুহাং" হাস্যযুক্ত কমলবদনা। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, প্রলয়কালের তমোগুণান্বিতা মহারৌদ্রীভাব আর এ অবস্থায় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি হাস্যময়ী।

বিপরীত রতাশক্তার তাৎপর্য্য এই যে, রত্যর্থ পুরুষের চেষ্টাই স্বাভাবিক, কিন্তু নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষের কোনই চেষ্টা নাই, সুতরাং নিশ্চেষ্ট পুরুষ হইতে বীর্য্য গ্রহণের চেষ্টাই প্রকৃতির পক্ষে "বিপরীত"। সুতরাং প্রকৃতিরূপা জগজ্জননী "কালী" "বিপরীত রতাতুরাং"।

তাৎপর্য্যার্থ (আধ্যাত্মিকভাব) এই যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যখন সত্ত্বগুণ প্রধানা হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হন, তখন তিনি নির্লিপ্ত পরমপুরুষের সহিত মিলিতা হইয়া বিশ্বসৃষ্টির কারণরূপ বীর্য্য (চিৎপ্রভা) গ্রহণ করেন। প্রকৃতির তাৎকালিক ভাব মহাপ্রলয়ের অবস্থার ন্যায় ভয়ানক নহে। তখন সত্ত্বগুণ-প্রধানা প্রকৃতি হাস্যময়ী।

আবার সৃষ্টির পর যখন জগদম্বা রজোগুণান্বিতা বিশ্বপালিনী; তখন তিনি "দিব্যাং" অপরূপ ভুবনমোহিনী অন্নপূর্ণা। তখন তিনি "হাস্যমুখীং" হাস্যোৎফুল্লাননা। তখন জগদম্বা "পীনোন্নত পয়োধরাং" নিখিল জগৎ পরি-পালনোপযোগী পয়ঃপূর্ণ স্তনী, অতএব পীনোন্নত পয়োধরা। যাঁহার বিশাল উরসিজ অনন্ত প্রাণী-জগতের খাদ্যপূর্ণ অক্ষয়-ভাণ্ডার, অনন্তকাল যে পীনোন্নত পয়োধর হইতে প্রস্রবণের ন্যায় নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য পেয় বিনিসৃত হইয়া জগৎ পালন করিতেছে সে পয়োধর প্রকৃতই অক্ষয়ভাণ্ডার। জগজ্জননীর এই রজোগুণাত্মিকা বিশ্বপালিনী মূর্ত্তিই "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা"।

রজোগুণ প্রধানা বিশ্বপালিনী "চতুর্ভুজাং" চারি হস্তবিশিষ্টা। "সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং" বামভাগের অধোর্দ্ধ করদ্বয়ে ছিন্নমুণ্ড ও অসি। "অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ পাণিকাং।" দক্ষিণদিকের অধোর্দ্ধ করদ্বয়ে বর ও অভয়। ইহার আধ্যাত্মিকভাব বা তাৎপর্য্যার্থ এই,—পালনকার্য্য রজোগুণাত্মক; ভীমকান্ত গুণদ্বারাই রাজমহিমার পূর্ণ বিকাশ হয়। সেই জন্যই রজোগুণ প্রধানা

বিশ্বপালিনী "কালী" ভীমকান্ত গুণের চিহ্নস্বরূপ অসিমুণ্ড ও বরাভয় ধারণ করিয়া জগৎ পরিপালন করিতেছেন। দুষ্ট-দমন, শিষ্টপালনই রজোগুণের কার্য্য। যাঁহার সুনিয়মে বিশ্বজগৎ পরিচালিত, তিনি ভীমকান্ত গুণবিশিষ্টা (অসি-মুণ্ড-বরাভয়-করা) না হইলে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে কেন? তাঁহার অখণ্ড নিয়ম রক্ষা না করিলে অসির আঘাতে ছিন্ন মুণ্ড হইতে হইবে। সেই জন্য বামকরদ্বয়ে অসিমুণ্ড ধারণ করিয়া পাপীর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতেছেন। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাণিত অসি হইতে নিষ্কৃতি নাই।

সেই অখণ্ড মহা নিয়মের অধীনে এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত অনন্ত সৌরজগৎ স্ব স্ব কক্ষপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

"যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোপি সূর্য্য স্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাকালে, পুষ্পন্তি তরবো বনে।"

যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য তাপ দান করিতেছে, যাঁহার ভয়ে মেঘগণ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেছে এবং কাননে তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে। সুতরাং জগতের সুনিয়ম রক্ষার জন্য বিশ্বপালিনী কালীর করে কৃপাণ ও ছিন্নমুণ্ডের বিভীষিকা। আবার ভক্তবৎসলা জগজ্জননী তাঁহার সাধু সন্তানগণকে চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) ফল প্রদান ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ করদ্বয়ে বরাভয় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তাই মা কালী "চতুর্ভুজা" অসিমুণ্ড বরাভয়ধারিণী; ভীমকান্ত গুণযুতা।

জগৎপালিনী কালী "শ্যামাং"। শ্যামা স্ত্রী বিশেষা, সুলক্ষণা। অথবা শস্য শ্যামলা। প্রাচীন আর্য্যগণ সকলেই প্রায় শ্যামবর্ণ প্রিয়। সেই জন্য তাঁহাদের প্রসিদ্ধ নরনারীগণ মধ্যে অনেকেই শ্যামবর্ণ। রাম, কৃষ্ণ, ভরত, অর্জ্জুন, ব্যাসদেব, দ্রৌপদী, চন্দ্রাবলী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্যামবর্ণ। আবার অনন্ত আকাশ, অনন্ত সমুদ্র, অনন্ত গিরিশ্রেণী, অনন্ত বনরাজি সমস্তই শ্যামল। তাই আদ্যা প্রকৃতি কালী "শ্যামাং" শ্যামবর্ণা।

কালী "মহামেঘ প্রভাং" নিবিড় নীরদকান্তি।

"শ্বেতপীতাদিকং বর্ণং যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে।"

শ্বেত পীতাদি সমস্ত বর্ণ যেমন কৃষ্ণবর্ণে লয় হয়, তদ্রূপ সর্ব্বভূতই আদ্যা প্রকৃতিরূপা কালীতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্যই শেষতত্ত্বস্বরূপা কালীর বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ (মহামেঘপ্রভা) বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

প্রকৃতিরূপা কালী "দিগম্বরাং" নগ্নাং বিবসনা। যে প্রকৃতির বিরাট দেহ-পরিসরের অন্তরালে অন্তরালে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত অসংখ্য সৌরজগৎ অবস্থিত, সেই প্রকৃতিরূপা কালীর বিশাল দেহ যে বস্ত্রাবরণে আবরিত হইতে পারে, এ কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং অনন্ত শূন্যই তাঁহার বসনস্বরূপ। এই জন্যই কালী "দিগম্বরী"।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে,—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, কিন্তু সৃষ্টিকালে বৈষম্য ঘটে। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থায় যখন যে গুণের প্রাধান্য হয়, তখন তিনি তদ্‌গুণান্বিতা বলিয়া অভিহিতা হন, এবং ভক্ত সাধকগণ তখন তাঁহার তদ্রূপ স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা কালীরূপে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয় তুল্যভাবে প্রকাশমান। সেই জন্য কালীর ধ্যানে পরস্পর বিরোধী গুণত্রয়ের বর্ণিত হইয়াছে।

"সৈবকালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবাত্মজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী॥"
(চণ্ডী)।

সেই নিত্যরূপা মহাকালী মহাপ্রলয়কালে মহামারী স্বরূপে মহত্ত্বাদিকে গ্রাস করেন (আত্মদেহে লয় করেন) এবং সৃষ্টির সময় ভূতসমূহকে সৃজন করেন, আবার স্থিতিকালে তিনিই সর্ব্বভূতকে পালন করেন। অপরঞ্চ,—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টি রূপাত্বং স্থিতিরূপায় পালনে,
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।" (চণ্ডী)

সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালন সময়ে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়-কালে তুমিই সংহাররূপা।

এক্ষণ বুঝিতে হইবে, আদ্যাপ্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; অতএব প্রকৃতিরূপা কালীর ধ্যানে সেই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিগুণের প্রতিচিত্রই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকিলেও মূলে অসামঞ্জস্য নাই। অর্থাৎ "করালবদনার সহিত হসন্মুখীর, বা "ঘোর দংষ্ট্রার" সহিত "স্মেরানন সরোরুহার" কোন বিসদৃশ ভাব নাই। অথবা "মহারৌদ্রীর" সহিত "দিব্যার" কোন অনৈক্য নাই। যিনি ত্রিগুণময়ী; প্রকৃতিরূপা, সেই প্রকৃতিরূপা কালীর ধ্যানে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের (ভাবস্বরূপ) বর্ণনা থাকাই স্বাভাবিক।

কালীর ধ্যানের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, পরমাপ্রকৃতিরূপা কালী ত্রিগুণময়ী। অতএব যখন তিনি সত্ত্বগুণপ্রধানা, তখন তিনি "শবরূপ মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা, মহাকালেনচ সমং বিপরীত রতাতুরাং, সুখ-প্রসন্নবদনাং, স্মেরানন সরোরুহাং।"

অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির উপাদান স্বরূপ চিৎপ্রভা গ্রহণার্থ নিষ্ক্রিয় পরমপুরুষের সহিত সঙ্গতা, অতএব সুখ প্রসন্নবদনা, প্রফুল্ল কমলাননী, বিশ্বেশ্বর-হৃদয়বাসিনী।

আবার যখন মা আমার রজোগুণপ্রধানা বিশ্বপালিনী, তখন তিনি,—

"দিব্যাং, শ্যামাং, পীনোন্নত পয়োধরাং, সদ্য চ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং, অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ পাণিকাং, চসম্মুখীং।"

অর্থাৎ সর্ব্ব সুলক্ষণা, পরম রূপবতী, পূর্ণযৌবনা, ভীমকান্তগুণযুতা, সদানন্দময়ী প্রফুল্লাননা।

আবার যখন মা আমার তমোগুণ প্রধানা প্রলয়ঙ্করী, তখন তিনি "করাল বদনাং, ঘোরাং, মুক্তকেশীং, মুণ্ডমালাবিভূষিতাং, মহামেঘপ্রভাং, কণ্ঠাবশক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং, কর্ণাবতংশতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং, ঘোর দংষ্ট্রাং, শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং, সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং, ঘোররাবাং, মহারৌদ্রীং, শ্মশানালয়বাসিনীং।"

অর্থাৎ বিশ্ববিনাশিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর ভক্তরত্ন।

ঈশা খার চট্টগ্রাম অধিকার।

দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলী বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভৌমিক। তাঁহার পরিচয় আর পাঠকগণকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। এক সময়ে তাঁহার বীরত্ব প্রতাপে বঙ্গভূমি মুহুর্মুহু কম্পিত হইত। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সেখ ইসলাম খাঁকে পরাস্ত করিয়া ঈশা খাঁ পূর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্র অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বঙ্গদেশের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বঙ্গের নানাস্থানে চতুর্দ্দশটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অনেকগুলি দুর্দ্দান্ত সৈন্য ও বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই

উত্তরে ঘোড়াঘাট ও আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এক এক জন শাসনকর্ত্তাও নিযুক্ত করিলেন। তখনও দ্বাদশভৌমিকের পদ সৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গের অন্যান্য রাজগণ কেহ বা সন্ধিসূত্রে কেহ বা ঈশা খাঁর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইলেন। তখন ঈশা খাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায় তেমন ব্যক্তি কেহ বঙ্গদেশে ছিল না। ত্রিপুরেশ্বরও ঈশা খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

ঈশা খাঁর এরূপ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও স্বাধীনতার বার্ত্তা অচিরেই দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট অবিলম্বে তাঁহার সুদক্ষ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সহ ঈশা খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ সসৈন্যে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত আসিলে পর ঈশা খাঁ অগ্রসর হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল। তিন দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ, বহু সৈন্য হতাহত হওয়ায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া রাজধানী খিজিরপুরের দিকে পলায়ন করিলেন। সাহাবাজ খাঁও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ খিজিরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়দলে আবার যুদ্ধ বাঁধিল, এবারও ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ সপরিবারে চট্টগ্রামের দিকে পলায়ন করিলেন। খিজিরপুর রাজধানী সাহাবাজ খাঁর হস্তগত হইল। ঈশা খাঁর ধনরত্নাদি দিল্লীতে প্রেরিত হইল।

ঈশা খাঁ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে পর তথাকার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধি, ঈশা খাঁর ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ঈশা খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে আরাকান-রাজ তাঁহার বিপক্ষ হইলেন এবং সৈন্যসামন্ত সহ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। নির্ভীক হৃদয় বীরবর ঈশা খাঁ তাহাতে অসম্মত হইলে আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঈশা খাঁ এক পর্ব্বতশৃঙ্গে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরাকানপতির প্রেরিত সৈন্যগণ প্রত্যহ ঈশা খাঁর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঈশা খাঁ কিন্তু অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় আত্মরক্ষায় তৎপর। সপ্তাহকাল পরে ঈশা খাঁর দলের আহারীয় সামগ্রী প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলে ঈশা খাঁ তদীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যূষে সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এমনি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিপক্ষকে আক্রমণ করিল যে বিপক্ষগণ অল্পক্ষণ মাত্র যুদ্ধ করিয়াই সবেগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

ঈশা খাঁর সৈন্যগণ তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া বহু পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইল। আরাকানরাজ ইহাতে আরও উত্তেজিত হইয়া সত্বরেই অগণিত সৈন্যসহ স্বয়ং আসিয়া ঈশা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁও অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই এমনি প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, অবিশ্রান্ত দুই দিন যুদ্ধ করিবার পর আরাকানপতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, তাঁহার অনেক সৈন্য হতাহত হইল। নিরুপায় দেখিয়া আরাকানরাজ ঈশা খাঁকে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সরকার চাটগাঁ, মালগাঁ, নওগাঁ, দিউগাঁ, সেকপুর প্রভৃতি পরগণা প্রদান করিয়া এবং সর্ব্ববিষয়ে ঈশা খাঁর সহায়তা করিবেন অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপন করিলেন। ঈশা খাঁ চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া অনেক দুর্দ্দান্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং আরাকানরাজের নিকট হইতে আরও অনেকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া পুনরায় রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত বঙ্গদেশাভিমুখে গোপনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁকে পরাস্ত করিয়া রণজয় সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছেন। দিল্লী হইতে দ্বিতীয় আদেশ না আইসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বঙ্গদেশেই অবস্থান করিতে হইবে। প্রবল পরাক্রান্ত ঈশা খাঁর রাজধানী হস্তগত হইয়াছে; সুতরাং আমোদ আহ্লাদের সীমা নাই। দিল্লীশ্বরের কর্ত্তব্য পরায়ণ সৈন্যসামন্তগণ আজ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া শুধু আমোদ প্রমোদেই গা ঢালিয়া দিয়াছেন। এদিকে সুচতুর ঈশা খাঁ সুযোগ পাইয়া অকস্মাৎ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় সসৈন্যে আসিয়া সাহাবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। এইবার দিল্লীশ্বরের সুদক্ষ সেনাপতি অপ্রস্তুত ও অসতর্ক থাকা বিধায় স্বীয় পদগৌরব রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই হত হইল এবং নিজেও আহত হইয়া প্রবলবেগে অশ্বচালনা করতঃ পলায়ণপর হইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অনেক যুদ্ধসামগ্রী ঈশা খাঁর হস্তগত হইল। ঈশা খাঁ চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত পুনরায় পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে সেই ভগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ সোনারগাঁয়ে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, প্রবল পরাক্রমে, স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

শনৈশ্চর।

বিশ্বরাজ্যের বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিকৌশল নিবিষ্টচিত্তে দর্শন করিলে বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হয়; ভগবদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। প্রাণী-জগতের কথাই বল আর জড়রাজ্যের কথাই বল, যে বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করা যায় সেই বিষয়েই বিশ্বনিয়ন্তার অপার কৌশল ও মহানুউদ্দেশ্য পরিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে সামান্য অংশের তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই তাহাতেই অভাবনীয় নিগূঢ় রহস্য দেখিতে পাই।

বিজ্ঞান, ভগবানের বিচিত্র চিত্রশালার সুশোভন কক্ষগুলি একটী একটী করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। কত অচিন্তনীয় তথ্য, কত দুজ্ঞের্য় রহস্য দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। নিত্য নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া ভগবানের অপার কৌশল জগতে ঘোষণা করিতেছে।

পরিষ্কার অন্ধকার রজনীতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, মানবমণ্ডলী এই জ্যোতিষ্কসমূহ দেখিয়া আসিতেছিল কিন্তু কেহ তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্ত আকাশের অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদি যদিও আদিম মানব অধিবাসিগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল তথাপি তাহারা ঐ সকল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের অত্যাশ্চর্য্য তথ্য অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। সুনীল অনন্ত আকাশের পর ঐ যে জ্বলন্ত অক্ষরগুলি লিখিত রহিয়াছে উহাদের ভিতর যে কি অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্য পরিব্যক্ত আছে তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত কেহ পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও যে সৃষ্টিরহস্যের বহুজ্ঞাতব্য তথ্য অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা বলেন— "আমরা এইমাত্র জানিয়াছি যে আমরা কিছুই জানি নাই।"

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বৃহস্পতির কথা বলিয়াছি, এই প্রবন্ধে তৎপরবর্ত্তী গ্রহ শনৈশ্চরের কথা বলিব। শুধু চক্ষুতে সকল গ্রহকেই প্রায় একরূপ দেখায়, কেবল ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য। কিন্তু উহাদের আকৃতিগত পার্থক্য ও কম বিচিত্র নয়। আজ সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ, অত্যাশ্চর্য্য গ্রহটীর সম্বন্ধে কিছু বলিব। শনির মত এমন অদ্ভুত এবং কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ আর দ্বিতীয় নাই।

শনি নামটী হিন্দুর নিকট সুপরিচিত। শনির নামটী শুনিলে হিন্দুমাত্রই কিছু বিচলিত হইয়া থাকেন। যত দোষ এই শনি বেচারির ঘাড়ে। আমাদের

পুরাণেতিহাসে শনি-দৃষ্টি সম্বন্ধে অতি ভীষণ কাহিনী সকল লিখিত আছে। শনি কত জনকে কত লাঞ্ছনাই না করিয়াছে! শৈশবে শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান শুনিয়া নীরবে কত অশ্রুপাত করিয়াছি। শনির কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া পরম-সাধু শ্রীবৎস কি নিদারুণ কষ্ট, কি কঠোর মর্ম্মপীড়াই না ভোগ করিয়াছিলেন। এমন নির্য্যাতন কি কেহ কখন ভোগ করিয়াছে? শনিই নাকি যত অমঙ্গলের নিদান। নূতন পঞ্জিকায় যে বৎসর শনি রাজা হইয়াছেন প্রকাশিত হয় সে বৎসর হিন্দুগণ কত আশঙ্কা, কত উদ্বেগ, কত দুশ্চিন্তা মনে স্থান দিয়া থাকেন। প্রতিমুহূর্ত্তে অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহারা ম্রিয়মান হন। শনির এই নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কথা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইউরোপেও শনির অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে।

খালি চক্ষুতে কোন গ্রহেরই আকৃতিগত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। দূরবীক্ষণ ব্যতীত শনির অসাধারণ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। শনিকে খালি চক্ষুতে দেখিলে একটী প্রথমশ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হয়। প্রাচীন জ্যোতি-র্ব্বিদগণ শনির অত্যদ্ভুদ্ দেহটী দেখিতে না পারাতে তাঁহারা উহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের পরিচয় পান নাই। আকৃতিগত বৈচিত্র্যে শনি সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ।

গেলিলিওই সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণদ্বারা শনিগ্রহটী পর্য্যবেক্ষণ করেন। গেলিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী শনিরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, শনিকে খালি চক্ষুতে একটী উজ্জ্বল পিণ্ডের ন্যায় দেখা যায় উহা কেবল একটী পিণ্ড নহে। গেলিলিও দেখিলেন শনির দুই পার্শ্বে দুইটী পিণ্ড এবং মধ্যস্থলে আর একটী সুবৃহৎ পিণ্ড। গেলিলিও এই অসীম রহস্যপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইহার কথা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর তিনি আবার দূরবীক্ষণ দ্বারা শনির দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসিলেন। তখন দেখিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া যাইতেছে। এই অভিনব ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। আবার কয়েকদিন পর তিনি দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিতে বসিলেন। সেই দিন তিনি দেখিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ড দুইটী একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেই নূতন কাণ্ড দেখিয়া গেলিলিও অবাক্ হইলেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হায়! এ কি হইল! পিণ্ড

দুইটী কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমি যে নূতন দুইটী পিণ্ড আবিষ্কারের কথা সকলের নিকট প্রচার করিয়াছি এখন উহাদিগকে দেখাইতে না পারিলে লোকে যে মিথ্যাবাদী বলিবে। এই বিপদের উপায় কি?" তিনি এই চিন্তায় অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। গেলিলিও মনে ভাবিতে লাগিলেন—"Has saturn devoured his children?" শনি কি তাহার আপন সন্তানকে উদরস্থ করিয়াছে!

অধ্যবসায়ী পণ্ডিত গেলিলিও এই অভাবনীয় ব্যাপরের কারণ নির্দ্দেশের জন্য অতি নিবিষ্টচিত্তে শনিকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পর সেই দুই পিণ্ড আবার দুই পার্শ্বে দেখা দিল। গেলিলিও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

গেলিলিওই সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাই তিনি অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। গেলিলিওই সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-কেতু দর্শন করিয়াছিলেন; তিনিই চন্দ্রের পাহাড় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শুক্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধির কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিই বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই গেলিলিওই সর্ব্বপ্রথম শনির রমণীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। কিন্তু তিনি শনির অবয়বের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গেলিলিও যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি শনিকে কেন এরূপ দেখিয়াছিলেন এবং উহার দেহগঠন কিরূপ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। না পারিবার কারণ এই যে, তিনি যে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি সাধারণ ছিল, তদ্রূপ নিকৃষ্ট দূরবীক্ষণ আজকাল কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতই ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাঁহার যন্ত্রদ্বারা বহু দূরবর্ত্তী শনিকে তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

গেলিলিওর মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পর এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত (Huyghen) শনির যথার্থ আকৃতির বিবরণ বাহির করেন। শনি একটী প্রকাণ্ড গোল পিণ্ড। একটী বিশাল বলয় ঐ পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উকিলের শাম্‌লা পরিহিত মস্তকটী যেমন দেখায় শনির চেহারাটীও প্রায় তদ্রূপ। বাস্তবিক বিপ্লবকারী শনি এবং উকিলের সশাম্‌লা মস্তক এই উভয়ের মধ্যে বড়ই সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা আমি বলিতে অসমর্থ।

শনিদেহে গেলিলিও কেন তিনটী গোলাকার পিণ্ড দেখিয়াছিলেন তাহাই এখন বলিতেছি। যদি একটী লোক শাম্‌লা পড়িয়া দাঁড়ায় আর আমরা খুব দুর হইতে তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখি, তাহা হইলে মাথাখানে গোল মস্তকটী বৃহৎ পিণ্ডের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইবে; আর শাম্‌লার বর্দ্ধিত বাদামী দুইপ্রান্ত ও দুইটী ক্ষুদ্র পিণ্ডের ন্যায় বোধ হইবে। গেলিলিও বহুদুরস্থিত শনির বলয়টী নিকৃষ্ট দুরবীক্ষণদ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। তাই দুই প্রান্তকে পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি পিণ্ড বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আবার যদি শাম্‌লা পরিহিত মস্তকে একটী লোক সম্মুখ দিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দুই পার্শ্বের বর্দ্ধিত অংশ দুইটী দুব হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে না। গেলিলিও যখন দেখিয়াছিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছে তখন শনি ঘুরিয়া গিয়াছিল। 'হিউগেন'ই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন একটী বিশাল বলয় শনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; সেই বলয়টী দেখিতে শাম্‌লার মত।

এই সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপার প্রচারিত হইবার পর বৈজ্ঞানিক জগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই দুরবীক্ষণ দ্বারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে আবিষ্কৃত হইল বাস্তবিকই একটী বলয় শনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

শনি এবং তাহার বলয়টী সাধারণ দুরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন একটা উজ্জ্বল বলের ন্যায় কোন পিণ্ডের মধ্যদিয়া একটী উজ্জ্বল শলাকা দুইপ্রান্তে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সার উইলিয়ম হর্শেল দশ বৎসরকাল কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, শনির বলয় একটী নহে, দুইটী। বাহিরের বলয়টীর ভিতর আর একটী উজ্জ্বল বলয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বাহিরের বড় বলয়টী ভিতরের বলয় হইতে একটী কাল রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই সকল ব্যাপারও সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

ইহার কিছু পরে আবার আর একজন জ্যোতির্ব্বিত পণ্ডিত (Proff Bond) আবিষ্কার করিলেন পুর্ব্বোক্ত বলয় দুইটীর ভিতর আরও একটী বলয় আছে। এই তৃতীয় বলয়টীও অভ্রান্তরূপে স্থিরীকৃত হইল। ইহার পরও আবার অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বলিতেছেন ঐ বলয়গুলির ভিতর আরও অনেকগুলি বলয় আছে। এই সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পেঁয়াজের খোসার মত শনির বলয় হইতে কেবল বলয়ই বাহির হইবে। এই তো গেল বলয়ের সংখ্যার কথা এখন বলয় জিনিসটা কি বুঝিতে হইবে।

বলয়গুলি সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, উহারা কঠিন পদার্থও নয় এবং তরল পদার্থও নয়—এই দুইএর মধ্য স্থানীয়। শনির বলয় এবং শনি স্বয়ং এই উভয়ই সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়; কাহারও নিজের আলোক নাই। বলয়গুলির উপর শনির গোল পিণ্ডের ছায়া পতিত হয়। এবং বলয়ের ছায়াও শনির উপর পতিত হয়। আরও বিস্ময়ের কথা ঐ বলয়গুলি শনিকে কেবল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা নয়; বলয়গুলি নিশ্চল নহে। উহাদেরও গতি আছে। বলয়গুলি অবিরাম ঘুরিতেছে আবার শনিও ঘুরিতেছে।

বাহিরের বলয়টী	প্রতি	সেকেণ্ডে	১০	মাইল	বেগে	ঘুরে
মধ্যের বলয়টী	„	„	১১	„	„	„
ভিতরের তৃতীয় বলয়টী		„	১৩	„	„	„
শনি গ্রহ	„	„	৬	„	„	„

এই অসামান্য রহস্যপূর্ণ গ্রহটীর আকার ও গতির বিষয় একবার কল্পনা করিয়া মানসনেত্রে দর্শন করিলে বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিকৌশল কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা এবং সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীন আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনির আকৃতিগত অভাবনীয় বৈচিত্র্যের কথা অবগত ছিলেন না। কারণ তখন দূরবীক্ষণ ছিল না। কিন্তু খালি চক্ষুতেই তাঁহারা ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরস্থিত জ্যোতিষ্ককে চিনিয়াছিলেন। শনিকে দেখা এবং গ্রহ বলিয়া প্রথমে স্থির করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অধ্যবসায় সহকারে বহুবর্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনির পরিচয় পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ শনি খুব উজ্জ্বল গ্রহ নহে। বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি শনি অপেক্ষা অনেকটা বড় দেখায়। আবার উজ্জ্বলতায় বুধ ও মঙ্গল শনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ শনির গতি অতি মৃদু। শনৈঃ শনৈঃ গমন করে বলিয়াই উহার নাম শনৈশ্চর হইয়াছে। নামটীতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীনকালের আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহার গতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নক্ষত্র হইতে গ্রহকে চিনিয়া লইবার একটী কৌশল এই, গ্রহ দ্রুতগামী; নক্ষত্র ধীরগতি। কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রহকে অতিক্রম করিয়া যখন কোন জ্যোতিষ্ক তাড়াতাড়ি চলিয়া যায় তখন তাহাকে আমরা গ্রহ বলিয়া চিনিতে পারি।

শনি প্রতি সেকেণ্ডে ছয় মাইল মাত্র গমন করে। পৃথিবীর গতি ইহার

তিনগুণ অধিক সুতরাং শনিকে পূর্ব্বোক্তরূপে গতি দেখিয়া চিনিয়া লওয়া কিছু কষ্টসাধ্য।

শনি ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে একবার আপন মেরুদণ্ডের উপর একপাক ঘুরিয়া থাকে। অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে শনির এক দিন।

শনির ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ⅛ অংশ মাত্র। পৃথিবীতে যে জিনিসটীর ওজন ১ মণ হইবে শনিতে সেই জিনিসের ওজন ৫ সের মাত্র হইবে। সম পরিমাণ জল অপেক্ষাও শনি ওজনে লঘু। শনিকে যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যাইত তাহা হইলে উহা ভাসিয়া থাকিত। কিন্তু শনিকে বক্ষে ধারণ করিতে পারে এমন বৃহৎ সমুদ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না জানা যায় নাই। পৃথিবী অপেক্ষা ওজনে শনি মাত্র ৯০ গুণ অধিক ভারি। কিন্তু শনি পৃথিবী অপেক্ষা আকারে (Volume) ৭০০ শত গুণ অধিক। শনির ঘনত্ব অপর সকল পরিচিত গ্রহের ঘনত্ব (Density) অপেক্ষা কম। শনি পৃথিবী অপেক্ষা আকৃতিতে ৭০০ গুণ বড় হইলেও ওজনে মাত্র ৯০ গুণ অধিক। সুতরাং পৃথিবীর উপাদান অপেক্ষা শনির উপাদন যে লঘু তৎবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই। তাই অনেকে অনুমান করেন যে শনির উপাদান কোন কঠিন পদার্থ নহে। আবার জল অপেক্ষাও শনি ওজনে লঘু।

শনির চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। "In fact for any thing which is certainly known, Saturn may have no solid globe at all; for nothing fixed has ever been recognised in Saturn."——Proctor.

স্তরে স্তরে মেঘ শনির দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক স্তর তিরোহিত হইলে আর এক স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় বৃহস্পতির ন্যায় শনিও উত্তপ্ত রহিয়াছে এবং স্বীয় দেহ হইতে তাপ বিকীরণ করে। সেই তাপে জল বাষ্প হইয়া মেঘ হয়। মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। বৃষ্টিধারা পতিত হইতে না হইতেই আবার বাষ্প হইয়া পড়ে।

আমরা বলিয়াছি পৃথিবী ব্যতীত মঙ্গল ও বৃহস্পতির চন্দ্র আছে। পৃথিবীর এক চন্দ্র, মঙ্গলের দুই চন্দ্র, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, কিন্তু শনির আটটী চন্দ্র। ভগবান সকল বিষয়েই শনিকে অধিক সম্পদশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ যত দোষ সব তাহার স্কন্ধে চাপায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

নবযুগ।

(৩)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ শনৈঃ শনৈঃ সম্মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৈদিক যুগের অবসানকালে হিন্দুস্থানে অতি ভয়ানক বৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা মানুষের যে ঈশ্বরদত্ত সাধারণ স্বত্ব তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। আত্মকলহে হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা শিক্ষার অভাবে নীচ পশুর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সাম্যের অবতার মহাত্মা শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সাম্যনীতি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ মিলনের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম যদি ভারতবর্ষে স্থায়ী হইত তাহা হইলে এ দেশে সাম্য ও ঐক্য চির প্রতিষ্ঠিত হইত। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সম্রাটদিগের অধীনে একচ্ছত্র প্রায় হইয়া একবার দেখাইয়াছিল, আপনার বীর্য্য ও প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ সংপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। যেটুকু সম্মিলন জন্মিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না। শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামীকর্ত্তৃক বৌদ্ধ নিয়মনদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই।"

মুসলমান শাসনকালেও ভারতবর্ষ স্বীয় গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর মিলনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ একচ্ছত্র হইয়াছে। ইংরেজের অধীন হওয়াতে কিরূপে উত্তর উত্তর ঐ সম্মিলন-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভারত-রাজলক্ষ্মী যে ইচ্ছা করিয়া ইংরেজকে ডাকিয়া আনিয়া স্বীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ইহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা রহিয়াছে। ভারতবাসী একদিন মহাজাতিতে পরিণত হইবে, ভগবান কৌশলে তাহারই উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ইংরেজ যখন ভারতবর্ষের রাজা হইয়া বসিল তখন এ দেশবাসী মাত্রই অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। আত্মকলহ-বিষে এ দেশের লোক জর্জ্জরিত হইয়া

কোথা শান্তি, কোথা শান্তি বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ইংরেজ সকলকে ডাকিয়া ঘোষণা করিল "আমরা এ দেশে শান্তি স্থাপন করিব, সাম্য প্রতিষ্ঠা করিব, সকলকে সমান অধিকার প্রদান করিব, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না। ইংরেজের সুমধুর আশ্বাস-বচন সকলের হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিল—সকলেই মুগ্ধ হইল। ইংরেজ আরও বলিল, আমরা রাজত্ব করিতে আসি নাই, আমরা তোমাদের জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজের উদারতা এবং সৌজন্য দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। বাস্তবিক ইংরেজ যে তাহার সাধু-সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবে না, উহা যে কেবল ভান, কেবল ছলনা, Mere political hypocrisy তাহা আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিতে পারি নাই। বোধ হয় তৎকালীন সহৃদয় উদারচেতা ইংরেজগণও এরূপ জঘন্য প্রতারণার ভাব অন্তরে পোষণ করিতেন না। ব্রিটিশরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজ এত নীচ ছিল না, ইংরেজ তখনও চরিত্রের মহত্ত্ব হারায় নাই!

মেকলে বলিয়াছিলেন যে, যে দিন ইংরেজ ভারতবাসীকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে সেই দিনই ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটী স্মরণীয় দিন হইবে। বাস্তবিক ইংরেজের মহানুভবতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহ সন্দেহ করে নাই। ইংরেজ স্বাধীনতা প্রিয়, ইংরেজ উদার, ইংরেজের অধীন হইয়া ভারতবাসী একদিন উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইবে এই আশায় সকলেই মাতোয়ারা হইয়াছিল। এই ইংরেজ আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের দাসত্বদশা মোচন করিবার জন্য অজস্র অর্থ বর্ষণ করিয়াছিল। এই ইংরেজ স্বাধীনতার জন্য আপনার দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী কি কঠোর, কি ভীষণ সংগ্রামেই না মত্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য এই ইংরেজ আপন ভাইয়ের রক্তে জন্মভূমিকে রঞ্জিত করিয়াছিল। আপন রাজাকে আক্রমণ করিয়া ইংরেজ তাহার নিকট হইতে স্বায়ত্বশাসন আদায় করিয়াছিল। প্রজাস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া এই ইংরেজ, রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। আজন্ম পরাধীন ব্যক্তিও এই ইংরেজের দেশে পদার্পণ করিলে স্বর্গীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাই, ইংরেজের অধীন হইয়া এ দেশবাসী উল্লাসে অধীর হইয়াছিল। হায়! কত আশাই আমরা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন দেখিতেছি সবই অলীক স্বপ্ন, অসার মায়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা। হায়! আমরা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম।

ইংরেজ আমাদিগকে প্রতারিত করিবে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ইংরেজ বলিয়াছিল তাহারা প্রজার প্রতিভূ মাত্র। আমরা দেশ শাসনে অসমর্থ তাই তাহারা রাজভার গ্রহণ করিয়াছে। যখন আমরা উপযুক্ত হইব, ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিব তখনই এই নাবালকের সম্পত্তি তাহারা ফিরাইয়া দিবে। তখন ইংরেজের কোন দুরভিসন্ধি ছিল তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু শক্তির এমনই মহিমা যে মানুষ একবার শক্তি নিজ হস্তে প্রাপ্ত হইলে তাহা আর পরিত্যাগ করিতে চায় না।

ইংরেজ যখন দেখিল ভারতবাসী তাহাদের শাসনাধীন হইয়া দিন দিনই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাহারা তেমন ব্যাকুল এবং সচেষ্ট নয়, তখনই তাহারা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইল, দায়িত্ব চির-বিসর্জ্জন দিল, নীতির বন্ধন ছিন্ন করিল, ধর্ম্ম পদদলিত করিতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজের প্রাণে পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে চির পরাধীন এবং দাসের অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিবার বাসনা জাগে নাই। আমাদিগের দায়িত্ব-হীনতা, ঔদাসীন্য এবং আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাসই ইংরাজের হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষার অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

অতুল বিভবশালী নাবালকের অভিভাবক হইয়া আশাতীত সুযোগ প্রাপ্ত হইলে সাধু ব্যক্তিরও যেমন সময় সময় মতি-ভ্রম হয় এবং দুর্লোভ বশতঃ তিনি অভিভাবকের দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে যত্নশীল হন, তেমনি ইংরেজও সুযোগ পাইয়া ভারতবর্ষে বিরাট সাম্রাজ্য চির প্রতিষ্ঠিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রাণে স্থান দিয়াছিল। যখন আশা জাগিল তখন সফলতার উপায় চিন্তাও আরম্ভ হইল।

ইংরেজ দেখিল ভারতবাসীকে মোহে অভিভূত করিয়া রাখিতে না পারিলে তার কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। যাহাতে আমাদের হৃদয়ে আর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য অঙ্কুরিত হইতে না পারে ইংরেজ সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। সহজেই তাহারা আমাদিগকে মোহে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল। কয়েকজন মহাত্মা ঐতিহাসিকের উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন— ভারতবর্ষ চিরদিনই অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল। সুশাসন এবং সুখ সমৃদ্ধি ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে কোনদিন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কেবল অবিমিশ্র অত্যাচার উৎপীড়ন এবং অশান্তির কাহিনীতে

পূর্ণ। ঐ সকল সত্যের অবমাননাকারী প্রতারকদিগের ইতিহাস পাঠ করিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতে লাগিল বাস্তবিকই ভারতবর্ষ চিরদিন অরাজকতার আবাসভূমি ছিল; ইংরেজই নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ করিয়া এদেশে প্রথম শান্তি স্থাপন করিয়াছে। ঐ সকল অনৃতভাষী ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ শিখিল এদেশবাসী চিরদিন দুর্ব্বল, চিরদিন কাপুরুষ, চিরদিন পরপদতলে লুণ্ঠিত। ভারতবাসী কোন দিন দেশ শাসনরূপ গুরুভার বহন করিতে সমর্থ ছিল না।

ইংরেজের কথা বিশ্বাস করিয়া আমরা আত্মমর্য্যাদা, এবং আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছি। ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে আমরা চির পরাধীন ছিলাম এবং রাজ্য শাসন করিতে আমরা চিরকাল অপারগ। বহু বৎসরের চেষ্টায় ইংরেজ সফল মনোরথ হইয়াছে,—দিন দিন ভারতবাসীর হৃদয়ে একটা মিথ্যা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আর ভারতবাসীর গতি নাই। আবার ভারতবর্ষে অরাজকতা আসিবে, এদেশের লোক মারামারী কাটাকাটি করিয়া একবারে সবংশে লোপ পাইয়া যাইবে। ইংরেজ কি উদার, ইংরেজ কি দয়ালু,—কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। কি ভীষণ মোহ, কি দারুণ মায়া, কি সম্মোহন ইন্দ্রজাল মন্ত্র!

মোহপাশ ছিন্ন হয় না, মায়া কাটে না। যখনই একটু চৈতন্য হয়, লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখনই 'মায়াবী' মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করিয়া উদ্বুদ্ধ সংজ্ঞা ও শক্তিকে অপহৃত করিয়া লয়।

ভাম্পায়ার বাদুর যেমন আপন পক্ষপুট ব্যজনে আক্রান্ত প্রাণীকে হৃতচৈতন্য করিয়া মহোল্লাসে তাহার শোণিত পান করে তেমনি বণিক ইংরেজ ভারতের শোণিতে স্বীয় দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে। আমরা দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। আমাদের কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে। সোনার ভারত এখন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজ কৌশলে আমাদিগকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। আমরা ইংরেজকে সন্দেহ করি নাই তাই আত্মরক্ষার প্রয়াস কেউ করে নাই।

রাজাকে সন্দেহ করা ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সংস্কার বিরুদ্ধ। এদেশে রাজা ভগবানের অবতার বলিয়া চির পুজিত। চির দিনই এদেশের প্রজা রাজার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী। রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোন দিন প্রজাশক্তি

দণ্ডায়মান হয় নাই। রাজা যাহা করেন সকলই প্রজার মঙ্গলের জন্য এই একটা বিশ্বাস ভারতবাসীর হৃদয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

বলদৃপ্ত স্বার্থপর ইংরেজ সেই বংশ পরম্পরাগত সংস্কারের মূল উৎপাটিত করিয়াছে। এখন আর রাজার প্রতি এদেশের প্রজার সেই সরল বিশ্বাস ও ভক্তি নাই। রাজদ্রোহই বল আর যাই বল ইহা ধ্রুব সত্য যে এখন ভারতবাসী প্রজার হৃদয়ে রাজভক্তি নাই। যে বলে যে ইংরেজ ন্যায় পরায়ণ ও পক্ষপাত শূন্য সে মিথ্যাবাদী; স্বার্থের মোহে পড়িয়া সে রাজপুরুষের চিত্ত বিনোদন করিতে প্রয়াসী।

এই যে রাজভক্তি শিথিল হইয়া গেল, এই যে প্রজা আর রাজদ্বারে প্রতিকার আশায় যাইতে চায় না এই দোষ কাহার? দোষ যথেচ্ছাচারী রাজপুরুষদিগের। যত অত্যাচার, যত অবিচার, যত পক্ষপাত ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রতিদিন করিয়াছে তাহা কিছুই হারায় নাই, সকলই জাতির হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই তীব্র মর্ম্মজ্বালাময়ী স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্ত প্রাণে দংশন করিয়া অত্যাচারী রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিতেছে।

বহু বৎসর যাবত দেখিতেছি শ্বেতাঙ্গের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গের কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটিলে তাহা কৃষ্ণাঙ্গেরই অদৃষ্টের দোষ। একসিডেণ্টের দোহাই দিয়া আইনকে ফাঁকী দিতে পার বটে কিন্তু বিচার ব্যভিচার দেখিয়া এদেশের লোকের প্রাণে যে ক্ষোভ রোষ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নীরবে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা নিবারিত করিবে কিরূপে? হে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ! তোমাদের অত্যাচার সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করিতেছে।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অতৃপ্তির ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। সেই অনল যদি ভারতব্যাপী ভীষণ দাবানলে পরিণত হইত তাহা হইলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইত তাহা লিখিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তখন মহারাণীর ঘোষণা প্রচারিত হইল— তিনি জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান অধিকার দিবেন এবং উপযুক্ততা অনুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। শান্তিবারি সিঞ্চনে সেই অতৃপ্তির অনল নির্ব্বাপিত হইল।

এই ঘোষণা পত্রকে ভারতবাসী পবিত্র মেগ্‌নাকার্টা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল। এই ঘোষণা পত্র পাইয়া ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হইয়া

গিয়াছিল। এই ঘোষণাই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, বাস্তবিকই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে। কিন্তু স্বার্থপর অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রতিপদে আমাদের মেগ্‌নাকার্টার অবমাননা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে উহাতে কোনই পদার্থ নাই। এখন উহারা খুলিয়াই বলিতেছেন ঐ ঘোষণাপত্র Political Hypocrisy মাত্র।

ইংরেজের মেগ্‌না কার্টা প্রজাশক্তি রাজার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করিয়াছিল এবং পাছে উহার স্বত্বসংরক্ষিত না হয় এই ভয়ে সমগ্র ইংরেজজাতি সশস্ত্র হইয়া দিনরাত্রি পাহাড়া দিতেছে।

রাজা বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রজাকে, যে স্বত্ব প্রদান করে প্রজা যদি সেই স্বত্ব স্বীয় শক্তিতে সংরক্ষণ করিতে না পারে তবে রাজা সুবিধা পাইলেই তাহা হরণ করে। ইংরেজরাজ অনুগ্রহ করিয়া যে অধিকার দিয়াছিল তাহা রাখিবার শক্তি আমাদের নাই বলিয়া ইংরেজ আবার কাড়িয়া লইয়াছে।

অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ক্ষমতা ক্ষমতাই নয় তাহা আমরা বহুদিন বুঝিতে পারি নাই। সেই জন্যই আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়াস না করিয়া আমরা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজার দ্বারে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। যদি এতদিন শক্তি-সাধনা করিতাম তাহা হইলে আজ আমাদিগকে যথেচ্ছাচারমূলক শাসননীতির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত না এবং ইংরেজ আমাদিগকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিত না।

এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ আমাদিগকে এমন কিছুই দিবে না যাহা পাইলে আমরা মানুষ হইতে পারিব। ইংরেজ চায় আমাদিগকে খেল্‌না দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে। দেড়শত বৎসর ইংরেজের অধীন থাকিয়া আমরা কেবল গোলামীরই উপযুক্ত হইয়াছি।

চক্ষু ফুটিয়াছে, মোহপাশ ছিন্ন হইয়াছে, ভ্রম দূর হইয়াছে। ভগবান আমাদিগকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আর সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, ভয় নাই। আমরা অভয় পাইয়াছি।

তাই চারিদিকে নবজীবনের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। এক নবযুগ বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছে। এ যুগের সাধনা—আত্মশক্তির বিকাশ; মন্ত্র—বন্দে মাতরম্; পণ—জীবন সর্ব্বস্ব; ফল—জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

বৈদিকযুগ।

বৈদিকযুগে যখন আর্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্ব্বে পবিত্র সলিলা গঙ্গাযমুনার পুণ্য সঙ্গম, উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয় হইতে দক্ষিণে সিন্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত, প্রকৃতির এই লীলা নিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে এই সমুদয় স্থান অনার্য্য অধিবাসীদ্বারা অধিকৃত ছিল। আর্য্যগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অধিবাসীবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

বৈদিকযুগে আর্য্যগণ কেবল আর্য্যাবর্ত্তেই বাস করিতেন, তাঁহারা ইহার বহির্ভূত অন্য কোনও স্থানের বিষয় অবগত ছিলেন কি না, বেদে তাহার উল্লেখ নাই। কাজেই বেদ হইতে বঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোনও বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি না। *

মনুসংহিতা। বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার আবির্ভাব। মনুসংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তখন বঙ্গদেশ অরণ্যানীসঙ্কুল ও অনার্য্যগণের আবাসভূমি ছিল। এতদতিরিক্ত সংহিতাতে বঙ্গদেশের বিষয় কিছুই লিখিত নাই। ইহার পর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে †। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনাপাঠে আমরা বঙ্গ সম্বন্ধে যে ভৌগলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহাতে তখন পূর্ব্ববঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। পৌরাণিক বা বৌদ্ধযুগের আলোচনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ, ঢাকা বিভাগ সহ, অসীম অনন্ত সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমগ্ন অবস্থায় ছিল। অতএব রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে বঙ্গের অস্তিত্ব থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গ বা

* See R. C. Dutt's History of The Civilization of Ancient India Page 65.

† রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম অধ্যায়। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অঃ।

বিক্রমপুরের অস্তিত্ব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যে শ্যামল বনরাজিলীলা, শস্যসম্পদশালিনী ভূখণ্ড বহুলোকের আবাসভূমি, পূর্ব্বে যে তাহা সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এখনও অনেকে বিক্রমপুরে পুকুর ইত্যাদি খনন করিতে নানা প্রকারের জলযানের ভগ্নাবশেষ পাইয়া থাকেন।

নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তখন বিক্রমপুর ও এই সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিঃ বিভারেজ প্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সমতটাখ্যার পূর্ব্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল *। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটী দ্বীপের ন্যায় স্থান লোক-চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।

নবম শতাব্দীতে বিক্রমপুর।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রণীত "তব-কতই নাশিরি" নামক পুস্তকে সমতটকে কোনস্থানে সনকট কোথাওবা সাকাট বা সঁকাট এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

সনকট সাকাট ও সকাট।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, গৌড়, সোণারগাঁ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান সমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহার অতি পূর্ব্বে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্ব্বজন পরিচিত ছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহুপরে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

---

* হিউএন্থসঙ্গের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগরশাখা বিস্তৃত ছিল। হিউএন্থসঙ্গের অনূ্ন একশতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ, আদিশূরের রাজবাটীতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না।

বান্ধব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮৯।

আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহার উল্লেখ করিলাম।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির কারণ।

(১) বিক্রমপুরে এরূপ একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হয়, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের প্রতি রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্ত্তী সমতট প্রদেশের স্থান বিশেষের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য যে কখনও পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। (২) অতি প্রামাণিক প্রাচীন "বিপ্রকুল-কল্প-লতিকা" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্য-বর্গের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ বিভুজ সেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রম সেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা। আমাদের মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমরা উক্ত গ্রন্থের স্থলবিশেষ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্যবংশে বীরসেনো ভূপঃ পর পুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনোজাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।

কেহ কেহ আবার এই মতও প্রকাশ করেন যে সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে স্থানে বাস করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, সেই প্রিয়তম স্থানকেই 'বিক্রমপুর' এই অতি গৌরবজনক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যে পাঠকের মনে যাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে রাজ্যস্থাপন ও বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্নাংশেও স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন সময়ে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধনৈশ্বর্য্যে ভারতের

সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে বিক্রমপুর।

গৌরবের সামগ্রী ছিল। যে বিক্রমপুর একদিন দেশে বিদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার পূর্ব্বক স্বাধীনতা ও বীরত্বের লীলাক্ষেত্ররূপে জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল; সেই বিক্রমপুর বর্ত্তমান সময়ে নিষ্প্রভ ও মলিন। হায়! যে মহিমামণ্ডিত সুরম্য ও সুবিশাল রাজপ্রাসাদ একদিন উন্নতশীর্ষে সেনরাজগণের ধন-গৌরব জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল, যে হর্ম্ম্যাবৃত আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত রাজধানী একদিন সেন রাজত্বের সুখ-সমৃদ্ধির বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছিল, তাহা আজ কবি কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। সময়ের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন।

প্রাচীন সীমা। বর্ত্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হতশ্রী এবং পূর্ব্বগৌরব-বিভব শূন্য হইয়াছে, পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্য হেতু বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই।

থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটা ম্যাপ প্রস্তুত হয়, তখন কীর্ত্তিনাশার (পদ্মা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্ব্বে স্বল্প পরিসরা কালীগঙ্গানদী* বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া

---

* ১৭৮১ সনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ার জেনেরেল জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার উল্লেখ আছে। যে সময়ে কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ১ ইন্দ্রাপুর, (মুন্সীগঞ্জ) ২ ফিরিঙ্গিবাজার, ৩ আবদুল্লাপুর, ৪ মীরগঞ্জ, ৫ মাঝহাটী, ৬ সেরাজদী, ৭ রাজাবাড়ী, ৮ সেকেরনগর, ৯ হাসারা, ১০ ষোলঘর, ১১ বারইখালি, ১২ সুবপুর, ১৩ ঠাউদিয়া, ১৪ বালীগাঁ, ১৫ উনকিশর, ১৬ রাজাবাড়ী, ১৭ চণ্ডীপুর, প্রভৃতি স্থানগুলি কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্ত্তমান আড়িয়লবিল তৎসময়ে চুরাইন বিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তটবর্ত্তী স্থান—১ মুলফৎগঞ্জ, ২ করাতীকাল, ৩ জপসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ শ্যামপুর ও ধীপগাঁ, ৭ সারেঙ্গা, ৮ চিকন্দী, ৯ গঙ্গানগর, ১০ রাধানগর, ১১ ঘাগটিয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর, ১৪ লড়িকুল ইত্যাদি।

মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—১ বুহার, ২ স্নানঘাটা, ৩ কার্ত্তিকপুর, ৪

প্রবাহিত হইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করে এবং খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করিত। উহার উভয় তীরবর্ত্তী পল্লী সমূহের শ্যামল সৌন্দর্য্য ও শস্যশ্যামলা ক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্য্যটকের নিকট স্বর্ণ-কিরীট-মণ্ডিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে শোভা-সম্পদ সর্ব্বধ্বংসকারী পদ্মার তরঙ্গ প্রহারে কবি কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লনদী ও কৃষ্ণসলিল মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ,—এই চতুঃসীমামধ্যবর্ত্তী স্থানই বিক্রমপুর নামে সর্ব্বজন পরিচিত ছিল।

মায়া তিমির চন্দ্রিকা ও বিক্রমপুর।

লালা রামগতি রায় তাঁহার রচিত 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' নামক পুস্তকে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও কীর্ত্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। এই 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান

ডলুই, ৫ বামগাঁও, ৬ ভয়রা, ৭ সাদকপুর, ৮ শ্রীরামপুর, ৯ পাতলাডাঙ্গা, ১০ সিরান্দী, ১১ দুহুলিয়া, ১২ মনন্দিয়া (মিলন্দীয়া), ১৩ লজারদিয়া, ১৪ ঢেউখালী, ১৫ ছোট বাগ্গুরা, ১৬ গাঙ্গিয়া।

পদ্মাতটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে—১ দীঘারিপাড়া, ২ রাজাখালী, ৩ ভাঙ্গাবাড়ী, ৪ কলারগাঁ, ৫ বালীসার, ৬ বুদারশাপ (বদরাসন), ৭ মাছুয়াখালী, ৮ গঙ্গারিয়া, ৯ সোনাপাড়া, ১০ মনরপুর, ১১ মলুয়ারহাট, ১২ মগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসলাচর, ১৫ মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবদুল্লাপুর, ১৭ সুলতানী, ১৮ কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিকটস্থ মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হইয়াছিল। হায়! কালের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে এই প্রায় ১২৫ বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে পরিবর্ত্তিত এবং এক নদীর স্থানে অন্য নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রদেশ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইতে পারা অসম্ভব। কালীগঙ্গার বর্ত্তমান নাম পড়া বা পোড়াগঙ্গা। অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার সঙ্কীর্ণ খাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপাড়া জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া এখনও উহা ক্ষুদ্র দেহে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বপতির লীলাকৌশল প্রকটিত করিতেছে। বর্ষার সময় ভিন্ন ইহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন ইহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া পোড়াগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তদ্রূপ হয় নাই; এখনও সেখানে কালীগঙ্গার ক্ষুদ্র খাতকে কালীগঙ্গাই বলিয়া থাকে।

হয় যে, সে সময়েও 'কীর্ত্তিনাশা' নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। মোটের উপর রাজবল্লভের কীর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করিয়াই যে পদ্মা এই অপনাম লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পরগণে বিক্রমপুর।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে মোগল রাজত্বের সময়ে বিক্রমপুর সরকার, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত একটী পরগণা ছিল। তৎসময়ে সোনারগাঁয়ের মধ্যে ৫২ বায়ান্নটী মহাল ছিল; যথা (১) অসতার সাহাপুর, (২) আনচাগ, (৩) অসতার ও সমানপুর, (৪) বিক্রমপুর, (৫) বেলা-দেওয়ার, (৬) বলদাখাল, (৭) বোয়ালিয়া (৮) পারচাঁদে, (৯) বাটখারা, (১০) পলাশবাড়ী, (১১) চরদিয়া, (১২) ফুলরী, (১৩) পানহাটী, (১৪) ভাকলা, (১৫) তাজপুর, (১৬) তিরকী, (১৭) যোগী দয়া, (১৮) জেওয়ার বন্দর, (১৯) চোকেন্দী, (২০) চণ্ডীহার, (২১) চাঁদপুর, (২২) হাবেলী সোনারগাঁ, (২৩) সরুসহর (২৪) খিজিরপুর, (২৫) দোহার (২৬) ডানডেয়া, (২৭) দেখান সাহপুর, (২৮) দেওয়ানপুর, (২৯) দেকান ও সমানপুর, (৩০) রায়পুর, (৩১) সুপারগঞ্জ (৩২) সেলিমপুর, (৩৩) সেলিসেবি, (৩৪) সয়জলকর, (৩৫) শুকাওশা, (৩৬) সেবারচল, (৩৭) শমসপুর, (৩৮) বাড়াপুর, (৩৯) সবদী, (৪০) কার্ত্তিকপুর, (৪১) কাঁদী, (৪২) কোলহরি, (৪৩) ঘাটী ভুলাই, (৪৪) মারকোর, (৪৫) মজমপুর, (৪৬) মেহার, (৪৭) মনোহরপুর, (৪৮) সাতীজল, (৪৯) নারায়ণপুর, (৫০) সেপুয়া কোট, (৫১) হিমতীবাজু, (৫২) হাটঘাটী।

এই বায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩১ দাম * ছিল। তন্মধ্যে এক বিক্রমপুরের রাজস্বই ছিল ৩৩,৩৫,০৫২ দাম। বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও বিক্রমপুর পরগণার বিষয় লিখিত আছে। ইহাদ্বারা এবং আইন-ই-আকবরী পাঠে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ সেনরাজগণের সময়ে পরগণা বিভাগ ছিল না। মহারাজা আদিশূর সমুদয় বঙ্গ, রাঢ়,

* তাম্রমুদ্রা—চল্লিশ দামে এক টাকা হয়।

বারেন্দ্র, বাগরী, বঙ্গ, মিথিলা এই পাঁচ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। †

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের লিখিত পরগণা সমূহের অধিকাংশই ঢাকা, ফরিদপুর ত্রিপুরা, নোয়াখালি এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইদিলপুর সরকার বাকলার অন্তর্গত, সনদ্বীপ ও সাবাজপুর সরকার, ফতেয়া আবাদের মধ্যবর্ত্তী ও বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর, ইত্যাদি পরগণাগুলি সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। ‡

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

† During the Adisur dynasty, the following are said to have been the ancient geographical Divisions of Bengal-Gour was the capital, forming the centre division, & surrounded by five great provinces.

1. Barendra—bounded by the Mahananda on the west; by the Padma, or great branch of Ganges, on the south; by the Korotoya on the east & by adjacent Governments on the north.

2. Banga,—or the territory east from the Korotoya towards the Barhmaputra. The capital of Bengal, both before & afterwards, having long been near Dacca, in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island, bounded on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by the sea, ; & other third by the Hugli river or Bhagirathi.

4. Rarhi—bounded by the Hugli & Padma on the north & east & by adjacent kingdoms on the west & south.

5. Maithila—bounded by the Mahananda & Gour on the east, the Hugli or Bhagirathi on the south & on the west.

Hamilton's Hindustan.

I. P. 114.

‡ যদি কেহ কোনও ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করেন, এবং বিক্রমপুর সম্বন্ধে কোনও নূতনতথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন," আরতি" আফিসের ঠিকানায় লেখকের নিকট প্রেরণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

তুমি ও সে ।

তুমি নব-বসন্তের প্রস্ফুট বকুল,
সে যে গন্ধরাজ তায় ধায় অলিকুল ।
তুমি নিদাঘের স্বচ্ছ শীতল নির্ঝর,
সে ত খর স্রোতস্বিনী বহে নিরন্তর ।
তুমি বরিষার বিলে দুর্লভ নলিনী,
দিবসেতে ছায়াময়ী সে যে কুমুদিনী ।
শরতের পূর্ণিমায় তুমি পূর্ণশশী,
সে যে চাতকিনী ফিরে জলের পিপাসী ।
তুমি হেমন্তের সন্ধ্যা মলান বয়ান,
সে যে তপ্ত রবিকর দহে যা'তে প্রাণ ।
তুমি শীতান্তের তরু নব পল্লবিতা,
বিরহিণী পিকরাণী সে যে উপেক্ষিতা ।
আকুল আহ্বানে তুমি টানিছ আমায়,
সে যে জোর করে মোরে বুকে নিতে চায় ।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

আমি কে ?

বীরপুত্র সীতারাম শিবাজী প্রতাপ,
বীরকন্যা দুর্গাবতী কর্ম্মদেবী যাঁর ;
কৃষ্ণ উপদেষ্টা যাঁর কিসে পুণ্য পাপ,
ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা করে কর্ম্মের প্রচার ;
নৃমুণ্ডমালিনী করে শাণিত কৃপাণ
উপাস্যা দেবতা যাঁর কালী কাত্যায়নী ;
বীররক্তে স্নাত যাঁর পর্ব্বত পাষাণ,
প্রতি বন উপবন বীর্য্য-বিবরণী ;
বীরের কঙ্কালচূর্ণ যাঁর মাটিধূলি,
ঘাটে মাঠে বাটে যাঁর বীরের শ্মশান ;
জগতে বিখ্যাতা যিনি বীরমাতা বলি,
তিনি সে জগতপূজ্যা পূতা হিন্দুস্থান ;
নহি ঘৃণ্য অবজ্ঞের দুর্ব্বল ভিখারী,
চিনেছ সংসার, আমি শাক্ত পুত্র তাঁরি ।